চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকে ঋষি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, প্রাণময় কোষের প্রথম সাধক স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে উত্তরোত্তর সাধনা দ্বারা ক্রমোন্নতি লাভ করেন, কিরূপে প্রথমে দেবগণের মহত্বমাত্রের অধিকারী হইয়া পরে সাধনা দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত হন ও ক্রমে প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া বিশ্বভুবন শাসন ও জগৎ সৃষ্টি করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিতত্ত্ব

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বেদ-নির্দ্দিষ্ট ক্রমমুক্তি বিষয়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ক্রমমুক্তি কিরূপে সাধিত হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, অগ্রে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা আবশ্যক। সাধনতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা প্রথম দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক উহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। সৃষ্টিতত্ত্ব না বুঝিলে, সাধনতত্ত্ব বুঝা যায় না। সৃষ্টির পর্য্যায় অনুসারে সাধনের পর্য্যায় নির্দ্ধারিত হয়। আনন্দময় কোষ হইতে অন্নময় কোষ পর্য্যন্ত আবরণ সকল কি এবং কিরূপে সৃষ্ট হইল, তাহা জানা সাধকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা সাধনা লক্ষ্যহীন হয়। ফলতঃ ভক্তি-পূর্ব্বক সৃষ্টিতত্ত্বের অনুধ্যান সাধনার প্রধান অঙ্গ। আমি কি? কোথা হইতে আসিয়াছি? কেন আসিয়াছি? কোথায় যাইতেছি? কেন যাইতেছি? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান না হইলে, সাধনার আরম্ভই হয় না এবং সাধনার উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মে না।

বায়ুর তাড়নে সমুদ্রে যেমন স্পন্দনের সৃষ্টি হয় জীবের অনাদিকর্ম্মসংস্কারের তাড়নে এক অদ্বিতীয় অনাদ্যনন্ত ব্রহ্মপদার্থে তেমনি সিসৃক্ষারূপ স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রবক্ষে স্পন্দনের ফলে যেমন বীচি সকল উত্থিত হয়, ব্রহ্মপদার্থে স্পন্দনের ফলে সেইরূপ জীব সকল উত্থিত হয়। তাহা হইলে জীবের স্বরূপ কি হইল? প্রথমতঃ, বীচিতে ও সমুদ্রে যেমন বাস্তব ভেদ নাই, সেইরূপ জীবে ও ব্রহ্মে বাস্তব ভেদ নাই। বীচি যেমন সমুদ্রবক্ষে, সমুদ্র অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, সমুদ্রের সহিত একাঙ্গ হইয়া সমুদ্রশরীরে বিচরণ করে, জীবও তেমনি ব্রহ্মে লীন থাকিয়া ব্রহ্মময় হইয়া ব্রহ্মে বিচরণ করে। কোন সমুদ্রের কথা বলিলে যেমন উহার বীচিও বুঝায়, তেমনি ব্রহ্ম বলিলে জীবকেও বুঝায়। যেমন বীচিকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম হইতে জীবকে পৃথক্ করা যায় না। ইহা হইল জীব ব্রহ্মে একত্বভাব। দ্বিতীয়তঃ, বীচিতে ও সমুদ্রে বাস্তব ভেদ না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে রূপগত ভেদ আছে; সমুদ্র বিশাল, বীচি ক্ষুদ্র; সমুদ্র অতলস্পর্শ, বীচি অল্পগভীর। সেইরূপ ব্রহ্মে ও জীবে বাস্তব ভেদ না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে রূপগত ভেদ আছে; ব্রহ্ম বিরাট্, জীব ক্ষুদ্র; ব্রহ্ম অসীম, জীব সসীম, ব্রহ্ম অনবচ্ছিন্ন, জীব অবচ্ছিন্ন; ব্রহ্ম রূপহীন, জীব রূপবান্। ইহা হইল জীব-ব্রহ্মে দ্বৈতভাব। ব্রহ্মশরীর অনাদি অনন্ত, উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোতভাবে আত্যন্তিকরূপে ব্যাপিয়া আছে। ইহার মধ্যে জীবের বিশিষ্ট অস্তিত্বের অবসর কোথা হইতে কিরূপে আসিল? পূর্ব্বে যে অনাদি-কর্ম্মসংস্কার-জনিত স্পন্দনের কথা বলিয়াছি, তাহাই জীবের জীবস্বরূপ বিশিষ্ট অস্তিত্বের

কারণ। কর্ম্মতত্ত্ব অতি নিগূঢ়, অনির্ব্বচনীয়। ইহারই তাড়নে মায়াশক্তি বা প্রকৃতি প্রবুদ্ধ হয়। ইহা ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ইহাকে পৃথক্ করা যায় না. ব্রহ্ম ব্যতিরেকে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই মায়া বা প্রকৃতি জীবের রূপ বিধান করে, শরীররূপে জীবকে অবচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্ম হইতে তাহার ভেদ জন্মায়। কর্ম্মসংস্কার দ্বারা ব্রহ্মশরীরে যে স্পন্দন উত্থিত হয়, তাহা ইহারই বিকার। পাঠক স্থিরচিত্তে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করুন। মায়া বা প্রকৃতি নিত্য ব্রহ্মে অবস্থিত, ব্রহ্ম হইতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ইহা ব্রহ্মই; অথচ, ইহা জীবরূপ ভেদ উৎপন্ন করে। এই-জন্যই ইহার নাম মায়া বা অবিদ্যা। প্রকৃতি যখন সুপ্ত থাকেন, কর্ম্মসংস্কারজনিত স্পন্দন যখন স্থির হয়, মায়া যখন যোগনিদ্রারূপে ব্রহ্ম-দেহে বিলীন থাকে, জীবত্ব ও ব্রহ্মত্বে তখন ভেদ থাকে না; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ-ভূত ব্যক্ত প্রকৃতি তখন অব্যক্ত হইয়া যায়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি জীবসঙ্ঘের জননী তখন নিবৃত্তপ্রসবা হন। পুনরায় যখন তিনি জাগরিতা হন, কর্ম্মসংস্কাররূপ ব্রহ্মার আবাহনে যখন তিনি ব্রহ্মশরীরের অভেদত্ব ছাড়িয়া ভেদ-রূপে উত্থিতা হন, তখন ব্রহ্মশরীরে স্পন্দন আরম্ভ হয়,সংসারলীলা প্রকটিত হইতে থাকে। এই যে মায়াশক্তির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, স্পন্দনের সুপ্ত ও জাগরিত অবস্থা, বিশ্বের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাব, এই দ্বন্দ্বের কারণ কর্ম্মসংস্কার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কর্ম্মতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়, কর্ম্ম ও কর্ম্মসংস্কারের মূল অনির্দ্দেশ্য। দ্বৈত, পরিচ্ছিন্ন, বিকারভাবাপন্ন জ্ঞান দ্বারা অদ্বৈত, অপরি-চ্ছিন্ন, অবিকারী ব্রহ্মপদার্থের বিকারের নির্ব্বচন করা যায় না। অদ্বৈতভূমিতে উত্থিত হইলেও, এ বিকার বিকাররূপে প্রতি-ভাত হয় না; কারণ, অদ্বৈতজ্ঞানীর চক্ষে এ বিকারের অস্তিত্ব নাই, শুদ্ধ, বুদ্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন তত্ত্বের উপলব্ধি নাই। এইজন্যই কর্ম্মতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়। কি দ্বৈতজ্ঞানী, কি অদ্বৈতজ্ঞানী, কাহারও নিকট ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। মায়ার স্পন্দন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ জীবরূপে তাহার নিষ্পেষণ ভোগ করিতে থাক; মায়ার স্পন্দন যখন মিটিবে, তখন শিবরূপে মায়ার আর স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিবে না। সংক্ষেপতঃ দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই স্থূল সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বজ্ঞানপ্রসবিণী বেদ-মাতার বাক্য হইতে আর্য্যগণ প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব অতি সুন্দর, অতি বিশদ, অতি সরলভাবে বুঝান আছে। সুতরাং আমরা বেদ হইতেই এ তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিব। সৃষ্টি বুঝিতে হইলে, প্রথমে প্রলয় বুঝিতে হয়; কারণ, প্রলয়ের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধ বীজের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধের ন্যায়। যেমন বীজ না বুঝিলে বৃক্ষ বুঝা যায় না, তেমনি প্রলয় না বুঝিলে সৃষ্টি বুঝা যায় না। প্রলয় কি, এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রথম উন্মেষ কিরূপে হইল, তাহা বৈদিক ঋষি নিম্নলিখিত সূক্তে বুঝাইয়াছেন। এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি পরমেষ্ঠী, ইহার দেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা পরমাত্মা।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো
ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্-
গহনং গভীরং ॥১॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা—জায়তৈকং ॥৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিন্দনহৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসী-দুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥

—ঋ স ১০।১২৯

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

এষা *

(১)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল বাংলার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁর নাম বহুদিনই জানিতাম; কিন্তু "এষা" পড়িবার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। তাঁর অন্য কোনও গ্রন্থও ইতিপূর্ব্বে আদ্যোপান্ত পড়ি নাই। সাময়িক পত্রে কখনও কখনও তাঁর দু'একটী কবিতা পড়িয়া থাকিতে পারি; কিন্তু সে সকলে তাঁর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে ভালমন্দ কোনই বিশেষ সংস্কার জন্মে নাই। সুতরাং সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত হইয়াই এই বইখানি পড়িতে বসি। "এষা" নামটা কেমন উদ্ভট ঠেকিয়াছিল, কোনই অর্থবোধ হয় নাই। আর অমূল্য বাবুর ভূমিকায় এই নামের প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা দেখিয়া যে, বইখানি পড়িবার জন্য কোনও লোভ হইয়াছিল, এমনও বলিতে পারি না। এ কৈফিয়ৎ না দিলেই, মনে হয়, ভাল হইত। ফলতঃ এই প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার পরে, বইখানা আদৌ পড়িতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। কিন্তু অক্ষয়বাবুর একটী বন্ধুলোকের নিকটে বইখানি পড়িয়া দেখিব

* "এষা" গীতিকাব্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই সত্য রক্ষা করিতে না হইলে, বইখানা আমার ভাগ্যে আজি পর্য্যন্ত পড়া হইত কি না, সন্দেহ।

কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, একাধিকবার পড়িলাম। বন্ধুবান্ধবদিগকে অনেকবার ইহার বাছা বাছা কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইলাম। সকলেই এই কবিতাগুলির মৌলিকতা, বস্তুতন্ত্রতা ও সর্ব্বোপরি এ সকলেতে সর্ব্বপ্রকারের কষ্টকল্পনার বা নাটুকে ছলাকলার গন্ধমাত্র নাই দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়াছেন। আমার মনে হয়, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তাঁর এই শোকাত্মক গীতিকাব্যে অক্ষয়বাবু এক অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন কি, এই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে অক্ষয়বাবুর এই 'এষা' খানি বিশ্বসাহিত্যেও অতি উচ্চস্থান পাইতে পাবে। ইহাতে বিন্দুমাত্রও অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কাব্যের লক্ষণ

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন। রসাত্মকতা যে কাব্যের একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যে বাক্যে কোনও না কোনও রস উথলিয়া উঠে, তাহা আদৌ কাব্য নহে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। যাহা মিষ্ট লাগে, অর্থাৎ যে বাক্যের ঝঙ্কার আছে, সচরাচর লোকে তাহাকেই রসাত্মক বলিয়া ভাবিয়া থাকে। কিন্তু রস বলিতে, কেবল মিষ্টত্ব বোঝায় না। হাস্যাদ্ভুতকরুণ-রুদ্রাদিকে এখানে রস বলা হইয়াছে। এ সকল রস যে বাক্যে ফোটে না, তাহা রসাত্মক নয়, তাহা কাব্য হইতেই পারে না। যে বাক্যে কেবল ঝঙ্কারই তোলে, কাণেই মধু ঢালিয়া দেয়, এবং আপনার স্বরলালিত্যের দ্বারা চিত্তকে নাচাইয়া, ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা বাক্যহীন সঙ্গীতের তানলয়ের মতন বিবিধ ভাবের দ্যোতক হইলেও, প্রকৃত কাব্য হয় না। কাব্য কেবল ধ্বনি নহে, কাব্য বাক্য। বাক্য অর্থযুক্ত শব্দ। সুতরাং কাব্যের রস কেবল ঝঙ্কারে ফুটিলেই চলে না, সার্থক শব্দেতেও তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবে। যে বাক্য আপনার অর্থের দ্বারা হাস্যাদ্ভুতকরুণরুদ্রাদি রসকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাই কাব্য। কিন্তু কাব্যালোচনার ইহাই শেষ কথা নহে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিয়া—যাহা না হইলে কাব্য হয় না, আলঙ্কারিকেরা তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোনও না কোনও একটা রসের উদ্রেক যাহাতে না হয়, তাহা কাব্য নহে, কাব্য হইতেই পাবে না। কিন্তু কেবল রসবিশেষের উদ্রেক করিতে পারিলেই যে, যে কোনও রচনা কাব্যত্বের দাবী করিতে পারে, এমনও নহে। তাহা হইলে কালিদাস-কিংবদন্তীর—

দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ
চ বৈ তু হি চ বৈ তু হি—

ইহাও কাব্য-পদবী প্রাপ্ত হইতে পারিত। ইহাতে রস (যথা দুগ্ধ) আছে, ও চারি চরণও আছে (যথা বিড়ালের); আর পাদপূরণার্থে চ, বৈ, তু, হি প্রভৃতিও আছে। দুগ্ধের রস না হইয়া, কেবল হাস্যাদ্ভুতাদি রসের কথা হইলেও কাব্য হয় না। রাম হাসিতেছে, যদু মুখ ব্যাদান করিতেছে, কেশব রাগে হাত পা ছুড়িতেছে, কুঞ্জ

কাঁদিতেছে;—এই বাক্যগুলির সকলই রসাত্মক। কিন্তু তাই বলিয়া কি কাব্য হইয়াছে?

এ জগতের সর্ব্বত্রই এ সকল রস ছড়াইয়া আছে। এমন বিষয় বা বস্তু, অবস্থা বা ব্যবস্থা কিছু নাই, যার ভিতরে কোনও না কোন একটা রস স্বল্পবিস্তর ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া এ সকলই যে কাব্যের উপাদান হয়, এমন নহে। হাসিকান্না সংসার জুড়িয়া আছে; কিন্তু সকল হাসি-কান্নাতেই কাব্য গড়িয়া উঠে না। শৃঙ্গারাদি স্থায়ী রসও জনসমাজকে নিয়ত চঞ্চল ও সরস করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ সকলের সকলগুলিতেই যে কাব্য সৃষ্টি হয় বা হইতে পারে, তাহা নহে। সন্তানবতী রমণী সংসারে অসংখ্য। সন্তানবাৎসল্যও স্বল্পাধিক সকল মাতার মধ্যেই ফুটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল মাকে দেখিয়াই গণেশজননীর বা ম্যাডোনার ভিতরে দৈবীপ্রতিভাশালী শিল্পী যে অদ্ভুত রস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তার আস্বাদন পাই না। পথে ঘাটে কত-শতবার কত শত শত রমণীকে আপনার সন্তানের মুখে স্তন দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়; কিন্তু র‍্যাফেল্ তাঁর ম্যাডোনাতে যে অপূর্ব্ব বাৎসল্যরসটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, পথে-ঘাটের এই সকল মায়ের ভিতরে তো তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না। ইহার কারণ এই যে, এ সকল পথে-ঘাটের মাতৃ-মূর্ত্তিতে বাৎসল্যরসের বিশ্বজনীনত্বটুকু পরি-স্ফুট হয় নাই। এ সকল রস বিশিষ্ট, বিশ্ব-জনীন নহে। র‍্যাফেল্ বিশাল বিশ্বের বাৎসল্যকে ছাঁকিয়া আনিয়া, সেই রসে এই অমৃতময়ী জননীমূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। মা-বস্তু রসময়ী, রসাত্মিকা। ম্যাডোনা এই রসের মূর্ত্তি। ম্যাডোনা সকলের মা। বাৎসল্যরস যেমন বিশ্বজনীন, সেই রসের সত্য মূর্ত্তিও সেইরূপই বিশ্বজনীন হওয়া চাই। এই রসের যে মূর্ত্তি, তাহা শ্বেতকৃষ্ণ, হিন্দুম্লেচ্ছ—সকলেরই প্রকৃত জননীমূর্ত্তি। ম্যাডোনার মাহাত্ম্যই এই যে, ইহা বাৎসল্যের বিশ্ব-মূর্ত্তি। ম্যাডোনা বিশ্বজননী। আর ম্যাডোনার কোলে যে অনিন্দ্যরূপ শিশু প্রভাত-অরুণের আভা অঙ্গে মাখিয়া মাতৃবাহুলীন হইয়া আছে, সেও কোনও ব্যক্তিবিশেষের সন্তান নহে, কিন্তু বিশ্বের সন্তান। বিশাল বিশ্বে অগণ্যকোটী জীবের শরীর-মনের ভিতর দিয়া যে বাৎসল্য নিয়ত প্রবাহিত হইয়া, অনন্তজীবপ্রবাহকে রক্ষা করিতেছে, ম্যাডোনা সেই নিখিলবিশ্বের মাতৃশক্তিরই প্রতিচ্ছবি। আর তাঁর কোলের এই শিশুটী বিশ্ববাৎসল্যের উপজীব্য ও উদ্দীপনা—সন্তানাবতার। এই বিশ্ব সম্বন্ধটীকে বিশদ করিয়াই ম্যাডোনা রসমূর্ত্তি হইয়াছে।

এই বিশ্বসম্বন্ধটীও কাব্যের একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ। বাক্য একদিকে যেমন রসাত্মক হইবে, অন্যদিকে সে রসটাও আবার বিশ্বজনীন হওয়া আবশ্যক। রসাত্মকতা যেমন, সেইরূপ এই বিশ্বজনীনত্বও কাব্যের বিশেষ লক্ষণ, ইহার একটীকে ছাড়িয়া দিলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না। ফলতঃ যে কাব্য কোনও না কোনও রসের বিশ্বজনীনত্বকে ফুটাইয়া তোলে না, তাহা যতই কেন শ্রুতি-মধুর বা চিত্তোন্মাদকর হউক না, সে কাব্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা তো দূরের কথা, আদৌ কাব্যত্বেরই দাবী করিতে পারে না। লোককে হাসান, কাঁদান, নাচান, মাতান—

এ সকল যে বড় একটা বেশি কথা, তাহা নয়। যাত্রাওয়ালার সং যারা সেয়, তারা সামান্য মুখবিকৃতি করিয়াই বালকের দলকে হাসাইয়া অস্থির করিয়া তোলে। কিন্তু হাস্য-রসের অবতারণা করে বলিয়া সেই মুখ-বিকৃতিকে কেহ কাব্যসৃষ্টি বলিবে না। আর ইহা কাব্যসৃষ্টি নয় এইজন্য যে, হাস্যরসের যে একটা বিশ্বজনীনতা আছে, সে গুণটী এখানে ফুটিয়া উঠে না। সেইরূপ লোককে কাঁদানও সহজ, কিন্তু সেই কান্নাব ভিতরে বিশ্বব্যাপী যে ক্রন্দনরোল দিবানিশি প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে, তার সুর জাগাইয়া তোলা কঠিন। আর যতক্ষণ না সে সুব বাজিয়াছে, ততক্ষণ ক্রন্দনের মধ্যে কারুণ্য জাগে না, আর সে কান্নাতে কাব্যসৃষ্টিও হয় না। দুটো লোককে বাহ্বাস্ফোট করিয়া, পর-স্পরকে মারিতে যাইতে দেখিলেই, দর্শক-গণের শরীর মনেও একটা ঘুষোঘুষি করিবার উদ্দীপনা আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। এই মারামারি ব্যাপারটা যে রসাত্মক ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ছবি বা বর্ণনাকে কি কেউ কখনও কাব্য বলিবে? বার বৎসর পূর্ব্বে, ব্রিটিশ-বুয়র যুদ্ধের সময় রুডিয়্যার্ড কিপ্‌লিং এরূপ কবিতা ও গান লিখিয়া ইংরেজ জাতটাকে একেবারে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কিপ্‌লিং-এর আর কোনও কবিতা সাহিত্যের স্মৃতি-মন্দিরে রক্ষিত হইবে কি না, জানি না; এগুলি যে স্থান পাইবে না, ইহা স্থিরনিশ্চিত। ইতিমধ্যেই, সে সাময়িক ও সামরিক উত্তেজনার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কিপ্‌লিংএর সে সকল কবিতাও লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। আমাদের নিজেদের ঘরেই তার বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে। স্বদেশীর উত্তেজনার ও উদ্দীপনার মুখে ছোট বড়, নূতন পুরাতন, কত বাঙালী কবিই তো কত গান রচনা করিয়া-ছিলেন। সে সময়ে সেগুলি কতই না প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু সে সকলই তো আব কাব্য হয় নাই। এমন কি বাংলার কবীন্দ্র-শিরোমণি রবীন্দ্রনাথও সে সময় যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তার কয়টী সঙ্গীতই বা প্রকৃত কাব্যরসের দাবী করিতে পারে? রবীন্দ্রনাথের—

"বিধির বাধন কাট্‌বে তুমি এমন শক্তিমান্!"
"একলা চলো রে।"—

প্রভৃতি অনেক গানে সে সময় দেশের ছেলে বুড় সকলকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কিপ্‌লিংএর প্যাট্রিয়টিক্ গানের মতন রবীন্দ্রনাথের এ সকল গানেতেও কোনও বিশ্বসুর বাজিয়া উঠে নাই। যে উত্তেজনার জোয়ারের মুখে এগুলি ভাসিয়া আসিয়াছিল, আবার অবসাদের ভাঁটার মুখে আপনি তারা সরিয়া গিয়াছে। এগুলি জাতীয়জীবনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য হইলেও জাতীয় সাহিত্যের স্মৃতি-মন্দিরে কখনওই প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না; আবার এই স্বদেশীর মুখেই এমন দু'চারিটী সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার ভিতরে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজিয়াছে, আর সেই জন্য এইগুলি আমাদের জীবনের ও সাহিত্যের চিরন্তন উদ্দীপনারূপে চিরদিন জাগিয়া রহিবে। রবীন্দ্রনাথের "সোণার বাংলা," এই একটী। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহা-শয়ের "আমার দেশ" বোধ হয় এ সকলের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দুইটী সঙ্গীতই প্রকৃত কাব্য। রসাত্মকতা ও বিশ্বজনীনতা এই দুই লক্ষণই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সোণার বাংলা" ও 'আমার দেশ" উভয়েরই দেবতা এই বঙ্গভূমি সত্য। কিন্তু বঙ্গমাতৃকাকে আশ্রয় করিয়া ইঁহাদের কবিপ্রতিভা যে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বঙ্গের ভৌগোলিক সীমাতে আবদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ রসমাত্রেই বিশিষ্ট আধারেতে ফুটিয়া উঠে। বিশেষ দাসেতে দাস্য, বিশেষ সখাতে সখ্য, বিশেষ পিতা কি মাতাতে বাৎসল্য, নায়ক বা নায়িকা বিশেষেই মধুর রস ফুটিয়া উঠে। এই সকল বিশিষ্ট আধার বর্জ্জিত হইয়া কোনও নিরাধার নিরাকার নির্ব্বিশেষ ও সার্ব্বজনীন দাস্য বা সখ্য বা বাৎসল্য বা মাধুর্য্য রস জগতে কোথাও নাই। এই সকল বিশিষ্টের মধ্যেই বিশ্বজনীন রসমূর্ত্তি প্রকট হয়, তাহাদের বাহিরে হয় না। সুতরাং "সোণার বাংলার" কিম্বা "আমার দেশের" অভিধেয় বঙ্গভূমি বলিয়া ইহাদের মধ্যে দেশভক্তির সার্ব্বজনীন সুরটী বাজিয়া উঠে নাই, বা উঠিতে পারে না, এমন বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর "বন্দে মাতরম্"এতে কেবল বাংলার কথাই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মা'র বন্দনা করিয়াছেন, তিনি এই সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্য-শ্যামলা, সপ্তকোটীসন্তানজননী বঙ্গভূমি। তথাপি এই বিশাল ভারতভূমির যে যেখানে এই গান শুনিয়াছে ও তার অর্থবোধ করিতে পারিয়াছে সেই ইহাকে আপনার দেশমাতার বন্দনা বলিয়া অমনি গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ সপ্তকোটী কাটিয়া ত্রিংশৎকোটী করিয়াছেন, জানি। কিন্তু এরূপ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই 'বন্দে মাতরম্' এতে কবি যে সুরটা বাজাইয়াছেন, তাহা কেবল বাংলার দেশমাতার বন্দনাগীতি নহে, কেবল ভারতের দেশমাতার বন্দনাগীতিও নহে, তাহা বিশ্বজনীন দেশভক্তির নিত্যসাধ্য ও নিত্যসিদ্ধ সুর। এ সুর যে যে গ্রামেই গাউক না কেন, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই নিত্যকাল বাজিয়াছে ও বাজিতেছে। ফলতঃ কোনও কাব্যের দেশকালপাত্রাদিতে বিশেষত্ব কদাপি তার বিশ্বাত্মকতা বা বিশ্বজননীতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করে না। এই সকল বিশেষত্ব বা বিশিষ্টকে লইয়াই তো এই বিশাল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। এ সকল বিশিষ্টের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। বিশ্ব অঙ্গী, বিশিষ্ট যাহা কিছু তারা এই অঙ্গীর অঙ্গ। অঙ্গীতে অঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠিত। আবার অঙ্গেতেও অঙ্গী, অঙ্গের কর্ম্মের প্রেরণা রূপে, নিগূঢ় ভাবে নিত্য বিরাজিত। অঙ্গী অঙ্গকে ছাড়িয়া থাকে না, অঙ্গও অঙ্গীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তবে অঙ্গ কখনও কখনও মোহ-বশতঃ আপনাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবিয়া অঙ্গীকে উপেক্ষা করিতে পারে বটে। আর তখনই অঙ্গেতে অঙ্গীর সুরটা বাজিয়া উঠিতে পারে না। তানপুরার কোনও একটা তার যদি যন্ত্রের অপর তারগুলির সঙ্গে সঙ্গত্ না বাঁধিয়া আপনি আপনার একটা নিজস্ব ঝঙ্কার তুলিতে আরম্ভ করে, তখন সে যেমন বেসুরা হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষও যখন বিশ্বসঙ্গীতের অপরাপর তারের সঙ্গে সঙ্গত্ না করিয়া, কেবল আপনার ক্ষুদ্র, বিশিষ্ট, বিচ্ছিন্ন সুরটা ভাজিতে থাকে, তখন সেও বিশ্বজনীন জ্ঞান

ও রসের ধারা হইতে সরিয়া গিয়া অজ্ঞান ও অরসিক হইয়া পড়িয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরং" বলিয়া বঙ্গমাতারই বন্দনা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তাঁর সম্মুখের *দেবপ্রতিমা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্না হইলেও* যে সুরে তিনি এই দেবতার ভজনা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বের, বিশিষ্ট দেশের বা কালের নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" সম্বন্ধেও সেই কথা। এই সঙ্গীতে কবি বাংলার জীবনেতিহাসটী গাঁথিয়া দিয়া, বাঙালীর নিকটে ইহাকে অদ্ভুত সত্যোপেত, বস্তুতন্ত্র, ও শক্তিশালী করিয়াছেন বটে; কিন্তু এগুলি মূল রসের আলম্বন ও উদ্দীপনা মাত্র। সেই রস ফুটিয়াছে

কিসের দৈন্য কিসের দুঃখ,
কিসের লজ্জা কিসের ভয়? —

এই অপূর্ব্ব ভক্তির এই অপূর্ব্ব ত্যাগ ও স্পর্দ্ধাতে। আর ফুটিয়াছে শেষ পদে যেখানে কবি দেশমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার আমার দেশ!

এ ভাব ও ভক্তি কোনও দেশেতে বা কালেতে আবদ্ধ নহে। ইহা স্বদেশপ্রেমিকের সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ভাব। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসঙ্গীত অনেক আছে। তার কোনও কোনওটাতে যে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজে নাই, তাহাও নহে। কিন্তু যে তেজ, যে গর্ব্ব, যে স্পর্দ্ধা, যে ভক্তি, যে নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা ও নিঃশেষ আত্মদান দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই গানে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলা ভাষায় আর কোথাও জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সঙ্গীতের মধ্যে "নববর্ষের গান"

—হে ভারত আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ কবির গান!

এবং "অয়ি ভুবনমনমোহিনী" এই দুইটীই *সর্ব্বোৎকৃষ্ট! এই দুইটীতেই স্বল্পবিস্তর একটা* বিশ্বজনীনতার ভাব রহিয়াছে! কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশে" এই সুরটা যতটা পঞ্চমে চড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কোনও সঙ্গীতে ততটা উঠে নাই! আর এই বিশ্বজনীনতার জন্যই দ্বিজেন্দ্রলালের এই সঙ্গীতের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য।

"এষার বিশেষত্ব"

যে কারণে বাংলা ভাষার স্বদেশ-সঙ্গীতের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" এরূপ অনন্যলব্ধ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই, কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সম্ভবতঃ সমগ্র সভ্যজগতের আধুনিক সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের এই 'এষা' খানি, শোকসঙ্গীতের মধ্যে একটা অনন্যলব্ধ সত্য এবং সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ জগতে বিরহ-বিষাদ নিতান্ত বিরল নহে। অপিচ সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবন ও মরণ আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়াই রহিয়াছে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং—

মর্ত্ত্যের ইহা চিরন্তন অভিজ্ঞতা। আর সেই জন্য শোকও মানুষের সাধারণ নিয়তি। যেখানে আলোক সেইখানেই যেমন ছায়া, যেখানে জীবন সেইখানেই যেমন মৃত্যু; সেইরূপ যেইখানেই ভালবাসা সেইখানেই বিরহ ও শোক। যেই খানেই এ সংসারের দুটী প্রাণীতে কোনও প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে

সেই খানেই, বরুণের স্থায়, মৃত্যুর ছায়া ও শোকের নিঃশ্বাস, তৃতীয় হইয়া তাহাদের মাঝ খানে আসিয়া দাঁড়ায়। জীবনের মাঝখানেও আমরা মৃত্যুকে ভুলিতে পারি না। মিলনের গভীরতম আনন্দালোকের মাঝখানেও বিরহের কৃষ্ণমেঘ সকল সর্ব্বদা উড়িয়া বেড়ায়।

স্মমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

এই বিরহ-ভীতি প্রেমের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। জননী সন্তান বুকে ধরিয়া যখন এক চক্ষে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন তখনও আর এক চক্ষু বিরহাশঙ্কায় শোকজলে ভরিয়া আসে, এবং অমঙ্গল চিহ্ন ভাবিয়া তিনি তখন জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া রাখেন! অন্ধকার রজনীতে পেচকের ধ্বনি শুনিলে কুলকামিনীরা যেমন দূর দূর করিয়া উঠেন, সেইরূপ মানুষ মাত্রেই প্রিয়জনসঙ্গসুখ-মাঝেও এক একবার মৃত্যুর সাড়া পাইয়া, দূর দূর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহে। প্রেম যেখানে যত বেশি, শোকভীতিও সেইখানে তত বেশি। জীবনবস্তু যেমন বিশ্বজনীন, মৃত্যুব্যাপারও সেইরূপ বিশ্বজনীন। শোকও সেই জন্য একটা বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা। পুত্রশোকাতুরা জননী ভগবান বুদ্ধদেবের নিকটে পুত্রের প্রাণ চাহিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে বলেন, যে বাড়ীতে কখনও কেউ মরে নাই, সে বাড়ী হইতে এক মুষ্টি শস্য ভিক্ষা করিয়া লইয়া আইস, তোমার পুত্রকে বাঁচাইয়া দিব। দেশময় ঘুরিয়া অবোধ রমণী এমন ভিক্ষা কোথাও পাইল না। তখন বুদ্ধদেবের কৃপায় তার বিবেক জাগিয়া উঠিল। শোক কে না পাইয়াছে? মৃত্যুর হাহাকার কার প্রাণে না উঠিয়াছে? এমন কে আছে যে এ সংসারে স্নেহপ্রেমাদির আস্বাদন করিয়াছে, অথচ মৃত্যুর তীব্র বিষাক্ত হুল যার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া যায় নাই? অক্ষয়কুমারের এই গীতিকাব্যের উৎপত্তি শোকে, ইহার বিষয় জীবনমৃত্যুর নিত্য সমস্যা। এ অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন। এ সমস্যা সার্ব্বজনীন। আর সেই জন্যই ইহা কাব্যসৃষ্টির উৎকৃষ্ট উপকরণ।

অনেক লোকে এই সামান্য কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না তারা ভাবে, শোকটা শোকার্ত্তের অন্তরঙ্গ বস্তু, তার নিজস্ব জিনিষ। যুগ দম্পতির নববাসর প্রকোষ্ঠ যেমন অপরের দেখিবার নয়, সে প্রকোষ্ঠের কবাট খুলিয়া দিলে মাধুর্য্যের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়; শোক এবং বিরহও সেইরূপ দুনিয়াকে দেখাইবার বা জগতে জাহির করিবার বস্তু নহে, বহিঃপ্রকাশে তার গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। সত্য ও গভীর শোক আপনার চাপে আপনি প্রাণের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠে, চোকের ভিতর দিয়া পর্য্যন্ত গলিয়া বাহির হয় না, মুখে ব্যক্ত হওয়া তো দূরের কথা। শোকের প্রথম প্রকোপে তাহাই হয় বটে। কিন্তু এই জমাট, নীরব, নিরশ্রু শোক তখন কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তিবিশেষের অনুপ্রমাণ প্রাণের মধ্যে নিষ্পিষ্ট ও নিবদ্ধ। শোকার্ত্ত তখন আপনি আপনাতেই নিমগ্ন। আপনার মায়ায় আপনি দৃষ্টিহীন। আপনার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের ভাবে ও ভাবনায় আপনি আচ্ছন্ন। শোকবস্তু যে কেবল তার নিজের নয়, সকলের,

জগতের, বিশ্বের,—বিধান ; এ কথা তখন সে ভুলিয়া গিয়াছে, মনে করাইয়া দিলেও তার বিপরীত অর্থ করিয়া দেয় ; বলে—"তাতে আমার কি হইল ? আরও দশজনের প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে বলিয়া, পোড়ার যাতনাটা যে আমার হবে না, বা কমিবে, তার তো কথা নাই।" সহৃদয় স্বজনবর্গ যত তাহাকে নিজের আলোহীন বায়হীন, শব্দহীন, স্পন্দহীন, নিরেট, নিঠোল আমিত্বের সূচ্যগ্রপ্রমাণ ছিদ্র হইতে টানিয়া বাহিরে আনিতে চান, ততই সে জোর করিয়া সেই বিবরেই আরও ঢুকিয়া যাইতে চাহে। শোকটা এইরূপে যে আমারই ভাবে, সে কদাপি তার বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই শোক তামসিক। ইহা ভ্রমপ্রমাদাদি-প্রসূত। এ শোক দেহসর্ব্বস্ব ও অহংসর্ব্বস্ব। এই স্থূল, জড়, কঠোর বস্তু লইয়া কোমল কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

কিন্তু শোকের আর একটা দিক্‌ও আছে। শোকের আঘাতে মানুষ যেমন কখনও কখনও দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে, সেই রূপ কখনও কখনও দিব্যদৃষ্টিও লাভ করিয়া থাকে। যে স্নেহ, যে প্রেম, যে সেবা জীবনে এক আধারেতে নিবদ্ধ হইয়াছিল, মৃত্যু যখন সে আধার হরিয়া লইয়া যায়, তখন প্রথমে নিরাশ্রয় প্রেম কিছুকাল হাহাকার করে, কিন্তু ক্রমে বিশ্বময় ছড়াইয়াও পড়ে ?—কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনও তো দেখা গিয়াছে। ফলতঃ ইহাই বিশ্ববিধানে শোক ও বিরহের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট নিয়তি। এই নিয়তি লাভ না করিলে, শোক ও বিরহ কদাপি সম্যক সফলতা লাভে সমর্থ হয় না। আর শোক যখন শোকার্ত্তের ক্ষুদ্রজীবনের সংকীর্ণ পরিধিকে ছাড়াইয়া গিয়া, বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়, তার দুঃখ যখন জগতের দুঃখ, তার বেদনা যখন বিশ্বের বেদনা, তার সমস্যা যখন বিশ্বসমস্যা হইয়া পড়ে, তখনই সে শোককাব্যের উপযোগী উপাদান হইয়া উঠে। শোকে তখন আমার তোমার এ ভেদাভেদ থাকে না। তখন ইহা বিশ্বের হইয়া যায়।

শোক যখন এই বিশ্বজনীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা প্রকৃত কাব্যসৃষ্টির উপকরণ হইয়া থাকে। অক্ষয়কুমার তাঁর 'এষা'কে যে শোকের উপরে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে। এই জন্যই তাঁর নিতান্ত নিজের কথা ও ব্যথা যাহা, তাহাও তোমার আমার সকলেরই কথা ও ব্যথা হইয়া পড়িয়াছে। 'এষা'র শ্রেষ্ঠত্বের মূল তত্ত্বটী এই। কবি এখানে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া, সমগ্র মানব প্রাণের সঙ্গে সঙ্গত মিলাইয়া, তবে আপনার শোকগাথা গান করিয়াছেন। তাই তাঁর 'এষা'র মধ্যে প্রত্যেক শোকার্ত্ত পাঠক আপনাকে দেখিতে পাইয়া, এবং আপনার অন্তরের শোকের বা শোকস্মৃতির বিশ্বজনীনত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া, চকিত, স্তম্ভিত, পুলকিত হইয়া উঠে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

৩। কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও স্তোত্র

কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও স্তোত্র যে দ্বিসহস্র বৎসরেরও অধিককাল যুধিষ্ঠিরাদির স্মৃতিরক্ষা করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। কি কালিদাসের শকুন্তলায়, কি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ে, কি মাঘের শিশুপালবধে, কি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে, কি ভট্টনারায়ণের বেণীসংহারে, কি শঙ্করার্য্যের অচ্যুতাষ্টকাদি স্তোত্রে, কি অস্মৎকালীন রামনাথ তর্করত্নের বাসুদেববিজয়ে ও চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের চন্দ্রবংশে মহাভারতের কোন না কোন চরিত্র বর্ণিত। বাণভট্ট প্রভৃতি গদ্যলেখকও অর্জ্জুনাদির উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডী, বামন, ভোজরাজ, মম্মঠ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও মহাভারতের নিখিল চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি বলেন যে Homer ও Vergil-এর কল্পিত চরিত্রগুলিও ঐরূপ প্রতীচ্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত আছে; সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখ দ্বারা পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ হয় না। তাহার উত্তর এই যে Illiad বা Aniedএর চরিত্রগুলির সত্যতাপোষক কোন প্রমাণ নাই, যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্ব-প্রবাদ, পুরাণ ও তাম্রশাসন প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত। অতএব কাব্য প্রভৃতিতে তাঁহাদের উল্লেখ তাঁহাদের সত্তার পরিপোষক প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

৪। ঐতিহাসিক গ্রন্থ

(ক) কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী

কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী প্রধানতঃ কাশ্মীরের ইতিহাস হইলেও উহাতে ভারতের অন্যান্য দেশের ঘটনার উল্লেখ আছে। উহার মতে যুধিষ্ঠির কাশ্মীররাজ প্রথম গোনর্দ্দের সমসাময়িক এবং কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে আবির্ভূত হন, এই বিষয় মহাভারতের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে বিশদরূপে বিবৃত হওয়ায় এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হর্ষচরিতাদির ন্যায় সংস্কৃতজীবনীগ্রন্থেও ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরাদির উল্লেখ আছে।

(খ) রাজপুতানার রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি অনুবংশ গ্রন্থ

রাজপুতানার রাজতরঙ্গিণীতে যুধিষ্ঠিরের অব্দ প্রচলন থাকা উল্লিখিত আছে। যুধিষ্ঠিরাদি ঐতিহাসিক পুরুষ, তাহা রাজপুতানার সকল চারণ, কবি আবহমান বিশ্বাস করিয়াছেন। রাজপুতানার বংশসংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থে কুরুপাণ্ডবগণ ঐতিহাসিক পুরুষ বলা আছে। পরীক্ষিৎ হইতে রাজপাল পর্য্যন্ত চারিটি শাখার ৬৬ জন নৃপতি রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত। রাজপাল বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ১০০ জন রাজা চৌহান বংশাবলী সংক্রান্ত গ্রন্থনিচয়ে দেওয়া আছে। এই সমস্ত

নিদর্শন দেখিয়া Todd সাহেব যুধিষ্ঠিরাদির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

৫। তাম্রশাসনাদি

সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে হিন্দু প্রাচীন নৃপতিগণের দানপত্র, প্রশস্তি প্রভৃতি নানাবিধ তাম্রশাসন শিলালেখ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রত্নতত্ত্বগণের অধ্যবসায়ে আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রামাণিক প্রাচীন লেখমালাও মহাভারতের ঐতিহাসিকতার সাক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ, বিদুর, রুক্মিণী প্রভৃতি মহাভারতের যাবতীয় পুরুষ ও নারী উপমানস্বরূপ ঐ সমস্ত লেখে বার বার উল্লিখিত হইয়াছেন। শক ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত উঁহাদের উল্লেখ দেখাইবার জন্য নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের ১৬ খানি দানপত্র ও প্রশস্তি হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

১। ভোজরাজ বংশীয় অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের দানপত্র—১২৭২ শক, ১৫ভাদ্রপদ বুধবার।

এই দানপত্রে ভীম, যুধিষ্ঠির ও কংসজিৎ কৃষ্ণের উল্লেখ নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকে পাওয়া যায়।

ভীমেনাপি ধৃতা মূর্দ্ধি যৎপাদা স যধিষ্ঠিরঃ।
বংশাগ্রেনেন্দুনা জীয়াৎ স্বতুল্য ইব নির্ম্মিতঃ॥
পরমারকুলোত্তংসঃ কংসজিন্মহিমা নৃপঃ।
শ্রীভোজদেব ইত্যাসীন্নাসীরাক্রান্তভূতলঃ॥

২। পদ্মনাথ দেবালয়ে সমুৎকীর্ণ প্রশস্তি ১১৫৪ সম্বৎ। এই প্রশস্তিতে রাজা দেবপালকে কর্ণ, পার্থ ও ধর্ম্মরাজের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; যথা—

ত্যাগেন কর্ণমজয়ৎ পার্থং কোদণ্ডবিদ্যয়া।
ধর্ম্মরাজঞ্চ সত্যেন স যুবা বিনয়াশ্রয়ঃ॥১৫শ্লোক

এই প্রশস্তির ৪৯ শ্লোকে চতুর্থ চরণে বৃকোদরের নাম আছে; যথা—

কস্ত্বং কবীন্দ্রকৃতমোদ বৃকোদরস্য।

৫০ শ্লোকে অর্জ্জুনের গন্ধর্ব্বরাজজয়ের কথা আছে, যথা—

একস্ত্বমীশ ভুবি ধন্বভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
সস্বামিকারিগণ-দর্পহরস্ত্বমাজৌ।
গন্ধর্ব্ব রাজপুতনা বিজয়াপ্তকীর্ত্তি—
স্ত্বং কোঽসি সুন্দর পুরন্দরনন্দনস্য॥

৫১ শ্লোকে দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন ও বিকর্ত্তন অর্থাৎ কর্ণের নাম আছে, যথা—

দুর্যোধনারিবলদর্পহৃতস্তবেশ
যত্নঃ পরার্জ্জুনযশঃপ্রসরং নিয়োদ্ধুম্।
ত্বং কোঽসি সূর্য্যজনিতপ্রমদার্থিসার্থ-
দৌর্গত্যকর্ত্তনবিকর্ত্তনসম্ভবস্য॥

নিম্নে ৬১ শ্লোকে পুনরায় পার্থ ও ব্যাসদেবের নাম উল্লেখ হইয়াছে এবং উত্তরগোগৃহ যুদ্ধের ব্যাপার বলা হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে শ্লোক দেওয়া হইল না।

৩। নেপালক্ষিতিপাল বংশাবলী—নেপাল সংবৎ ৭৮৭, এই প্রশস্তিতে যক্ষ মল্লকে কর্ণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

তৎপুত্রো যক্ষমল্লঃ প্রবল রিপুহরঃ কর্ণতুল্যোঽবনীশঃ।

তৎপুত্র রত্নমল্লকে পার্থতুল্য বলা হইয়াছে।

৪। নেপাল মহীপাল সিদ্ধিনৃসিংহ মল্লের প্রশস্তি নেপাল সং ৭৫৭। ইহাতে হরিহর সিংহকে কর্ণোপম বলা হইয়াছে।

তনয়োঽস্য বিনয়পূর্ণো বভূব
কর্ণোপমো ভূবো—

হবিহবসিংহনরেন্দ্রো বসুধাচন্দ্রো

বভূবাহংসৌ—

সিদ্ধি নৃসিংহ মল্লকে (ভীমানুজঃ সাহসে) বলা হইয়াছে এবং তিনি যধিষ্ঠিব অপেক্ষা প্রতিষ্ঠাশালী, ও তাহাব বাক্‌পটুতা ব্যাসতুল্য বলা আছে। পুনবায় তাঁহাব যুদ্ধশক্তি বর্ণনা কালে তাঁহাকে পার্থিবঃ পার্থতুল্যঃ বলা হইয়াছে। বাজসূয় যজ্ঞেবও উল্লেখ দেখা যায, যথা—

বাজসূয় ইবাবদ্ধো মধ্যস্থেন মহীভুজা।

তাঁহাব উপাধ্যায় বিশ্বনাথ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

যো ব্যাসবদ্বিবিধবৈদিকমন্ত্রপাঠে।

৫। যাদববংশোদ্ভব বীব বল্লালদেব মহীপতির দানপত্র, ১১১৪ শক। এই দানপত্রে শ্রীহবি যে কৃষ্ণরূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাব উল্লেখ বহিয়াছে।

৬। কাটদণ্ডনাথেব দানপত্র, কুল নিকট মনায়ক ১০৫৬ শক। এই দানপত্রে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে

যো ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র প্রতিনিধিরবনিত্রাণনে
হি কার্ত্তবীর্য্যঃ
প্রায়ঃ শৌর্য্যে কিবীটীস্ফুটমহিমরুচা
তুল্য এব প্রতাপে।
ঔদার্য্যে কর্ণকল্পঃ স্মরইব বপুষি-
স্মাসদৃক্ষঃ ক্ষমায়াং
সৌজন্যে যস্ত লোকে কথমপি সদৃশো
বিক্রমাদিত্যএব॥

৭। চালুক্যবংশীয় চোড়নৃপতির দানপত্র ১০০১ শক। এই দানপত্রে ব্রহ্মা হইতে জনমেজয়ের পৌত্র পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশ মহাভারতের অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে।

শান্তনু হইতে এইরূপে বংশাবলী আছে—

শান্তনু
বিচিত্রবীর্য্য
পাণ্ডুবাজ
অর্জ্জুন
অভিমন্যু
পবীক্ষিৎ
জনমেজয়
ক্ষেমুক
নববাহন
শতানীক
উদয়ন

অর্জ্জুনেব খাণ্ডবদাহ পাশুপতাস্ত্র লাভ, কালকেয়াদি-দৈত্যবিনাশ প্রভৃতি অবদানেবও উল্লেখ আছে।

৮। শিলাহাব বংশোদ্ভব শ্রীছিত্তরাজ দেবের দানপত্র ৯৪৮ শক। ইহাতে অপরাজিত বাজা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

কর্ণস্ত্যাগেন যঃ সাক্ষাৎ সত্যেন চ যুধিষ্ঠিবঃ।

৯। চালুক্যবংশীয় বাজবাজাপরনামা শ্রীবিষ্ণুবর্দ্ধনেব দানপত্র, ৯৪৪ শক।

এই দানপত্রেও চন্দ্রবংশেব আমূল পবিচয় আছে। শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য, পাণ্ডু, পাণ্ডব, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, পরীক্ষিৎ, জনমেজয় প্রভৃতি সকলেরই নাম আছে এবং তাঁহাদের বংশধর বলিয়া বিষ্ণুবর্দ্ধন আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

১০। শ্রীধরণী বরাহাখ্য নৃপতির দানপত্র ৮৩৬ শক। ইহাতে ধবণী বরাহ নৃপতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে

যস্ত্যাগশৌর্য্য সৌভাগ্যগর্ব্বিতঃ কর্ণ পার্থ
কুসুমশরান্।
হ্রেপয়তীবাধিকতর নিজচরিতৈর্লীলয়ৈব নৃপঃ॥

১১। রাষ্ট্রকূট বংশোদ্ভব শ্রীধ্রুবরাজের দানপত্র, ৭৮৯ শক। এই দানপত্রে শ্রীকর্ক্করাজ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

পার্থঃ সদৈব ধনুষি প্রথমঃ শুচীনাম্।

১২। রাষ্ট্রকূট বংশীয় কর্করাজের দানপত্র ৭৩৪ শক। কর্করাজের পিতৃব্য গোবিন্দরাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধে পার্থ অর্জ্জুন উল্লিখিত—

চক্রে তথাহি ন তথাস্ত বধং পরেষাং
পার্থোঽপি নাম ভুবনত্রিতয়ৈকবীরঃ॥

১৩। সূর্য্যবংশীয় প্রতাপমল্ল নৃপতির প্রাসাদ প্রশস্তি—সংবৎ ৭৬৯। প্রতাপমল্লের পত্নী রূপমতীকে "সাক্ষাৎপরা রুক্মিণী" বলা হইয়াছে।

১৪। মন্দসোরকূপস্থিত প্রশস্তি—সংবৎ ৫৮৯। ইহাতে ভগবদ্দোষকে বিদুরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যথা "বহুনয় বিধিবেধা গহ্বরেহপার্থমার্গে বিদুর ইব বিদূরং প্রেক্ষয়া প্রেক্ষমাণঃ"।

১৫। মন্দসোরের সূর্য্যমন্দির প্রশস্তি—সং ৫২৯। ইহা সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তবংশীয় কুমার গুপ্তের কালীন। কুমার গুপ্তের সামন্ত নৃপ বিশ্ববর্ম্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

"রণেষু যঃ পার্থসমানকর্ম্মা বভূব
গোপ্তা নৃপবিশ্ববর্ম্মা"

১৬। কোটাপ্রান্তস্থবিহার প্রশস্তি, সংবৎ ৭। মাঘশুদি ইহাতে ও সর্ব্বনাগের পত্নীর গুণ বর্ণনা কালে কৃষ্ণ ও শ্রীর উল্লেখ হইয়াছে।

তস্যাভূদ্দয়িতা বিশুদ্ধযশসঃ শ্রীরিত্যুরঃ-
শায়িনী
কৃষ্ণস্যেব মহোদয়া চ শশিনো জ্যোৎস্নেব
বিশ্বংভরা। ইত্যাদি।

উক্ত ষোড়শ দানপত্র ও প্রশস্তি হইতেই দেখা গেল যে, মহাভারতকার ও মহাভারতের যাবতীয় পুরুষের উল্লেখ আছে। এইরূপ উল্লেখ অন্যান্য তাম্রশাসনাদিতেও পাওয়া যাইবে। ইহাদের দ্বারা প্রমাণ হয় যে গত দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কুরুপাণ্ডবগণ যথার্থ জীব বলিয়া বিশ্বস্ত। যদি ঐরূপ পরম্পরিত প্রমাণে সন্তোষ না হন, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ

১৭। তদ্ভ্রাতৃপ্রপৌত্র জনমেজয়ের দানপত্র দেখুন।

এই দানপত্র Indian Antiquiryর চতুর্থভাগে ৩৩৩ ৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। Bombay নির্ণয়সাগরপ্রেসের পাচীন লেখমালায় পুনর্মুদ্রিত। ইহার কাল যুধিষ্ঠিরাব্দ ৮৯।

ইহার দাতা মহারাজাধিরাজ বৈয়াঘ্রপত্য-গোত্র জনমেজয়। তর্পণে ভীষ্মের প্রণামে জানা যায় যে ভীষ্মদেব বৈয়াঘ্রপদাগোত্র, সুতরাং জনমেজয়ও সেই গোত্র সন্দেহ নাই। অতএব এই দানপত্রে "বৈয়াগ্রনীপাদগোত্রজঃ" শব্দ বৈয়াঘ্রপাদগোত্রজঃ শব্দের লিপিকর প্রমাদ সন্দেহ নাই। পশ্চিমদেশস্থ সীতাপুর বৃকোদরক্ষেত্রে তত্রত্য মুনিবৃন্দ মঠের সীতা-রামের পূজার জন্য এক ক্ষেত্র যতিগণের হস্তে দেওয়া হয়। সেই ক্ষেত্রের চতুঃসীমা এইরূপ—

উত্তরবাহিনী তুঙ্গ ভদ্রার পশ্চিমে, অগস্ত্যা-শ্রমের উত্তরে, পাষাণ নদীর পুর্ব্বে, ভিল্লা নদীর দক্ষিণে—

এই দানপত্রের জনমেজয় যে যুধিষ্ঠিরের বংশীয় তাহার পরিচয়

"অস্মৎপ্রপিতামহ যুধিষ্ঠিরাধিষ্ঠিত
"মুনিবৃন্দক্ষেত্রে"

ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট জানা যায়।—

কিষ্কিন্ধ্যানগরী হইতে এই দানপত্র হওয়ায় ইহা অবিশ্বাস্য নহে। রাজা জনমে-

জয় তক্ষশিলা প্রভৃতি জয় করেন, ইহা মহাভারতে লেখা আছে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত একচ্ছত্রাধিপ ছিলেন। দাক্ষিণাত্য বিজয়ও তাঁহার সম্ভব। সেইকালে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে সিংহাসনস্থ হইয়া উপরোক্ত ক্ষেত্র ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য যতিহস্তে দান সম্ভবপর। সীতাপুর নামে অযোধ্যায় এক জেলা আছে তাহা উক্ত দানপত্রের সীতাপুর কি না বলা কঠিন। তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার শাখা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উঠিয়াছে। ইহা অনেকদূর ভিন্না পর্য্যন্ত উত্তরবাহিনীও বটে। পাষাণ নদী ও ভিন্না নদীর নাম আজিকালি মানচিত্রে নাই। Wards বলিয়া তুঙ্গভদ্রার শাখা আছে তাহা কি ভিন্না? ভিন্না যদি কৃষ্ণার লিপিকর প্রমাদ হয় তাহা হইলে জনমেজয়ের প্রদত্ত ক্ষেত্রের নির্ণয় হইতে পারে। এই বিষয়ের মীমাংসা প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণের উপর ন্যস্ত হইল।

শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্ম্মপ্রচারক ও সাহিত্যিক

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১) ব্রাহ্মসমাজে নগেন্দ্রনাথ

একদিন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষিত বাঙালী সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এক কেশবচন্দ্র ছাড়া, তাঁর মতন অত বড় বক্তা বাংলাদেশে ছিল না, বলিলেও চলে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তখনও ততটা খ্যাতি লাভ করেন নাই। শিবনাথ বাবুর মতন শক্তিশালী বক্তা আজিও বাংলাদেশে আছে কি না সন্দেহ। একদিন এই শিবনাথ শাস্ত্রীও নগেন্দ্রনাথের নীচে ছিলেন। কোন্ দিন তিনি নগেন্দ্রনাথকে ছাড়াইয়া যান, নগেন্দ্রনাথ নিজেই সে গল্প করিতেন। ১৮৮৩—৮৪ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে "জাতিভেদ" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতা বোধ হয় পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে শিবনাথ বাবু অমন ওজস্বিনী বক্তৃতা আর কখনও করেন নাই। হাস্য, করুণ, রুদ্র প্রভৃতি রসের আশ্চর্য্য সমাবেশে এই বক্তৃতাটী অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। এই বক্তৃতার পরেই, মন্দির হইতে বাহির হইয়া, নগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "এতদিন আমি শিবনাথের উপরে ছিলাম, আজ শিবনাথ আমার উপরে চলিয়া গেলেন।"

নগেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহা আজ পর্য্যন্ত আর কোনও বাঙালী বক্তার মধ্যে দেখিতে পাই নাই। হাস্যকৌতুকের অবতারণায় নগেন্দ্রনাথের অদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি লোককে এতই হাসাইতেন যে বক্তৃতা করিতে উঠিবা মাত্রই

তাঁহাকে দেখিয়া, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে হাসির তরঙ্গ ছুটিয়া যাইত। অথচ তাঁর রসিকতায় কোনও কুরুচি কিম্বা তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে কখনও কোনও ঈর্ষাদ্বেষের গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না। তাঁর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এমনই সবল, উদার, সুনিপুণ ছিল যে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এ সকল বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তারা পর্য্যন্ত তাহাতে ব্যথা পাওয়া দূরে থাক, আমোদই অনুভব করিত। কেবল কথার কৌশলে এটা কোথাও হয় না। প্রাণের নির্ম্মল দ্বেষহিংসাদিশূন্য ভাবেই কেবল লোকে বিপক্ষের মত খণ্ডন করিতে যাইয়াও তার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে। এই নির্ম্মল ভাবটী নগেন্দ্র বাবুর ভিতরে চিরদিনই দেখিয়াছি।

নগেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার আর একটা বিশেষত্ব ছিল—তাঁর যুক্তি ও বিচারের সূক্ষ্মতা। ফলতঃ এ বিষয়ে নগেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা, বোধ হয়, কেশবচন্দ্রের দৈবী প্রতিভাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্র ভাবুক লোক ছিলেন। তিনি ভাবরাজ্যেরই রাজা ছিলেন। ভাবকে জাগাইয়াই তিনি জনমণ্ডলীকে চকিত, পুলকিত, আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিতেন। সে মাদকতা নগেন্দ্রনাথের বা বাংলার আর কোনও বক্তার বক্তৃতাতে কখনও ছিল না, এখনও নাই। কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করিতে উঠিয়া অপূর্ব্ব ভোজের বাজি খেলিতেন। লাগ্ ভেলকী লাগ্ বলিয়া, সত্য সত্যই লোকের মনে অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া দিতেন। তাঁর কথার কৌশলে ও ভাবের বন্যায় অবস্তু বস্তু হইয়া উঠিত, শূন্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, ছাই মুঠো সোণাদানা হইয়া পড়িত। এ অদ্ভুত যোগসিদ্ধি তাঁর ছিল। ভাবের রাজ্যে বাঙালী যা পারে না, ভারত তাহা পারে না, জগৎ তাহা পারে না। আর কেশবচন্দ্র ভাবের ঘরে ঢুকিয়া এমন সব খেলা খেলিয়া গিয়াছেন, যাহাতে জন্মজন্মান্তরসিদ্ধ বাঙালী ভাবুকের দল পর্য্যন্ত বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা বড় বেশি একটা যুক্তি-প্রতিষ্ঠ হইত না। তর্কযুক্তির দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা প্রবক্তাদিগের ধর্ম্মও নহে। প্রবক্তা ও কবি—একই বস্তু। এঁরা উভয়েই সত্যের সাক্ষ্য দান করেন, 'যে হেতু' 'অতএব'এর দ্বারা যুক্তিপরম্পরার উপরে আপনাদের শিক্ষা বা আদর্শকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন না। নগেন্দ্রনাথ প্রবক্তাও ছিলেন না, কবিও ছিলেন না, কিন্তু অতি উচ্চ দরের বাগ্মী মাত্র ছিলেন। আর তাঁর বক্তৃতার যুক্তিযুক্ততা নগেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার একটা বিশেষ ধর্ম্ম ছিল। তিনি লোককে মাতাইতেন না, কিন্তু সম্‌জাইতেন। ভাবের আবেশে তাহাদিগকে আপনার পক্ষে টানিয়া আনিতেন না, কিন্তু যুক্তি ও তর্কের দ্বারা স্বমতের প্রতিষ্ঠা ও পরমত খণ্ডন করিতেন। আর এই পথে তিনি যাহাদিগকে সম্‌জাইয়া শিখাইয়া কোনও বিশেষ তত্ত্বের সন্ধান দিতেন, তারা সেই তত্ত্বের উপরে স্থির ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিত।

নগেন্দ্রনাথ যে ভাবুক ছিলেন না, তাহা নহে। তাঁর মতন প্রকৃত ভাবুক লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁর ভাব সর্ব্বদা জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ ছিল। ভাবের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে, নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই, তাহার সত্যাসত্য পরখ করিয়া

লইতেন। সেন্ট্ পলের উপদেশে আছে সকল বস্তুকে প্রমাণ প্রয়োগে আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, তার পর যাহা সত্য তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। (Prove all things and hold fast to that which is true)। নগেন্দ্রনাথ যেরূপ ভাবে এইটী সাধন করিয়াছিলেন, এমনভাবে আর কোনও ব্রাহ্ম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। Prove all things—সর্ব্ববিধ বিষয়কে আগে পরখ করিবে, বড় কঠিন কথা। লোকের এই পরখ করিবার প্রবৃত্তিই সাধারণতঃ বড় কম। আর ধর্ম্মসমাজে এ প্রবৃত্তি সকলের চাইতে দুর্ল্লভ। যারা ধর্ম্মের দল বাধে, তারা সত্যকে তো লাভ করিয়াই বসিয়াছে, কোনও বিষয় পরখ করিবার প্রয়োজন-বোধ তাদের বড় থাকে না। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াও, সত্যলাভের এই সনাতন পন্থা কথনওই পরিত্যাগ করেন নাই। যে ভাব লইয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে আইসেন, সেই ভাব লইয়াই, এই সমাজে আপনার দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এমন মুক্ত মন ও বুদ্ধি, কি ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কি তার বাহিরে, কোথাও বেশী দেখি নাই। নগেন্দ্রনাথের প্রাণের দরজা জানালা সর্ব্বদাই যেন খোলা থাকিত। এক প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্যতীত, আর কাহাকেও সত্যের এমন মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দেখি নাই। সত্য বস্তু যে নগেন্দ্রনাথের নিকটে কেবল প্রাচীন সমাজের শাস্ত্রাদি অপেক্ষাই বড় ছিল, তাহা নহে; আপনার দলের ও সম্প্রদায়ের মতামত, সিদ্ধান্ত ও সংস্কার অপেক্ষাও সত্য বস্তু তাঁর চক্ষে সর্ব্বদাই বড় হইয়া ছিল। আর সত্যের সংখ্যানাই যে তিনি বা তাঁর সম্প্রদায় নিঃশেষ করিয়া জানিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের মতের ও অভিজ্ঞতার বাহিরে,—এমন কি এ সকলের সঙ্গে সঙ্গতি খায় না, এমন সত্য যে দুনিয়ায় নাই বা থাকিতে পারে না,—নগেন্দ্রনাথ আমরণ একদিনও এমনটী ভাবিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর এই জন্যই তিনি সকল সাধনা ও সকল সম্প্রদায়কেই অতি উদার ভাবে দেখিতেন। থিয়সফি যখন এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের মধ্যে এক নগেন্দ্রনাথই, বোধ হয়, আগ্রহাতিশয় সহকারে, থিয়সফিকাল সোসাইটীর সভ্যপদ গ্রহণ করেন। এই জন্য তাঁহাকে তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুগণের হস্তে অনেকটা লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তো আর ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের কুড়ি বছরের সংস্কারকে সনাতন ও অনন্ত সত্যের আসনে কথনও প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সত্যের অন্বেষণেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের খাতিরে সত্যের সন্ধান করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের লোকে ইহা মানে কি না,—ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে কি না, নগেন্দ্রনাথ কোনও নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইলে, কদাপি এই সংকীর্ণ ও অনুদার প্রশ্ন তুলিতেন না। ইহা সত্য কি না, সেই প্রশ্নই তাঁর নিকটে সকলের চাইতে বড় প্রশ্ন ছিল। ব্রাহ্মেরা থিয়সফি মানে কি না, এ কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। থিয়সফিতে কোনও সত্য আছে কি না, তারই বিচার করিলেন। আর থাকা অসম্ভব নহে দেখিয়া, সেই সত্যের সন্ধানেই তিনি থিয়সফির

দলভুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মেরা এই জন্য তাঁহাকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ এই নির্য্যাতনের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ব্রাহ্মদিগের খাতিরে তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসেন নাই, সত্যের খাতিরেই আসিয়াছিলেন সুতরাং ব্রাহ্মদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজও ছাড়িয়া গেলেন না; আর তারা পছন্দ করে না বলিয়া যতক্ষণ না আপনি থিয়সফির দোষ পাইয়াছেন, ততক্ষণ থিয়সফিকেও ছাড়িলেন না। কতটা সত্যানুরাগ ও মানসিক তেজ থাকিলে মানুষ এমনভাবে অটল হইয়া থাকিতে পারে! এই সত্যানুরাগ ও এই মানসিক তেজেই একদিন ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে অনুরাগ ও সে তেজের অভাবেই আজ তাহা এমন শক্তিহীন ও তেজহীন হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মফল খণ্ডাইবে কে?

যাঁরা প্রথম যৌবনে—'সত্যং শাস্ত্রং অনশ্বরং' বলিয়া সকল শাস্ত্রের উপরে নিজেদের স্বাভিমতকে বসাইয়াছিলেন, তাঁদের অনেকেই বয়োবৃদ্ধি সহকারে, আপনাদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অসংস্কৃত লোকমতকে অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতসারে, জগতের শাস্ত্রাদির ও আপনাপন স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে এখন "ইহা সত্য কি না?"—এ প্রশ্ন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। "ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি না?" এই প্রশ্নটাই সর্ব্বদা তোলা হয়। "ইহা সত্য কি না?"—স্বাভিমতের কথা। "ইহা অমুক ধর্ম্ম কি না?"—এ স্মৃতির কথা। কিন্তু যখন কোনও সমস্যা উঠিলে, ইহা হিন্দুধর্ম্ম কি না জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি এই সমস্যাকে হিন্দু-স্মৃতির সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে মিলাইয়া লইতে চান। বেদের সঙ্গেও নহে আর স্বাভিমতের সঙ্গেও নহে।

বেদস্মৃতি সদাচার স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

ধর্ম্মের এই তিন লক্ষণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে। কিন্তু দুনিয়ার সর্ব্বত্রই বেদ ও স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ যাহাকে স্বাভিমত বলা হয়, এই দুই লক্ষণের চাইতে স্মৃতিকে বলবত্তর করিয়া তুলিয়াছে। গতানুগতিকতার প্রতিষ্ঠা স্মৃতিতে। আর গতানুগতিক ধর্ম্মে স্মার্ত্তেরাই প্রবক্তা ও সদ্‌গুরুর আসন দখল করিয়া বসেন। গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্মেও ইহা দেখিতে পাই। গতানুগতিক খৃষ্টীয়ান্ বা মোহম্মদীয়ান্ ধর্ম্মেও তাহাই দেখিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মই যে কেবল গতানুগতিক হয় তাহা নহে। যেখানেই ধর্ম্ম সাধন ছাড়িয়া মতে ও আচারমাত্রে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়; যেখানেই ধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অন্তরঙ্গ সাধনের ব্যাপার না হইয়া, কেবল কতকগুলি সামাজিক সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদিতে পরিণত হয়; যেখানে ধর্ম্মের নিত্য ভজনার দিক্ মলিন হইয়া, নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের দিক প্রবল হইয়া পড়ে, সেইখানেই তাহা গতানুগতিক হইয়া যায়। নূতন ধর্ম্মও এরূপ গতানুগতিকতা প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মও এই অত্যল্পকাল মধ্যেই এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্য এখানেও স্মৃতি বেদ ও স্বাভিমত উভয়কেই অতিক্রম করিয়া, একমাত্র ধর্ম্মের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে কি বুঝিতেন, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে কি বস্তুকে বুঝিয়া-

ছিলেন, অথবা ব্রাহ্মসাধারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে কি জানেন ও বোঝেন, এখন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। আর এই জন্য মত বা সাধনবিশেষ সত্য কি না, এ প্রশ্নের পরিবর্ত্তে এখন ব্রাহ্মসমাজেও "ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি না?" এই প্রশ্নই সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। "যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম" বলিয়া মনকে চোক ঠার দিবার চেষ্টাতে এই গতানুগতিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ঢাকিয়া বা মুছিয়া যায় না। ইংরেজি ন্যায়শাস্ত্র বোধ হয় এই প্রকারের যুক্তিকেই arguing in a circle বলে। এই যুক্তির বিশেষত্ব এই যে, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া নিয়া, সেই স্বতঃসিদ্ধতার উপরেই আবার তার প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নগেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি এই গতানুগতিকতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁর সমাজের বা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতকে তিনি কদাপি সত্যের উপরেও বসান নাই, সত্যের নিদর্শন এবং প্রামাণ্য বলিয়াও গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে তিনি যাহা বুঝিতেন, তার কোনও অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কোনও ধর্ম্মেরই অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র-প্রামাণ্যে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। ধর্ম্ম মাত্রেই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি ও সহজ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য ধর্ম্মমাত্রেই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ। আর জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও যুক্তির প্রতিষ্ঠা এ দু'য়েতে যে আকাশপাতাল প্রভেদ রহিয়াছে, ইহাও তিনি সর্ব্বদাই জানিতেন ও মানিতেন। জ্ঞান বস্তুর বা তত্ত্বের সমগ্রকে গ্রহণ করে, যুক্তি তার অংশবিশেষ মাত্রে পৌঁছায়। এই সমগ্র জ্ঞানবস্তুকে তিনি বিশ্বাস বলিতেন। এইজন্য কঠোর যুক্তিবাদী হইয়াও, নগেন্দ্র বাবু পরমবস্তু তর্কের দ্বারা লাভ করা যায়, কদাপি এমনটা বিশ্বাস করিতেন না।

"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদুর।"

এই কথা অনেকবার তাঁর মুখে শুনিয়াছি। তবে বিশ্বাসেরও একটা জ্ঞানের ভূমি এবং ভিত্তিও যে আছে, ইহাও তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন এইজন্য যে, তাঁর নিকটে এই ধর্ম্মটী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি ধর্ম্মবিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে করিতেন, এইজন্যই তিনি ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁর নিকটে চিরদিনই সত্য আগে ছিল, লোকে যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলে, তাহা তার পরে স্থান পাইত। আর এই গভীর সত্যানুরাগ এবং ধর্ম্মানুরাগের জন্যই নগেন্দ্রনাথ, এমন অসাধারণ শক্তিসাধ্য থাকিতেও, মামুলী ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে কখনই তেমন প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

নগেন্দ্রনাথ সকল বস্তুই পরখ করিয়া দেখিতেন বলিয়া, প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজচ্যুত ও হৃতসম্পত্তি হইয়াও, কেশব বাবুর দলে উপযুক্ত মর্য্যাদা ও আপনার শক্তি ও সাধনার উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হন নাই। সে সময়ের ব্রাহ্মমাত্রেই non-conformist (নন্‌কনফর্মিষ্ট) ছিলেন। সমাজ

বা সম্প্রদায়ের আনুগত্যকেই conformity (কনফর্মিটি) কহে যাঁরা এরূপ আনুগত্য স্বীকার করেন না, তাঁরাই ননকন্‌ফর্মিষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, সকলেই আদিতে এই ভাবাপন্ন ছিলেন নতুবা তাঁরা একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়া তুলিতে পারিতেন না। কিন্তু আপন আপন দলটী পাকিয়া উঠিলে, ইঁহারা নিজেরাই সম্প্রদায়ানুগতাকে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের অনভিমত সিদ্ধান্ত বা আচার-আচরণাদিকে অধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সকল সম্প্রদায়েই এই সকল সম্প্রদায়দ্রোহীদের নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। কেশবচন্দ্রের সকল কথা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতেন না বলিয়া, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ কখনও এ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, ধর্ম্মবন্ধুদিগের নির্য্যাতন, আপনার স্বাভাবিকীশক্তি ও প্রতিভার নিষ্ঠুর সঙ্কোচন, এ সকলের কিছুতেই তাঁর সত্যানুরাগের কণামাত্র নষ্ট করিতে পারে নাই। কুচবিহার-বিবাহোপলক্ষে কেশবচন্দ্রের দল ভাঙ্গিয়া গিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইলে, শিবনাথ এই নিষ্পেষণ ও নির্য্যাতনের হাত এড়াইলেন বটে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের সত্যানুরাগ তাঁহার এই নূতন দলেও একান্ত আনুগত্য গ্রহণের অন্তরায় হইয়া রহিল। এখানে তিনি কতকটা কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁর শক্তি ও চরিত্রের যথাযথ মর্য্যাদা পাইলেন না। আর তাঁর নন্‌-কনফর্মিটী (non-conformity)ই ইহার প্রধান এবং একমাত্র কারণ।

নগেন্দ্রনাথের মনোরাজ্যে দুইটী শক্তি চিরদিন সমভাবে প্রবল হইয়া ছিল। একটী তাঁর যুক্তিপ্রবণতা, অপরটি তাঁর আস্তিক্য-বুদ্ধি। সচরাচর এই দুইটী বস্তু এক সঙ্গে থাকে না। যুক্তিপ্রবণ চিত্তে বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি বড় দেখা যায় না; আর শ্রদ্ধাপ্রবণ চিত্তে যুক্তিপ্রবণতাও বেশি দেখা যায় না। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুইটী বিরুদ্ধ গুণের আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিয়াছি। এই অপূর্ব্ব সমাবেশ, আরো বিশদ ও গভীর রূপে দেখিয়াছি আর একজন সাধুপুরুষে। তিনি নগেন্দ্র বাবুর আজীবন বন্ধু ও সমসাধক ৺কালীনাথ দত্ত। কেবল যদি তাঁর বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধিই থাকিত, তবে যে অবস্থাধীনে নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে দিন কাটাইয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায় কখনওই আমরণ এ যোগ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য দিকে যদি তাঁর এই আস্তিক্যবুদ্ধি না থাকিত, অথবা এতটা প্রবল না থাকিত, তাঁর কেবল যুক্তিপ্রবণতাই যদি থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে এতটা কোনঠাসা হইয়া পড়িয়াও থাকিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিকী যুক্তি-প্রবণতা নগেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া রাখিয়াছিল। তাঁর প্রকৃতিগত বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি অন্যদিকে সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্রাহ্মগণ্ডীর বাহিরে, সাধু ও সাধকমণ্ডলীর মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া যাইত। যুক্তিপ্রবণ নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত অনেকটা মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মেরই সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু আস্তিক্য-বুদ্ধিপ্রবণ নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধন মামুলী

ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত গুরমুখী কর্ত্তাভজা দিগের পন্থা আশ্রয় করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, ইঁহারা নিজেরাই স্বল্প বিস্তর গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কদাপি গুরু-আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা তিন জনেই স্বয়ংকৃত গুরু হইয়াছিলেন এ বিষয়ে, 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়' ইঁহাদের তিন জনের কেহই এই পথ অবলম্বন করেন নাই। আর সেই জন্য মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মে গুরু-আনুগত্যের প্রতিষ্ঠাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। গুরুতত্ত্বটী পর্য্যন্ত তাহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্ম গুরুবিরোধী। অতএব গুরুপন্থী নগেন্দ্রনাথ যে এখানে কোনঠ্যাসা হইয়াছিলেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

এখন তো ব্রাহ্মসমাজ ধনে মানে ভোগে বিলাসে ফাপিয়া উঠিয়াছে। এখন কেহ কেহ সংসারের লোভেও ব্রাহ্মসমাজে আসিতে পারে, আসিতেছে কি না, ইহাও বলিতে পারি না। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তখন ব্রাহ্মেরা একটা মুষ্টিমেয়, নগণ্য, দারিদ্র্যপীড়িত দল ছিলেন। কিন্তু সেই দারিদ্র্য ও নগণ্যতার মধ্যেই যে তেজ ও শক্তি ফুটিয়াছিল, তাহই কিম্বদন্তীমাত্র আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মচরিত্র আজিও বাঁচিয়া আছে। তখন লোকে ব্রাহ্ম হইতেন শুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য, শুদ্ধ মোক্ষের লালসায়। ধর্ম্মের জন্য পাগল হইয়া যাঁরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, তাঁরা সেই ধর্ম্মের কিছুমাত্র সন্ধান পাইলে যে সেই পরম বস্তুর লালসায় ব্রাহ্মগণ্ডী ছাড়াইয়া যাইবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যারত্ন আনন্দস্বামী), প্যারীলাল ঘোষ (মৌনী বাবা) ইঁহারা ধর্ম্মের লালসায় ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। এখানে যা পাবার তাহা নিঃশেষ আয়ত্ত করিয়া, সেই পিপাসার প্রেরণাতেই নিগূঢ়তর সাধন অবলম্বন করেন। নগেন্দ্রনাথও এই দলেরই লোক ছিলেন। তিনিও আস্তিক্যবুদ্ধিপ্রবণ ছিলেন। তিনিও কেবল সত্যের ও মোক্ষের সন্ধানে প্রাচীন সমাজ, আপনার দায়াধিকার ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। সংসারের লোভে আসেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াও, বিধাতার কৃপায় দলপতি হইয়া যশমানাদির নূতন সংসার পাতিয়া বসেন নাই বা তার অবসর পান নাই। সুতরাং আমরণ কেবল ধর্ম্মের ভিখারী হইয়াই বেড়াইয়াছেন। থিয়সফির দল যদি কিছু নিগূঢ় ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্মের তত্ত্ব শিখাইতে পারে, এই লোভে তিনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সভ্য হন। গুরুপন্থী কর্ত্তাভজাগণ ধর্ম্মের কোনও নিগূঢ় সাধনপথ দেখাইতে পারেন কি না, সে লোভে তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মবস্তুর লোভেই তিনি সর্ব্বদা সাধু ভক্তদের সঙ্গ করিতেন। পরমহংস মহাশয়ের নিকটে তাঁর গতিবিধি কতটা ছিল জানি না। কিন্তু প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে যখন ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিল, তখনও নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গলোভে তাঁর কাছে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের মতের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সকল মতই যে মিশিয়া যাইত এমন নহে। কোনও

বিষয়ে হয় ত উভয়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদও বা ছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ নিজের মতের মর্য্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও সর্ব্বদাই এই সকল মতামতের বাক বতণ্ডার অনেক উপরে যেন বাস করিতেন। বিরোধী সিদ্ধান্তের খণ্ডনে ব্রাহ্মসমাজে নগেন্দ্রনাথের মত এমন সিদ্ধহস্ত লেখক এবং বক্তা আর জন্মায় নাই। কিন্তু তথাপি অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে বিরোধী মতটা যে কি তা বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টাটা তাঁর মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, মহর্ষি হইতে আরম্ভ করিয়া, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পর্য্যন্ত আর কোনও ব্রাহ্মেতে তাহা দেখা যায় নাই। এই ধৈর্য্যও নগেন্দ্রনাথের গভীর সত্যানুরাগ ও সত্যসন্ধিৎসারই প্রমাণ প্রদান করিত

ব্রাহ্মসমাজে নগেন্দ্রনাথ যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। তাঁর পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজের একটা বড় নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উপহার

১

উষা দেয় শিরে ঢালি' কনক-কিরণ,
ফুল-গন্ধ দেয় উপবন;
পাখী দেয় কল-গান,
সুধাস্পর্শ করি' দান
বহে' যায় প্রভাত পবন।
অয়ি মহীয়সী রাণী,
দীন আমি—নাহি জানি
কি আছে আমার—তব যোগ্য উপায়ন!

২

অনন্ত আকাশ খুলি' রতন-ভাণ্ডার,
গ্রহ-তারকায় গাঁথা হার—
বিশ্বমাঝে অতুলন
জ্যোতির্ম্ময় আভরণ—
রজনীরে দেয় উপহার।
ক্ষুদ্র সে খদ্যোত, তা'রে
আর কি সঁপিতে পারে—
দেয় ক্ষীণ জ্যোতিটুকু—সর্ব্বস্ব তাহার।

৩

আমি আনিয়াছি তাই—বিকশিত-দল
আমার এ হৃদয় কমল।
শুধু তুলে' লও করে,
ফেলে দিও হেলাভরে
নাহি যদি শোভা পরিমল।
ক্ষণিক পরশে তব
লভিয়া গৌরব নব
ধন্য হবে চিরতরে জীবন বিফল!—
লও এই হৃদি শতদল।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

জীবন-বর্ষা

১

আমার সাধের বীণা
প'ড়েছিল গীত-হীনা,
হে বন্ধু, দিয়েছ তুলে' আজি মোর করে।
যতনে শিথিল তার
বাঁধিলাম আরবার,
আজি কি মিলিবে সুর মোর কণ্ঠস্বরে—
এত দিন পরে?

২

অঙ্গুলির সে তাড়না,
তারে তারে সে ঝঙ্কনা,
তুলিবে কি সে মূর্চ্ছনা—সে আবেগ প্রাণ!
আজি কোথা মত্ত আশা,
উচ্ছ্বসিত ভালবাসা,
বসন্তের সে রাগিণী বাজিবে কি গানে—
আজি কে বা জানে?

৩

নাহি সে চাঁদিনী রাতি—
জোছনার শুভ্র ভাতি,
নাহি আর কণ্ঠে মোর—প্রিয়া-বাহু-ডোর!
ফুলের সুবাস নাই,
কাছে নাই—যারে চাই,
কে দিবে বীণায় সুর—প্রাণে গীতি মোর;—
সুখ-নিশি ভোর।

৪

বরষার এ দুর্দ্দিনে—
বাদল-রাগিণী বিনে
আর কোন্ সুর প্রিয়, বাজিবে বীণায়?
দিবানিশি জল ঝরে,
বিরহিণী কেঁদে মরে—
শূন্য পথ পানে চাহি—হেন বরষায়—
দয়িত কোথায়!

৫

কত না আগ্রহ ভরে
দেছ বীণা মোর করে!
সে দিন ত নাহি মোর—এসেছে বরষা!
বুকভরা অন্ধকার,
চক্ষে ঝরে বারিধার,
কি বাজাব হেন দিনে?—মল্লার ভরসা!
এসেছে বরষা!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রিণ্টার্—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
৭৬নং বলরাম দের ষ্ট্রীট,—মেট্‌কাফ্ প্রেস, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

ঊনবিংশ অধ্যায়

শান্তিপুরে প্রত্যাগমন ও পুরুষোত্তম যাত্রা

১৪৩১ শকে মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল। প্রেমোদ্‌ভ্রান্ত সন্ন্যাসী প্রেমের লীলাভূমি বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কোথায় সুদূর যমুনাতীরে বৃন্দাবন, আর কোথায় ভাগীরথীতীরে কটক নগর। পথের ভাবনাহীন সন্ন্যাসী আত্মবিস্মৃত ভাবে তিন দিন রাঢ়দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্‌ঘ্রিনিষেবয়ৈব।

প্রাচীন মহর্ষিবৃন্দ কর্ত্তৃক অবলম্বিত সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বেশ স্বীকার করিয়া মুকুন্দের চরণ-সেবা প্রভাবেই আমি অপার সংসারের পারে গমন করিব।

ভিক্ষুকপ্রোক্ত ভাগবতের এই শ্লোক অনবরত উচ্চারণ করিতে করিতে সন্ন্যাসানন্দ-বিহ্বল গৌর ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিবারাত্রি দিগ্বিদিক্ কিছুই জ্ঞান নাই। নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ কাটোয়া হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন; কিন্তু গৌরের তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। একস্থানে কতিপয় ক্রীড়াপর গোপবালক গৌরের প্রেম বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া আপনা হইতেই হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কাটোয়া ত্যাগের পর গৌরের কর্ণে হরিনাম প্রবিষ্ট হয় নাই। গোপ-বালকগণের মুখোচ্চরিত হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৌর পুলকিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহা-দিগের হস্ত ধারণ করত পুনরায় হরিধ্বনি করিতে অনুরোধ করিলেন। হরিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনন্তর গৌর গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্যানন্দ পূর্ব্বেই তাহাদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে তাহারা গৌরকে গঙ্গা-তীরের পথ দেখাইয়া দিল। গৌর সেই পথে ধাবিত হইলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্যকে সংবাদ দিবার জন্য আচার্য্যরত্ন শান্তিপুরে গমন করিলেন। আচার্য্যরত্ন প্রস্থান করিলে নিত্যানন্দ গৌরের সম্মুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ আপনি কোথায় যাইবেন?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন "তোমার

সহিত বৃন্দাবন যাইব।" গৌর কহিলেন "বৃন্দাবন আর কত দূর?"

"এই ত সম্মুখেই যমুনা" বলিয়া নিত্যানন্দ গৌরকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসিলেন। গঙ্গা-দর্শনে যমুনাভ্রমে গৌরের ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি যমুনার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আচার্য্যরত্নের নিকট সংবাদ পাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া গৌর কহিলেন "আচার্য্য আমি যে বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তাহা তুমি জানিলে কি প্রকারে?" আচার্য্য কহিলেন "যে স্থানে তোমার অধিষ্ঠান সেই বৃন্দাবন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ গঙ্গাতীরে তোমার আগমন হইয়াছে।" তখন গৌর নিতাইর ছলনা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু রুষ্ট হইলেন না। অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দ ও গৌরকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। আচার্য্য-গৃহিণী সীতা দেবী পরম যত্নে রন্ধন করিলেন। ভোজনকালে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গৌরের মধ্যে নানাবিধ রহস্যালাপ হইল। ভোজনান্তে গৌর শয়ন করিলে আচার্য্য তাঁহার পাদ-সংবাহনের অনুমতি চাহিলেন। তখন—

"সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন
বহুত নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন।"

আচার্য্য ক্ষুণ্ণ হইলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। দলে দলে লোক গৌরকে দর্শন করিবার জন্য অদ্বৈতগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সংকীর্ত্তন আরব্ধ হইল। আচার্য্য—

কি কহবরে সখি আজুক আনন্দওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥

এই পদ গাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন-কালে গৌরকৃষ্ণ-বিরহ-জ্বালা তীব্র ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। জ্বালা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অবশেষে গৌর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে গৌর "বোল বোল" বলিয়া গর্জ্জন করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক প্রহর রাত্রি কালে কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল।

অদ্বৈতকে গৌরের আগমন-সংবাদ দিয়া আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পরদিন শচীমাতা ভক্তগণ সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর মাতৃ-চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন, জননী পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া তিনি শোকে বিহ্বল হইলেন—অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া গেল, মনের সাধে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করা ঘটিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা কহিলেন "বাপ নিমাই, যদি বিশ্বরূপের মত আমার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ কর, যদি আমাকে দর্শন না দেও, তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইবে।" রোদন করিতে করিতে গৌর কহিলেন "মা, বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনও ঔদাস্য অবলম্বন করিতে পারিব না। তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই করিব; তুমি যেখানে বলিবে, আমি সেখানেই থাকিব।" পুত্রের মধুর বাক্যে জননী প্রীতা হইলেন।

সংকীর্ত্তনানন্দে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। একদিন গৌর ভক্তগণকে একত্র করিয়া কহিলেন "আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি

বটে, কিন্তু মাতাকে ও তোমাদিগকে আমি কখনও ত্যাগ করিতে পারিব না। পরন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে জন্মস্থানে কুটুম্ব-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করা অবিধেয়। তোমরা সকলে যুক্তি করিয়া এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে তোমাদিগকেও ত্যাগ করিতে না হয়, অথচ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম রক্ষাও হয়।" তখন অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তগণ শচীদেবীর নিকট গমন করত সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন শচী-দেবী চিন্তা করিয়া কহিলেন "নিমাই এখানে থাকিলেই আমি সুখী হই। কিন্তু লোকে যদি তাহার নিন্দা করে তাহা অসহ্য হইবে। আমার মনে হয় নিমাই যদি নীলাচলে বাস করে, তাহা হইলে দুই দিক রক্ষা হয়। নবদ্বীপ হইতে প্রায়ই লোক নীলাচলে যাইতেছে। তাহাদের নিকট আমি বাছার সংবাদ পাইব। তোমরাও তথায় যাতায়াত করিতে পারিবে। মাঝে মাঝে নিমাইও গঙ্গাস্নানোপলক্ষে এখানে আসিতে পারিবে।"

তাহাই স্থির হইল। গৌর ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাস কহিলেন "তুমি নীলাচলে গেলে আমার গতি কি হইবে? পাপিষ্ঠ যবন আমি, আমার নীলা-চলে স্থান নাই—কিন্তু তোমাকে না দেখিয়া আমি বাঁচিব কিরূপে?" গৌর সদয়ভাবে কহিলেন 'জগন্নাথ দেবের অনুমতি লইয়া আমি তোমাকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইব "

বিদায়ের দিন সমাগত হইল। জননী ও ভক্তগণকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া গৌর নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ দত্ত সহ শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন।

শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া গৌর সঙ্গিগণ সহ দক্ষিণাভিমুখ হইয়া চলিতে লাগিলেন। আঠিসার নগরে অনন্ত পণ্ডিত নামক এক সাধু ব্রাহ্মণের গৃহে এক রাত্রি অবস্থান করিয়া গঙ্গাতীর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে তাঁহারা ছত্রভোগে উপনীত হইলেন। ছত্র-ভোগে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিতা ছিলেন এবং তথায় জলময় এক শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন। লিঙ্গের নাম অম্বুলিঙ্গ। ভগীরথের গঙ্গানয়নকালে গঙ্গা-বিরহ বিধুর শঙ্কর গঙ্গান্বেষণে বহির্গত হইয়া ছত্রভোগে তাঁহার দর্শনলাভ করেন। অনু-রাগ বিহ্বল শঙ্কর গঙ্গার দর্শনপ্রাপ্তি মাত্রই তন্মধ্যে পতিত হন এবং অনুরাগে বিগলিত হইয়া জলরূপে গঙ্গার সহিত মিশিয়া যান। তদবধি সেই স্থান অম্বুলিঙ্গ-ঘাট নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। গৌর অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার স্নানকালে ছত্রভোগের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ চতুর্দ্দোলায় সেই পথে গমন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র গৌরের তেজঃপূর্ণ কান্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং চতুর্দ্দোলা হইতে অবতরণ করিয়া কৃতস্নান গৌরের চরণে প্রণিপাত করিলেন। গৌর তখন গঙ্গাদর্শনে ভাবাবিষ্ট। রামচন্দ্র যখন তাঁহার চরণ-মূলে প্রণত, তখন "হা হা জগন্নাথ" বলিয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি নীলা-চলে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য রামচন্দ্র খাঁকে অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন "প্রভুর আজ্ঞা দাস যথাসাধ্য পালন করিবে। কিন্তু বড় বিষম সময় পড়িয়াছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিয়াছে, এখন পুরীর পথে কেহ যাইতে সাহস করে

না। অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দীনের গৃহে আজি অবস্থান করুন। আজ রাত্রিতেই আমি আপনাকে নীলাচলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিব।”

রামচন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সকলে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন; রামচন্দ্র সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া রাত্রিকালে নৌকাযোগে পুরুষোত্তমাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। নৌকায় নিরবধি সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কতিপয় দিবসান্তে নৌকা উৎকল দেশে প্রয়াগঘাটে উপস্থিত হইল। সকলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনান্তর তাঁহারা সুবর্ণরেখা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণরেখা অতিক্রান্ত হইয়া নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ কিছু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। গৌর সকলের অগ্রে যাইতেছিলেন। পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া জগদানন্দের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। গৌরের সন্ন্যাসের দণ্ড জগদানন্দের নিকট ছিল। জগদানন্দ দণ্ড নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া কহিলেন “নিতাই, তুমি অগ্রসর হও, আমি প্রভুর জন্য কিছু ভিক্ষা করিয়া আনি।” দণ্ড হস্তে লইয়া নিতাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া দণ্ডখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জগদানন্দ ফিরিয়া আসিয়া ভগ্নদণ্ড দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। উভয়ে অগ্রসর হইয়া গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। দণ্ড ভগ্ন দেখিয়া গৌর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিতাই কহিলেন “একখানা বাঁশ ভাঙ্গিয়াছি, যদি ক্ষমা করিতে না পার দণ্ডবিধান কর।” গৌর কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন “আমার সম্বলের মধ্যে ছিল এক দণ্ড, তাহাও তোমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। আমার সঙ্গে তোমরা কেহই যাইতে পাইবে না। হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।” মুকুন্দ কহিলেন “তুমিই আগে যাও।” গৌর একাকী অগ্রসর হইলেন। জলেশ্বরে শিববিগ্রহ দর্শন করিয়া গৌর ক্রোধ বিস্মৃত হইলেন এবং শিবপ্রেমে বিহ্বল হইয়া ভক্তগণ সহ বিগ্রহ-সমীপে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন। জলেশ্বর হইতে ভক্তগণসহ একত্র বহির্গত হইয়া গৌর রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গোপীনাথ বিগ্রহকে প্রণামকালে গোপীনাথের শিরস্থ পুষ্পচূড়া স্খলিত হইয়া গৌরের মস্তকে পতিত হইল। গৌর হৃষ্টমনে বহুক্ষণ গোপীনাথ-সম্মুখে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন। গোপীনাথের সেবকগণ বিস্মিত হইল।

রেমুণার গোপীনাথ “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ” নামে বিখ্যাত। কীর্ত্তনান্তে গৌর ভক্তগণ-সমীপে গোপীনাথের ক্ষীরচুরীর উপাখ্যান বিবৃত করিয়া গোপীনাথের ক্ষীর-প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন এবং ভোজনান্তে পুরুষোত্তম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। *

---

* ভক্তচূড়ামণি মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক গোপালক দুগ্ধভাণ্ডহস্তে হাসিতে হাসিতে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলিল “পুরী, ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, লও এই দুগ্ধ পান কর।” ক্ষুধার্ত্ত পুরী বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বালক কহিল “আমি এই গ্রামের অধিবাসী, আমার গ্রামে কেহ অনাহারী

অনন্তর সকলে যাজপুরে উপনীত হইয়া বৈতরণী নদীতে স্নান করিলেন। যাজপুরে বহু-সংখ্যক দেবমন্দির বিরাজমান। গৌর একাকী সমস্ত দেবালয় পরিদর্শন করিয়া ভক্তগণসহ পুনর্ম্মিলিত হইলেন। যাজপুর হইতে কটক হইয়া সকলে সাক্ষিগোপালে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষিগোপাল প্রকট দেবতা। নিত্যানন্দ সাক্ষিগোপালের ইতিহাস গৌরের নিকট বিবৃত করিলেন। * সাক্ষি

থাকিতে পারে না। যাহারা যাচ্ঞা করে না, আমি তাহাদিগকে আহার দেই।" বলিয়া বালক প্রস্থান করিল—কিন্তু দুগ্ধ-ভাণ্ড লইতে আর ফিরিয়া আসিল না। রাত্রিকালে বালক স্বপ্নে মাধবেন্দ্রের সমীপে আবির্ভূত হইল এবং তাঁহাকে এক কুঞ্জমধ্যে লইয়া গিয়া কহিল "পুরী, বহুদিন যাবৎ আমি এই কুঞ্জমধ্যে তোমার অপেক্ষায় আছি। আমার নাম শ্রীগোপাল। বজ্র আমাকে শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার সেবক ম্লেচ্ছভয়ে আমাকে এই কুঞ্জমধ্যে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। তুমি আমাকে পুনরায় পর্ব্বতের উপরে লইয়া যাও।" প্রাতঃকালে পুরী গ্রামের লোকজন ডাকিয়া সেই কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় মৃত্তিকা ও তৃণে আচ্ছন্ন এক বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। পুরী বিগ্রহ লইয়া গিয়া শৈলোপরি তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন পরে মাধবেন্দ্র পুরী পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন—গোপাল তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিতেছেন "পুরী তুমি নানা তীর্থের জলে আমায় স্নান করাইয়াছ—কিন্তু আমার শরীরের তাপ যাইতেছে না। তুমি নীলাচলে যাইয়া স্বয়ং আমার জন্য মলয়জ চন্দন সংগ্রহ করিয়া আন।" মাধবেন্দ্র দেবাদেশে ওড্রদেশে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রেমুণায় উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ দর্শন করিলেন। গোপীনাথের সেবকের নিকট গোপীনাথের ভোগ অমৃতকেলি নামক ক্ষীরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুরী ভাবিলেন "যদি অযাচিতভাবে একটু ক্ষীর প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহার স্বাদ জানিয়া আমার গোপালের জন্য তদ্রূপ ক্ষীরভোগের ব্যবস্থা করি।" রাত্রিকালে গোপীনাথের পুজারী স্বপ্নে দেখিল, গোপীনাথ তাহাকে বলিতেছেন—"আমার ভক্ত মাধব পুরী হাটে বসিয়া আছে। আমার ভোগ হইতে একটু ক্ষীর লইয়া আমি তাঁহার জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমার ধড়ার অঞ্চলে সেই ক্ষীর আছে। তুমি তাহা লইয়া সত্বর গিয়া মাধবেন্দ্রকে দান কর।" গভীর রজনীতে উঠিয়া পুজারী গোপীনাথের অঞ্চলে ক্ষীর প্রাপ্ত হইলেন এবং ত্বরিতপদে মাধবেন্দ্রসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষীর প্রদান করিলেন এবং তাঁহার প্রতি গোপীনাথের অপার স্নেহের কথা বিবৃত করিলেন। প্রেমপুলকিত পুরী ক্ষীর ভক্ষণ করিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহোদ্দেশে পুরুষোত্তম গমন করিলেন। চন্দন সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবন প্রত্যাগমনকালে পুনরায় রেমুণায় উপস্থিত হইলে রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, গোপাল তাঁহাকে কহিতেছেন "পুরী, চন্দন আমি প্রাপ্ত হইলাম। গোপীনাথ ও আমার একই অঙ্গ, তোমার চন্দন তুমি গোপীনাথকে দান কর। তাহাতেই আমার গাত্রতাপ বিদূরিত হইবে।" মাধবেন্দ্র সংগৃহীত সমস্ত চন্দন গোপীনাথকে প্রদান করিলেন।

* পূর্ব্বকালে বিদ্যানগরের অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও এক হীনবংশীয় ব্রাহ্মণযুবক একত্র তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। বিদেশে যুবক বৃদ্ধের বহু শুশ্রূষা করে, বৃন্দাবনে বৃদ্ধ তাহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। যুবক বৃদ্ধের কথায় প্রত্যয় না করিয়া কহিলেন "আপনি সম্ভ্রান্ত কুলীন, আমার মত হীনবংশীয় লোককে আপনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে যদি আপনি গোপালদেবের সমক্ষে শপথ করিতে পারেন—তাহা হইলে আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি। কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ বৃন্দাবনে গোপালের সম্মুখে যুবককে কন্যা দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দেশে প্রত্যাগত হইয়া বৃদ্ধ পুত্রগণের নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা বিবৃত করিলে

গোপালকে প্রণাম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে সকলে ভুবনেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। * ভুবনেশ্বরকে প্রণাম করিয়া গৌর ভক্তগণসহ কমলপুরে উপনীত হইলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখিতে পাইয়া গৌর প্রেমপুলকিত হইয়া উঠিলেন। কখনও ভীষণ রবে বারংবার হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, কখনও ধ্বজার দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
রামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।"

প্রাসাদের অগ্রমূলে শ্রীবালগোপাল আমাকে দেখিয়া হাসিতেছেন। অবশেষে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে উন্মত্তের মত মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কতবার স্খলিত পদে পথিমধ্যে ধরাশায়ী হইলেন—দৃক্‌পাত নাই। গৌর ছুটিয়া চলিলেন। পরিশেষে আঠারনালায় উপস্থিত হইয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভক্তগণকে কহিলেন "বন্ধুগণ, তোমাদের কৃপাতেই আমি জগন্নাথ দর্শন করিতে পাইলাম। এখন হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" মুকুন্দ কহিলেন "তুমিই আগে যাও।" গৌর একাকী মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

গৌর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে আরাধ্য দেবতাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা সঞ্জাত হইল। গৌর বিগ্রহাভিমুখে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উদ্বেল অশ্রু চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু লম্ফপ্রদান মাত্র গৌরের সংজ্ঞা লোপ হইল। এদিকে মন্দিরের পরিহারিগণ তাঁহাকে জগন্নাথের অভিমুখে লম্ফপ্রদান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল

পুত্রগণ মহারুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা হীনবংশে ভগিনীদান করিতে স্বীকৃত হইল না। যুবক বৃদ্ধকে স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, তাঁহার পুত্রগণ যুবককে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। এবং বৃদ্ধ কহিলেন "কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আমার স্মরণ নাই।" ক্রুদ্ধ যুবক বলিয়া ফেলিলেন "যদি গোপাল নিজে সাক্ষ্য দেন, তবে স্মরণ হইবে?" বৃদ্ধের পুত্রগণ কহিলেন "যদি গোপাল নিজে সাক্ষ্য দেন, তবে তাঁহার নিকট ভগিনী সম্প্রদানে আমাদের আপত্তি হইবে না।' নিরুপায় যুবক বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং একমনে গোপালের আরাধনা করিতে লাগিলেন। গোপাল তুষ্ট হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য যুবকের সহিত বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। কথা ছিল, যুবক ফিরিয়া চাহিবেন না; চাইলে গোপাল পথিমধ্যে আর অগ্রসর হইবেন না। বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া যুবক ভ্রমক্রমে পশ্চাতের দিকে চাহিলেন—গোপাল-বিগ্রহ পথিমধ্যে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরদিন সমগ্র নগরবাসীর সম্মুখে গোপাল বৃদ্ধের প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য দিলেন। বৃদ্ধের পুত্রগণ তখন বিনা আপত্তিতে যুবকের সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিল। বৃদ্ধ ও যুবকের প্রার্থনায় গোপাল বিদ্যানগরেই রহিয়া যান। তথা হইতে উৎকলরাজ পুরুষোত্তম তাঁহাকে কটকে স্থানান্তরিত করেন।

* শিব এক সময়ে কাশীরাজ নামক বারাণসীর এক রাজার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর প্রদান করেন যে তিনি যুদ্ধে কৃষ্ণকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। বরদান করিয়া শিব সদলবলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকালে সমস্ত অবগত হইয়া সুদর্শনচক্র ত্যাগ করিলেন। চক্র কাশীরাজের মস্তক খণ্ডিত করিয়া শিবের পশ্চাৎ ছুটিল। শিব তখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ওড্রদেশে "একাম্রকবন" নামক স্থান দান করিলেন। তাহাই ভুবনেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পুরীর অধিপতির সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম তখন জগন্নাথদর্শন করিতেছিলেন। তিনি গৌরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পরিহারীদিগকে নিষেধ করিলেন—এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিশ্চেষ্ট-বপুঃ স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। গৌরের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। সার্ব্বভৌম পরিহারিগণের সহায়তায় সেই সংজ্ঞাহীন সন্ন্যাসীদেহ স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ও মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। সার্ব্বভৌম সকলকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সকলের শুশ্রূষায় গৌর সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং সার্ব্বভৌমকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "আজি হইতে আমি আর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিব না, গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই ঠাকুর দর্শন করিব। আজি যদি আমি লম্ফদিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহ ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি সঙ্কটই না হইত ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বসন্তোৎসবে।

মধুমাস, শুক্লা চতুর্দ্দশী। নগরোপকণ্ঠে পাটলীগ্রামে সুরক্ষিত সুন্দর রাজোদ্যান। সেই উদ্যানে আজ বড় ঘটা—বসন্তোৎসব, মদনদেবের অভিবন্দনা। মধ্যাহ্নের পর হইতেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম, পল্লী, বসতি হইতে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বালক বালিকা সেথানে সমাগত হইতেছিল। সম্পন্ন পরিবারের যুবতী বালক বালিকারা গোযানে,অশ্বযানে অথবা শিবিকায়, পুরুষগণ সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণে অথবা পদব্রজে আসিয়াছেন। আর, যাঁহাদের তেমন সঙ্গতি ছিল না, তাঁহারা স্ত্রীলোক বালক বালিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া মহোৎসাহে পদব্রজেই আসিয়াছেন। সকলেরই প্রফুল্ল মুখ, বিচিত্র বেশ।

পথের উভয় পার্শ্বে প্রতিগৃহ-দ্বারে মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব ; গৃহের দেয়ালে হংস কারণ্ডব অথবা ময়ূর ময়ূরীর বিচিত্র চিত্র, দেহলীতে পুষ্পমালা, গৃহচূড়ে পতাকা।

উদ্যানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। অশোক, তমাল, কিংশুক, কাঞ্চন, চূতবৃক্ষমূলে রক্তিমগন্ধ-চূর্ণোৎক্ষেপে রঞ্জিতকায় দলে দলে স্ত্রীলোক পুরুষ বালক-বালিকা হাস্য কৌতুকোৎসবে উন্মত্ত। উদ্যানের এক অংশে বিপণীশ্রেণী বসিয়াছে। মৃন্ময় কাষ্ঠময় প্রস্তরময় নানাপ্রকার খেলানা, নানাবিধ

মিষ্টান্ন, কর্পূরপূগ সুবাসিত সজ্জিত তাম্বুল ক্রয়ের জন্য বালকবালিকা যুবতীরা পর্য্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন। বসন্তোৎসবে ধনী মানী, দীন দরিদ্র, যুবক যুবতী সকলেরই মুক্তপ্রাণ, স্মিতমুখ। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অনেকে গৃহাভিমুখে ফিরিতে লাগিল।

উদ্যানের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ পট্টাবাস। সেখানেই অত্যন্ত জনতা শত শত পত্র-পল্লবে, পুষ্পগুচ্ছে, মহাসুরভি পুষ্পমালায় চিত্র বিচিত্র চানাংশুকে পট্টমণ্ডপ সজ্জিত হইয়াছে। সুগন্ধী তৈলসিক্ত শত শত প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিতে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। রাজাধি-রাজ মৃগয়ায় গিয়াছেন আজিও রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন নাই, সুতরাং স্ব উচ্চ সুশোভন রাজসিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। চারি-দিকে কাষ্ঠাসন, বেত্রাসন, ভূমিতলে বিন্যস্ত বৃহৎ কম্বলাসন, পট্টাসনে বহু লোক সমাসীন।

এক প্রান্তে শুধু বালকবালিকা যুবতীগণেরই সমাবেশ। নানাবিধ স্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তার অলঙ্কার, মূল্যবান্ বিচিত্র কৌশেয়সাড়ী, ওড়্‌নি, চন্দন ও গোরোচনা চর্চ্চা, কজ্জললেপ, চিত্র-লেখা এবং অলক্তকরাগে সজ্জিতা রঞ্জিতা যুবতীগণ স্মিত-প্রভাসিত মুখে মণ্ডপ জ্যোতি-র্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত অল্প-সঙ্গতিসম্পন্না যুবতীরা কিঞ্চিৎ দূরে তাম্র, কাংস্য অথবা পুষ্পালঙ্কারে, হরিদ্রা কুঙ্কুম রঞ্জিত অথবা কাষায় বিচিত্র বস্ত্রে বিভূষিতা হইয়া মণ্ডপগৃহ সুশোভিত করিয়াছেন। অনেকেরই গলে পুষ্পমালা, কুন্তলে পুষ্পস্তবক, কর্ণে পুষ্প-কুণ্ডল; সকলের মুখেই হাসি, নয়নে স্ফুরৎবিদ্যুৎ।

এমন সময় প্রমীত সেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে স্ফীত বাউরী চুল ঘিরিয়া ফুলের মালা, গৌর ললাট কপোলে চন্দনচর্চ্চা, কর্ণে মুক্তাবলয়, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে শুভ্র কৌশেয় ধুতি, দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাম বাহুমূল-বেষ্টিত সূক্ষ্ম কৌশেয় ওড়নি, পায়ে শ্বেত চর্ম্মপাদুকা। প্রমীতের আগমনে বন্ধু-বান্ধবগণ হর্ষধ্বনি করিলেন। অসঙ্গ সেন বলিলেন;—

"কি হে, প্রমীত সেন নাকি? এস, এস। উৎসবে, আনন্দ-ঘটায় তোমার সমাগম?"

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন;—

"বসন্তে শুষ্ক শাখায়ও যে নূতন মঞ্জরী দেখা দেয়, আমি ত মানুষ।"

অসঙ্গ প্রমীতকে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন,—

"তুমি মানুষ, দেবতা, কি পাষাণমূর্ত্তি-বিশেষ, তা কে বলিতে পারে?"—অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন;—"উৎপলা দেবী জানিতে পারেন।"

"তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।"

"একদিন জিজ্ঞাসা করিব।—তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? তিনি আসেন নাই?"

"আসিবার কথা ছিল, সেই জন্যই বিলম্ব; শেষে আসা হইল না। আমাকে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে।"

"কেন, ফিরিবার সময়, দণ্ড প্রহর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন নাকি? না—নবীন বসন্তা-গমে অরক্ষিত অসতর্ক তুমি, এই উৎসব-ঘটায় চিত্তটা হারাইয়া ফেলিবে বলিয়া?"

প্রমীত সেন যেন কি উত্তর দিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

পটমণ্ডপের যে অংশে প্রমীত এবং তাঁহার বন্ধুগণ আসীন ছিলেন, তাহার সম্মুখে অদূরেই ভদ্র সম্রান্ত গায়ক গায়িকাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কতকটা স্থান ছিল। ইতিপূর্ব্বে সেখানে বসিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ গীত গাহিয়াছেন।

এমন সময় মৃদুগমনে একটী যুবতী সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে বহু-সুন্দরী-সুন্দর-সমাবৃত সেই সভাস্থল যেন অধিক-তর শোভাযুক্ত হইল। যুবতীর বয়স বিংশবর্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু অসামান্য রূপ। পরিহিত স্বর্ণসূত্রগ্রথিত উজ্জ্বল অঞ্চলযুক্ত সূক্ষ্ম নীল কৌশেয় সাড়ীর অন্তরাল হইতেও স্থানে স্থানে তাঁহার গৌরদেহের স্ফুরৎ লাবণ্য বিকী-রিত হইতেছিল। এক-বেণীবদ্ধ মুক্তাজাল-পরিবৃত দীর্ঘ কেশরাশি নিবিড় নিতম্ববিম্ব পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গে অনতি বিস্রস্ত সূক্ষ্ম রঙ্গিম ক্ষৌম ওড়নি, বক্ষে রত্নখচিত কঞ্চুলিকা, শিরোবেষ্টিত পুষ্পমালা, সীমন্তে মণি আর সেই মণির সহিত সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে সংসক্ত উজ্জ্বল বৈদূর্য্যখণ্ড তাঁহার ললাটদেশে বিলম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছিল।

হঠাৎ এই রমণীর দিকে দৃষ্টি পড়াতে অসঙ্গের তীব্র পরিহাসোক্তির প্রত্যুত্তর আর প্রমীত সেনের মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি মুগ্ধনেত্রে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কখনো কি ইহাঁকে দেখিয়াছি? না, মনে পড়ে না।

অসঙ্গ বলিলেন ;—

"কিহে, সত্য সত্যই কি চিত্ত হারাইলে নাকি!"

প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে এ রমণী?"

"ইহাঁর কথা ত অনেক দিন তোমাকে বলিয়াছি।"

"কে ইনি?"

"মঞ্জুলা ; রূপসী বিদুষী গায়িকা মঞ্জুলা!"

"রূপসীই বটে, অপূর্ব্ব রূপসী!"

প্রমীত নিস্পন্দনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলা নতমস্তকে সমাগত জনমণ্ডলীর অভি-বন্দনা করিয়া সেইখানে বসিল। একজন পরিচারিকা একটী বীণা আনিয়া দিল। মঞ্জুলা তাহাতে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। সমাগত সমস্ত নরনারী তাহার গীত শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠ হইল। প্রমীত স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলা গীত আরম্ভ করিল।

আগত মধুঋতু নিকুঞ্জে।
(প্রিয় হে, প্রিয় হে, প্রিয় হে!)
পুষ্পিত, সুরভিত, পল্লবিত তরু কুঞ্জে কুঞ্জে।
বো'ল না বেদনাময় জীবন,
বো'ল না বিয়োগভরা মিলন।
সজ্জিত ধরণী রূপ-রস-গন্ধ-পরশ পুঞ্জে।
পরাণভরা কত বাসনা,
অঙ্গে অঙ্গে কত কামনা!
ভ্রমর ভ্রমরী মুখে মুখ রাখি গুঞ্জে।

ঘাটে ঘাটে দ্রুত মধ্য বিলম্বিত সঞ্চরমাণ মঞ্জুলার অঙ্গুলিদামের কি অপূর্ব্ব শোভা! গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অধিরোহণ অথবা অবরোহণ জনিত সুবলিত ললিত বাহুর কি মধুর মন্থর অথবা চকিত ক্ষিপ্রগতি! ক্ষুদ্র মস্তকের মৃদু সঞ্চলনে ললাটবিলম্বী বৈদূর্য্য-খণ্ডের কি ঝলমলায়মান্ কম্পন!

গীত শেষ হইল। তখন সেই জনমণ্ডলী

পটমণ্ডপের চারিদিক্ হইতে গায়িকার প্রশংসাধ্বনি সমুত্থিত হইল। মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল, মস্তক নত করিয়া শ্রোতৃবর্গের অভিবন্দনা করিল। ফুল্লনেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শেষে যেখানে প্রমীত এবং তাঁহার বন্ধুগণ বসিয়া ছিলেন, সেদিকে চাহিয়াই যেন চমকিত হইয়া থামিল। তাহার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ আরক্তিম, হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল উৎসবের শেষ ব্যাপার মঞ্জুলার গীত শেষ হইলে পুরুষগণের উচ্চারিত মদন দেবের জয়শব্দে এবং যুবতীগণের মঙ্গল হুলুধ্বনিতে সেই বিরাট্ পটমণ্ডপ কম্পিত হইয়া উঠিল।

মঞ্জুলা তখন পুনরায় সেইদিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নতমস্তকে মৃদুপদে মণ্ডপ হইতে বাহির হইল। বাহিরে শিবিকা প্রস্তুত ছিল। প্রহরী পরিজন পরিরক্ষিত মঞ্জুলা নগরে নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

উৎসবসভা ভঙ্গ হইলে প্রমীত এবং অসঙ্গ সেনও আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমীত বলিলেন ;—

"ইনি যে এত রূপবতী, এমন সুগায়িকা, তাহা ত তুমি কোন দিন আমাকে বল নাই!"

"আমি অনেক দিন বলিয়াছি; কিন্তু তোমার অন্তঃপুরের বাহিরে যে রূপবতী কেহ আছে, এ বিশ্বাস যে তোমার নাই!"

"মানুষের ভ্রম ক্রমে দূর হয়।—মঞ্জুলা বিদুষীও বটে ?"

"নগরের অনেক বিদ্বান্ পণ্ডিত লোক ত আলাপ করিবার জন্ত মঞ্জুলার গৃহে যাইয়া থাকেন।"

প্রমীত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিই কি তিনি! অসঙ্গ বলিলেন ;—

"কি ভাবিতেছ ? ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট দণ্ড অতীত হইয়াছে ?—বিলম্বের হেতু উৎপলা-দেবীকে বলিব কি ?"

তখন হাসিতে হাসিতে দুইজনে পটমণ্ডপ হইতে বাহির হইলেন।

স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকাগণ মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া যার যার গম্যস্থানাভিমুখে চলিল। জ্যোৎস্না রাত্রি, আলোর অভাব ছিল না ; তথাপি বহুসংখ্যক প্রহরী দৌবারিক শান্তি-রক্ষক আলো জ্বালিয়া লোক যাতায়াতের সুশৃঙ্খলা এবং চোর দস্যু দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে লোকদিগের রক্ষার সুবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। নগর-মুখের পথ লোকপ্রবাহে পূর্ণ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুণ্ডল ভ্রংশ।

বসন্তোৎসবের পরদিন অপরাহ্নে প্রমীত সেন অন্তঃপুরে উৎপলার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। প্রমীত একখানি অনতি-উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিলেন, উৎপলা নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কি নাম ?"

"মঞ্জুলা"

"নাম জানিলে কেমন করিয়া ?"

"অসঙ্গ তাঁহাকে চিনেন, অসঙ্গের কাছে শুনিয়াছি।"

"অতি মিষ্টস্বর ?"

"এমন মধুর স্বর আমি ত কখনো শুনি নাই।"

"অমন রূপ আর দেখিয়াছ কি?"

"মঞ্জুলার অপূর্ব্ব রূপ, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"অমন রূপবতী একেবারে দুর্লভ নহে।"

"আরও আছে?"

"আছে।"

"কোথায় দেখিয়াছ?"

"আমার নিজ গৃহে।"

প্রমীতের মুখ স্মিতময়; উৎপলাও হাসিয়া বলিলেন;—"বটে?—তবুও রক্ষা! নতুবা দেখিতেছি, আমি ত ভাসিয়া যাইতাম!"

এমন সময় মাধবী কক্ষদ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল,—"একজন লোক একখানি পত্র আনিয়াছে।"

প্রমীত বলিলেন;—"কোথায় পত্র?—এখানে আন।"

মাধবী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র প্রমীতের হাতে দিল। পত্রখানি সুদৃশ্য আরক্ত কৌশেয় বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। মূল্যবান্ স্বর্ণ সূত্রে বদ্ধ, বন্ধনসন্ধি লাক্ষামুদ্রাঙ্কিত। প্রমীত সেন বিস্মিত হইলেন। কাহার এ পত্র? বন্ধন খুলিয়া বস্ত্রখণ্ড অপসারিত করিয়া পাঠ করিলেন;—

"যদি বিস্মৃত না হইয়া থাকেন এবং আপত্তি না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার অধিনীর গৃহে পদার্পণ করিয়া তাহাকে চরিতার্থ করিবেন। অবলার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। পত্রবাহক পথ প্রদর্শন করিবে, ইতি।

চির-উপকৃতা।"

পত্র পাঠ করিয়া প্রমীত মাধবীকে বলিলেন;—

"পত্র কে আনিল?"

"দারুক আমাকে দিয়াছে। একজন লোক পত্র লইয়া আসিয়াছে; লোকটা কোন পরিচয় দেয় নাই।"

"তাহাকে বসিতে বল।" মাধবী চলিয়া গেল।

পত্রের বহিরাবরণের বৈচিত্র্য দেখিয়া এবং বাহক যে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক তাহা শুনিয়া উৎপলাও বিস্মিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। মাধবী চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কাহার পত্র?"

"পড়িয়া দেখ।"

উৎপলা স্বামীর আরও নিকটে আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং নিজের বামবাহু তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে পত্র গ্রহণ করিবার জন্য যেমন মস্তক নত করিলেন, অমনি অঞ্চলের প্রান্তে ঠেকিয়া হঠাৎ তাঁহার কাণের কুণ্ডল খুলিয়া গেল। স্খলিত কুণ্ডল পত্রখানির উপর পড়িয়া পত্রসহ ভূমিতে পড়িয়া গেল!

ক্ষণকালের জন্য উৎপলার মুখ বিরস বিবর্ণ বইয়া উঠিল, কুলবধূর কুণ্ডল স্খলন যে অশুভসূচক!

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন;—

"অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন?—এখানে ব'স, আমি কুণ্ডল পরাইয়া দিতেছি।"

উৎপলা স্বামীর পার্শ্বে সেই অনতিবৃহৎ কাষ্ঠাসনেই বসিলেন। প্রমীত ভূমি হইতে কুণ্ডল তুলিয়া লইয়া অতি যত্নে স্ত্রীর কাণে পরাইয়া দিলেন, পরাইতে অযথা দীর্ঘ সময় ব্যয় করিলেন। তখন উভয়েরই বড় হাসি

পাইল। পত্রখানি তুলিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া প্রমীত বলিলেন ;—

"দেখ পড়িয়া।—কে লিখিয়াছে, বুঝিতে পার কি ?"

উৎপলা পত্র পাঠ করিলেন।

"কে এই চির-উপকৃতা ?"

"বুঝিতে পারিলে না ?"

"না।"

"আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সে দিন ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ সময়ে যে রমণী বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন, এ তাঁহারই পত্র !"

"তিনি কে ? তাঁহার কি কোন সন্ধান আর পাও নাই ?"

"না। কেমন করিয়া সন্ধান পাইব ? তিনি ত কোন পরিচয় দেন নাই !"

"তাঁহার কি স্বামী ভ্রাতা কি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কেহ নাই ? আত্মগোপন করিয়া স্বয়ংই তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন !"

"আমিও তাহাই ভাবিতেছি।—কে এ রমণী !"

"গৃহস্থ কুলবধূ ?"

"কেমন করিয়া বলিব ?"

"চতুরা নগর-শোভিনী ?"

"অসম্ভব কি !"

"যাইবে কি ?"

"তুমি কি বল ?—তোমার অমত হইলে যাইব না।"

"যাবে বৈ কি।" উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—"এযে 'চির-উপকৃতা' রমণীর আহ্বান !—কত দূর, কিছু জান কি ?"

"তিনি সে দিন বলিয়াছিলেন, কমলপুরে তাঁহার গৃহ, কমলপুর খানিকটা দূরই বটে।"

"বেলা অপরাহ্ন হইল ; কাহাকে সঙ্গে লইবে ?"

"একাই যাইব। বোধ হয় রমণীরও তাহাই ইচ্ছা।"

"ফিরিতে রাত্রি হইতে পারে।"

"হইলেই বা ভয় কি ?"

"ভয় কিছুই না ;—তবে দেখিও, ঘর বাড়ীর কথা ভুলিয়া যাইও না !"

প্রমীত হাসিলেন। উৎপলাও হাসিলেন, তাঁহার হর্ষপ্রফুল্ল আয়তনয়ন-প্রান্তে অসীম বিশ্বাস, অপরিমেয় প্রীতি এবং স্ফুরদধরে পূর্ণ আত্মসমর্পণের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর মুখ পরিচুম্বিত করিয়া প্রমীত সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(১)

রসের রূপের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব প্রবন্ধে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য, এই তিন রসের কথাই কিছু বলিয়াছি। এ সকল অন্তরঙ্গ রসের সঙ্গে আমাদের শরীরের স্নায়ু-মণ্ডলীর অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া, যখনই এই সকলের কোনও একটী বিশেষ রস আমাদের চিত্তে ফুটিয়া গাঢ় হইয়া উঠে, তখনই তাহার বিশেষ রূপও আমাদের স্নায়ু-মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে প্রকট হয়। এ সকল কথার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য রসের উল্লেখ করি-নাই। অথচ রসের যত রূপ আছে, মাধুর্য্যের রূপই তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আর এ পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের রূপের আলোচনা করি নাই এই জন্য যে, এই উন্নত, গভীর জটিল রসের কথা বলিতে বড়ই শঙ্কা হয়। এ রসের তত্ত্ব জানেন কেবল সুরসিক ভক্ত। আমরা তার কি-ই বা জানি? কি-ই বা বুঝি?

একে এই রস সকল রসের সেরা। তাতে আবার ইহার সঙ্গে আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটীর অতি নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। এ রস-সাধনের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। এখানে বিষধর কাল সাপের সঙ্গে তার দাঁত না ভাঙ্গিয়াই খেলিতে হয়। আর তেমন খেলোয়ার দুনিয়ায় ক'জনই বা মিলে? এ রসের উপজীব্য মদনারি মহাদেব নহেন, মদন-মোহন বংশীধারী। অনঙ্গকে ভস্ম করিয়া এ রসের সম্ভোগ বা সাধনা হয় না; তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া মুগ্ধ করিতে হয়। কেবল ভগবদ্-পক্ষেই যে ইহা করিতে হয়, তাহা নহে; নায়ক-নায়িকা পক্ষেও ইহাই এই রসের মুখ্য সাধন। যে নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলায় নিতি নিতি নূতন রস উথলিয়া না উঠে; যেখানে পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের রূপলাবণ্য অজর অক্ষয় হইয়া, স্থির সৌদামিনীর মতন চিরবিরাজ না করে; যেখানে সম্ভোগে অনব-সাদ ও সান্নিধ্যে অতৃপ্তি না থাকে; যেখানে ইহাঁদের প্রতি অঙ্গ প্রিয়জনের প্রতি অঙ্গের জন্য নিত্যলোলুপ হইয়া না রহে, অথচ প্রতি অঙ্গপ্রাপ্তিতেও তৃপ্তিলাভ না করিয়া, অঙ্গের ভিতর দিয়াই অনঙ্গকে ও অনঙ্গের প্রেরণায় ও সন্ধানে অঙ্গকে আশ্রয় না করে;—সেই নায়ক-নায়িকার ভাগ্যে মাধুর্য্যরস-আস্বাদন ঘটে না। তাদের কেবল কাদা মাখাই সার হয় এই জন্যই এ রসের কথা বলিতে শঙ্কা হয়, ভয় হয়। বলিতে পারিব কি না সন্দেহ হয়। বলিতে পারিলেও অরসিকে কি বুঝিতে কি বুঝিয়া বসিবে, এই আশঙ্কা হয়। তাই রস-রূপ আলোচনা করিতে যাইয়া, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের কথা বলিয়াই, থামিয়া গিয়াছিলাম।

মাধুর্য্য-রস সকল রসের সেরা। রসতত্ত্ব-বিদেরা রসের পর্য্যায় নির্ণয় করিতে যাইয়া, মাধুর্য্যকে সকলের শেষে বসাইয়াছেন।

প্রথমে শান্ত, তার পরে দাস্য, তার পরে সখ্য, তার পরে বাৎসল্য ও সকলের শেষে মাধুর্য্য। এই পর্য্যায়টা অহেতুক বা অনর্থক নহে। ইহার অন্তরালে একটা সার্ব্বজনীন রসতত্ত্ব রহিয়াছে। সেই তত্ত্বটী এই :—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥

এই পর্য্যায়ে শান্তের গুণ দাস্যে, সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুরেতে বসে; কিন্তু দাস্যাদির গুণ শান্তেতে নাই বলিয়া, এই শান্তরস সকলের আগে বসিয়াছে। সেইরূপ দাস্যের গুণ সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুরে; সখ্যের গুণ বাৎসল্যে ও মধুরে; বাৎসল্যের গুণ মধুরে বসে। ক্রমেই প্রত্যেক রস এই জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী রস অপেক্ষা বড় ও জটিলতর হইয়া উঠে। মধুর সকলের শেষে এই জন্য স্থান পাইয়াছে, কারণ এ রস সকল রস অপেক্ষা বড়, সকলাপেক্ষা জটিল। অপর সকল রসের বিশিষ্টগুণ এই রসেতে আছে; কিন্তু ইহার বিশিষ্টগুণ অপর কোনও রসে নাই।

শান্ত সকলের প্রথমে। কারণ শান্তের গুণ অপর সকল রসেতে আছে, অপর কোনও রসের গুণ শান্তেতে নাই। ফলতঃ কোনও কোনও লোকে শান্তকে রস বলিতেই কুণ্ঠিত হন। শান্ত রসের গুণ সমতা। এই রসের প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় চিত্তের ঐকান্তিকী একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে। এই একাগ্রতা ব্যতীত দাস্যাদি কোনও রসই ফুটিয়া উঠে না। এ সংসারে লোকে চাকুরীও করে, বন্ধুতাও করে, সন্তানোৎপাদনও করে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ও নানাভাবে পাতিয়া থাকে। দুনিয়ার অধিকাংশ লোক এ সবগুলিই করে। কিন্তু দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্যাদির রসাস্বাদন কয় জনারই বা ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? ঘটে না কেবল এই জন্য যে ইহাদের চিত্তে ও চরিত্রে শান্তগুণ ফুটিয়া উঠিয়া এ সকল রসের জমিটা প্রস্তুত করিয়া দিবার অবসর পায় না।

চঞ্চল দর্পণে যেমন কোনও বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিতে পারে না, সকলই কেবল ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও টুক্‌রা টুক্‌রা দেখায়; সেইরূপ আমাদের চঞ্চল চিত্তেতেও কোনও রসের স্থির প্রকাশ হয় না ও হইতে পারে না। রস সেখানে থিতোয় না; গাঢ় হইতে পারে না; কেবলই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যে ভৃত্য প্রভুর সেবা করিতে করিতে সেই সেবার অতিরিক্ত আর দশটা কথা ভাবিয়া চঞ্চল হয়, আর কিছু না ভাবিলেও, কেবল তার দেনা পাওনার হিসাব ভাবে, নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা লইয়া মনে মনে তোলপাড় করিতে থাকে,—তার ভাগ্যে দাসত্বের বন্ধনই থাকে, দাস্য-রসের বিমল সম্ভোগ সম্ভবে না। দাস্যরসের স্ফূর্ত্তির ও চরিতার্থতার জন্য দাসকে সর্ব্বকালে ও সর্ব্ববিষয়ে কেবল প্রভুগতপ্রাণ হইয়া থাকিতে হয়। প্রভু ভিন্ন সে যখন আর কাউকে, কিছু কে জানে না; তার হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা, সকল অনুরাগ, জীবনের সকল উদ্যম ও আনন্দ যখন সেই প্রভুকে আশ্রয় করিয়া, তাঁরই সেবার উদ্দেশে ফুটিয়া উঠে; তখন সেই সেবাই তার পরম পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়ায়। সেই এক প্রভুকে আশ্রয় করিয়া তার চিত্ত তখন অনন্তেতে ব্রাইয়া পড়ে।

সেই একের সেবা হইতে সকলের সেবা তখন তাহার সাধন ও সাধ্য হইয়া উঠে। ঘটে ঘটে তখন সে তার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করে। জীব-সেবা তখন তার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম হইয়া যায়। রসের ধর্ম্মই এই। রসমাত্রেই আদিতে বিন্দুরূপে জন্মিয়া পরিণামে সিন্ধুতে যাইয়া মিলিয়া মিশিয়া যায়। রসমাত্রেই অনন্তের অভিসারে ছুটিয়া থাকে। আর রসমাত্রেই, এইজন্য আদিতে একান্ত একাগ্রতা লাভ করে। আগে বিশ্বকে বর্জ্জন করিয়া পরে বিশ্বকে আলিঙ্গন করে। প্রথমে রসের পন্থা ও সাধনা ব্যতিরেকী, পরে অন্বয়ী; আগে নেতি নেতি, পরে ও পরিণামে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই ব্যতিরেকী, এই নেতি সাধনের সিদ্ধি শান্তেতে। এই শান্ত, এই সমতা, এই ঐকান্তিকী একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা যেমন দাস্যের জমি, সেইরূপ সখ্যাদিরও জমি। চিত্রকরকে যেমন চিত্রবিশেষকে আপনার চিত্রপটে চিত্রিত করিবার পূর্ব্বে, সেই পটখানির উপরে সাদা বা ধূসর বা অন্য কোনও একটা উপযোগী রং মাখাইয়া দিতে হয়, এবং তার পরে সেই রংএর জমির উপরেই বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিয়া উজ্জ্বল চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হয়; সেইরূপ আমাদের চিত্তপটেও প্রথমে শান্তরসের শুভ্র রং যখন সর্ব্বতোভাবে বসিয়া যায়, তখনই কেবল সেই জমির উপরে দাস্যাদি রসের নিজ নিজ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে ও উঠিতে পারে। এইজন্যই "শান্তের গুণ পরে পরে সখ্যাদিতে হয়।" শান্তসমাহিত যে নয়, তার পক্ষে কোনও রস সাধন বা আস্বাদন সম্ভবে না। জ্ঞানসাধনও ইহা ব্যতীত হয় না। এইজন্য শান্ত-গুণ জ্ঞান ও রস উভয়েরই সাধারণ ভূমি।

কিন্তু রসরাজ্যে যাহাকে শান্তসমাহিত বলা যায় জ্ঞানাধিকারে ঠিক তাহাই শান্ত-সমাহিতের লক্ষণ নহে। জ্ঞানাধিকারের সমতা ও একাগ্রতা নিবৃত্তিমূলক। আর এই নিবৃত্তি ঐকান্তিকী হওয়া আবশ্যক।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

দুঃখেতে যাঁর উদ্বেগ জন্মায় না, সুখেতে যাঁর স্পৃহা নাই, আসক্তি ভয় ক্রোধ এ সকল যাঁর বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকেই স্থিতধী মুনি বলা যায়। গীতা সমতা বা শান্তির এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ শান্তি বা সমতা, জ্ঞানাধিকারের। রসের রাজ্যে আসক্তি, স্পৃহা, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ সকলই থাকে। জ্ঞানাধিকারে পরমপুরুষার্থ মোক্ষ। রসাধিকারে মোক্ষ পর্যন্ত উপেক্ষিত। রসাধিকারের শান্তি নিবৃত্তি নয়, রতি। কিন্তু এখানে স্পৃহা, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধাদির রং বদলাইয়া যায়। এ সকলে মমতাগন্ধ থাকে না। নিজের সুখের স্পৃহা থাকে না, নিজের ভোগের বাসনা-জনিত উদ্বেগও থাকে না, আত্মসুখব্যাঘাত-জনিত ক্রোধও থাকে না। জ্ঞানাধিকারের ও রসাধিকারের এই সমতার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন :—

বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোহত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ॥

যাহা হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যক্ত হইয়া মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়, তাহাকে শম বলে। ইহা জ্ঞানাধিকারের শান্তভাব। রসাধিকারে, ভগবৎপক্ষে ইহার অন্য লক্ষণ ফুটিয়া উঠে।

প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তিরতির্মতা॥

শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা এই জ্ঞানেতে, তাঁহাতে যে মমতাগন্ধরহিত রতি তাহাই রসাধিকারের শান্তরতি। নায়ক-নায়িকা বা দাস-প্রভু, সখা-সখী পক্ষেও শান্তরতির এই একই ধর্ম্ম। অন্যসম্পর্কবিহীনা ঐকান্তিকী একনিষ্ঠাই এই শান্তভাব। এ রাজ্যে সুখ, দুঃখ, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধাদি সকলই আছে। কিন্তু এ সকলই মমতাগন্ধবর্জ্জিত। দাস নিজের জন্য উদ্বিগ্ন বা ভীত বা ক্রুদ্ধ হয় না, প্রভুর জন্যই তার যত উদ্বেগাদি ভোগ হইয়া থাকে। সখারও উদ্বেগাদি সখার জন্য। পিতা বা মাতার উদ্বেগাদি পুত্র বা কন্যার জন্য নায়ক-নায়িকার বা পতি ও সতীর উদ্বেগাদি সেইরূপ তাহাদের নিজদের সুখ-দুঃখের জন্য নহে, কিন্তু শুদ্ধ আপনার প্রিয়জনের জন্যই হয়। সামান্য বিষয়লালসা হইতে, যে উদ্বেগাদির উদয় হয়, তাহা বহুমুখী। তাহা নিয়ত চঞ্চল হইয়া রহে। এক মুহূর্ত্তে এক বিষয়কে ধরিয়া ফুটিয়া উঠে, আবার পর মুহূর্ত্তেই বিষয়ান্তরের প্রেরণায় ভাবান্তরে পরিণত হয়। এই জন্যই বিষয়লালসাজনিত উদ্বেগাদি চিত্তের সমতার ও একাগ্রতার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এই জন্যই এ সকল যোগের অন্তরায়। যেখানে যোগ নাই, সেখানে রস পাকিয়া উঠিতে পায় না। জ্ঞান-যোগী উদ্বেগাদির একান্ত নিরসন করিয়া চিত্তের সমতা লাভ করিবার চেষ্টা করেন। রসাধিকারে এ সকলের বহুমুখীত্বই নষ্ট করিতে হয়, এ সকলের নির্ম্মূল সাধন এক্ষেত্রে অবিহিত ও অনাবশ্যক। বৈরাগ্যের ঔদাসিন্য নহে, কিন্তু অনুরাগের যে ঐকান্তিকী একাগ্রতা তাহাই রসাধিকারের সমতা বা শান্তগুণ। যে গুণ থাকিলে দাস প্রভুগত প্রাণ হন, সখা সখাগত প্রাণ হন, পিতামাতা সন্তানগত প্রাণ হন, আর নায়ক নায়িকা একে অন্যকেও অন্য-কাম হইয়া নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারেন,—রসাধিকারে তাহাকেই শান্ত বলে।

শান্তের গুণ যেমন দাস্যে, সখ্যে, বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে থাকে, সেইরূপ দাস্যের গুণ আবার সখ্যে, বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে; বাৎসল্যের গুণ মাধুর্য্যে থাকে। শান্তের গুণ যেমন ঐকান্তিকী রতি, আর এই রতি যেমন সকল রসেরই সাধারণ ধর্ম্ম, দাস্যের গুণ সেইরূপ সেবা ও আপনাকে হীনবোধ ও আপনার প্রভুকে সর্ব্ব-শক্তি ও সম্পদের আধার বলিয়া মনে করা। এই সেবা সখ্যে, বাৎসল্যে, মাধুর্য্যে সকলেতেই আছে। কিন্তু এই হীনতাবোধ ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাহাতে নাই। এই ঐশ্বর্য্যবোধের অভাবই সখ্যের প্রধান গুণ ও বিশিষ্ট লক্ষণ। সখা কখনও আপনাকে সখার সমান, কখনও বা সখা হইতে বড়, কখনও বা সখা হইতে আপনাকে ছোটও ভাবেন। কখনও বা সখার কাঁধে চড়েন, কখনও বা তাহাকে কাঁধে তুলিয়া নাচেন কখনও বা তাহার গায়ে পা তুলিয়া দেন, কখনও বা তাহার পা বুকে ধরিয়া সংবাহন করেন। কখনও তার মুখের খাদ্য কাড়িয়া খান, কখনও বা আপনি অভুক্ত থাকিয়া তাহাকে আপনার মুখের অন্ন তুলিয়া দেন। কিন্তু এ সকলের মধ্যে দাস্যের সেবা ও আনুগত্য-ধর্ম্মের কোনও অভাব বা ব্যতি-ক্রম হয় না। সখ্যের নিজস্ব লক্ষণ বা গুণকে একান্ত নিঃসঙ্কোচ বলা যাইতে পারে। অন্তরঙ্গ

পক্ষে সখ্যরতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া রসামৃত-সিন্ধুকর্ত্তা বলিয়াছেন :—

যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতা।
সা স্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।
পরিহাস-প্রহাসাদিকারিণী রসযন্ত্রণা॥

যাঁহারা মুকুন্দের তুল্য বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে সখা বলে। এই সকল সখার বিশ্বাসময়ী রতিকে সখ্য বলে। অসঙ্কোচে পরিহাস ও উচ্চহাস্যাদি ইহার কার্য্য। সখ্যের এই গুণ দাস্যেতে পাওয়া যায় না। দাস্যরতি যতই গাঢ় ও গভীর হউক না কেন, আপনার উপজীব্য যে প্রভু তাঁহা হইতে দাসকে সর্ব্বদাই সসম্মানব্যবধানে রাখিবেই রাখিবে। দাসের প্রভু সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ক্ষীণতা বা লোপ কখনই হইবে না, হইতেই পারে না। দাস্য-রতির পূর্ণতার জন্য এই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের বিলোপ অনাবশ্যক। কিন্তু সখ্যেতে এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আদৌ থাকে না। ঐশ্বর্য্যবোধ জাগিবা মাত্রই সখ্যরস উভিয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া অর্জ্জুনের এই দশাই ঘটিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুনের আর তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহস হইল না। এতকাল যে সখা বলিয়া, কৃষ্ণ বলিয়া, যাদব বলিয়া, নাম ধরিয়া ডাকিতে-ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াই নিজেকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
মযা প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

আশৈশব-সখা শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মহিমা ও অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া অর্জ্জুন ভয় পাইলেন। শ্রীভগবানের অপরিসীম মর্য্যাদাজ্ঞান আসিয়া তাঁর সখ্যরতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই মহামহিমময় অনন্ত পুরুষকে সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলিয়া শতবার সম্বোধন করিয়া তাঁর যে অমর্য্যাদা করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া অর্জ্জুন আকুল হইয়া উঠিলেন। শুতে যেতে খেতে বসতে তাঁর সঙ্গে মাখামাখি গলাগলি হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি যে করিয়াছেন, সে সকলই এখন অপরাধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন তাব জন্য এখন প্রণত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অর্জ্জুনের সখ্যরতিকে নষ্ট করিয়া দিল। দাস্যেতে ঐশ্বর্য্যবোধ আছে বটে কিন্তু রতি-প্রভাবে ক্রমে যেন মরিয়া আসিতেছে। আসন্নপরিচর্য্যা, শুশ্রূষা এ সকলই দাস্যের নিগূঢ়, নিজস্ব ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। এ ধর্ম্ম শান্তরতিতে নাই। অথচ শান্তের একনিষ্ঠা দাস্যাদিতে আছে। সেইরূপ সখ্যের যে এই সাম্যাভিমান ;—সখা আমার সমান, আমি সখার সমান, আর কখনও বা সখা আমার বড় আবার কখনও বা আমি সখার বড়,—এই ভাবও সখ্যাভিমানেরই অন্তর্গত ;—এ সকল দাস্যে নাই, অথচ দাস্যের সেবাপরায়ণতা সখ্যেতে আছে।

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞানপ্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ॥
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক, দুই, তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

শান্তের একগুণ—একনিষ্ঠা; দাস্যের দুই—একনিষ্ঠা ও সেবা। সখ্যের তিন—একনিষ্ঠা, সেবা ও অসঙ্কোচ। বাৎসল্যের চারি—একনিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ এবং কারুণ্য।

মমতা আধিক্যে তাড়নভর্ৎসন ব্যবহার
আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান—

এ সকলই কারুণ্যধর্ম্ম। আমার উপরে সে নির্ভর করে, এই যে ভাব ইহাই কারুণ্যের প্রাণ। আর এই ভাবই বাৎসল্যের সার। মাধুর্য্যের পাঁচগুণ—একনিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ, কারুণ্য এবং তার উপরে তার নিজস্ব গুণ, কান্তভাবে নিজাঙ্গ দান করিয়া প্রিয়জনের সেবা করা। আর সকল রসে যা আছে, মাধুর্য্যে তাহা তো আছেই; কিন্তু আর কোনও রসে যাহা নাই, সেইটীও এ রসে আছে। এইজন্য মাধুর্য্যরস সকলের সেরা সকলাপেক্ষা জটিল। এইজন্য একাধারে এখানে অশেষ উৎকর্ষ, অসীম উচ্ছ্বাস ও অপরিমেয় জটিলতা দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহাতে বহুবিধ বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ ও সংগ্রাম হয় বলিয়া, মাধুর্য্যের রূপও এক নহে, কিন্তু বহু, অসংখ্য। এ রূপ কখনও বা শিরীষ পুষ্পাধিক সুকুমার, কখনও বা বজ্রাদপি কঠোর। তাহাতে কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ; কখনও দৈন্য, কখনও গর্ব্ব; কখনও উদার দান, কখনও কঠিন কার্পণ্য; কখনও ক্রোধ, কখনও ক্ষমা; কখনও দুর্জ্জয় মান, কখনও অকৈতব আত্ম-নিবেদন;—এ সকলই ফুটিয়া উঠে। কখনও বা এ সকল যুগপৎ প্রকাশিতও হয়। এই বহুরূপী রসের রূপের কথা কেমন করিয়া কহিব?

শান্তদাস্যাদি রসপঞ্চকের আলোচনায়

একটা সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যার প্রতি পণ্ডিতেরাও আজি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া জানি না। সে সত্যটী এই যে, যে রস যত উন্নত ও জটিল, সেই রসের আমাদের শরীরের ও শারীরিক ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সম্বন্ধ তত নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ। শান্তে শরীর-গন্ধ নাই বলিলেও হয়। দাস্যেতেও মনেরই তৃপ্তি ও আত্মারই প্রসাদ জন্মায়, কিন্তু শরীরকে বড় একটা স্পর্শ করে না। সখ্যে প্রথমে শরীরটা রসের আশ্রয়ীভূত হয়। আসঙ্গলিপ্সা সখ্যের ধর্ম্ম। সখা সখাকে দেখিয়া কেবল সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁর কাছে ছুটিয়া যান, তাঁকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করেন, গলাগলি কোলাকুলি করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। তথাপি সখ্যেতেও মুখের ভাব ও চক্ষের চাহনি আর কখনও সখারসের অতিবৃদ্ধিতে পুলক পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। বাৎসল্যের শরীরের সঙ্গে যোগ সখ্য অপেক্ষা বিস্তর বেশি। সন্তান কোলে লইয়া, তাহাকে স্তন্যদান করিতে করিতে সন্তানবতী রমণীর সর্ব্বাঙ্গে বাৎসল্যের প্রভাব ছাইয়া পড়ে। স্তন-যুগল ক্ষীরস্রাবে স্ফীত হইয়া উঠে, প্রতিলোম-কূপে পুলক সঞ্চারিত হয়, মুখ আরক্তিম হইয়া পড়ে, চক্ষে কারুণ্যজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয়। দেহের অণুতে অণুতে যেন এই বাৎসল্যরস সঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে এই বক্ষস্থ সন্তানের পালন ও পরিচর্য্যার জন্য সজাগ ও সতেজ করিয়া তুলে। মায়ের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি ও প্রাণতা যেন গলিয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইয়া, তাঁর স্তনযুগলের ভিতর দিয়া আসিয়া শিশুজীবনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। শান্তে দেহ নির্ব্বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়। দাস্যে দেহের বিকার হয় না, সেবাব্রতে কার্য্যমাত্র হইয়া থাকে। সেবার শুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধনের ঐকান্তিক আগ্রহা-তিশয়বশতঃ উৎকণ্ঠাদির নিবন্ধন, এখানে অতি অল্প পরিমাণে স্নায়ুগুলাতে যাইয়া সাড়া পড়ে বটে, কিন্তু সে সাড়া অতি ক্ষীণ। সখ্যে তার চাইতে বেশি। বাৎসল্যে দেহসম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠতর। মাধুর্য্যে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। এখানে শরীরটা উপেক্ষণীয় নহে। এখানে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি অঙ্গ পরস্পরের প্রতি অঙ্গের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া, প্রতি অঙ্গের বিকার উৎপাদন করে। এ রস সকল অঙ্গকে অধিকার করিয়া উথলিয়া উঠে।

সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা প্রবোধো নিদ্রা বা
কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণঃ
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রাময়তি সমুন্মূলয়তি চ॥

অনন্যোপাশ্রিত রামচন্দ্রের বাহুকে উপাধান করিয়া গুরুগর্ভভারক্ষীণা জানকী শয়ন করিয়া-ছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন প্রিয়া-অঙ্গ-স্পর্শ লাভ করিয়া বলিতেছেন, এ কি সুখ না দুঃখ; এ কি জাগ্রতাবস্থা না নিদ্রা, এ কি বিষসঞ্চারিত হইতেছে না সুরা; তোমার প্রতি স্পর্শে আমার পরিমূঢ় ইন্দ্রিয়গণ একবার কারিয়া চেতনা হারাইতেছে, আবার তখনই সচেতন হইতেছে। রাম-সীতার প্রেম যে বিশুদ্ধ, তার তো কোনও কথাই নাই। ভবভূতিও যে সুরুচিসম্পন্ন কবি, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এখানেও, মাধুর্য্যের ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্বন্ধটাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না।

যেমন শরীরের সঙ্গে, সেইরূপ বয়সের

সঙ্গেও মাধুর্য্যের একটা অতি নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এ কথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। শরীরই যখন মাধুর্য্যের প্রধান ও ঘনিষ্ঠ আশ্রয় ও অবলম্বন, তখন শরীরের অবস্থাবিশেষ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে এ রসের উদ্ভব সম্ভব না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যৌবন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে, কিম্বা যৌবন নিতান্ত শেষ হইয়া গেলে, কাহারো পক্ষে প্রকৃত মাধুর্য্য সাধন বা আস্বাদন সম্ভব হয় না। ভরা জোয়ারের গঙ্গার মতন, যৌবনপ্রভাবে যখন দেহমন আতট পরিপূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখনই তাহাতে মাধুর্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয় সতেজ থাকিবে, শুদ্ধ থাকিবে, অনাঘ্রাত দেবভোগ্য পুষ্পের মতন অনন্যস্পৃষ্ট ও অনভুক্ত থাকিবে, তবে তাহা মাধুর্য্যসাধনের ও আস্বাদনের উপযোগী হয়। ব্রহ্মবর্চ্চস-সম্পন্ন ব্রহ্মচারি-দেহই মধুরলীলার যোগ্য ক্ষেত্র। উদ্ভিন্ন-যৌবনা, সংযতবাক্কায়মনা, রূপলাবণ্য-সম্পন্না, সুলক্ষণা, সম্ভাবিত-মাতৃকা, স্বাস্থ্যশক্তি-শ্রীযুক্তা কামিনীই এ রসলীলার উপযুক্ত সহায়। অতএব শরীরের সঙ্গে এ রসের নিরতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া, ইহাকে উপেক্ষা করিবার কোনও হেতু নাই। যে সে শরীরে মাধুর্য্যের রূপ ফুটে না। সে দেহ শুদ্ধ হওয়া চাই, সুস্থ হওয়া চাই, সবল হওয়া চাই, সুন্দর হওয়া চাই। সে দেহের সঙ্গে মনের, ভাবের, সহ সঙ্গত থাকা চাই। সে দেহ, তার প্রত্যেক পেশী, প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক স্নায়ুকেন্দ্র বা nerve-centre সতেজ ও ভাবদ্যোতনের উপযোগী হওয়া চাই। অনাচারে অত্যাচারে যে শরীর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কামের পৈশাচিক-নৃত্য দেখা যাইতে পারে, বিশুদ্ধ মাধুর্য্যমূর্ত্তি কখনই ফুটিয়া উঠিতে পারে না। মাধুর্য্যের মূর্ত্তি ফুটাইতে হইলে, সিদ্ধদেহ লাভ করা আবশ্যক। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফল ব্যতিরেকে সে দেহ কেহ লাভ করিতে পারে না। যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট, সে বস্তু এ সংসারে তত বিরল। মাধুর্য্য সকল রসের সেরা বলিয়া, তার মূর্ত্তিও সচরাচর চক্ষুগোচর হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মহাভারতের কাল

প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ায় মহাভারতের কাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে বাধ্য হইলাম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন কেহ বা নবীন বলেন। আবার তাঁহাদের কাহারও মত যে মহাভারত বুদ্ধদেবের কিছু পূর্ব্বে, কাহারও বা মতে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শতাব্দীতে উহা লেখা হয়, মহাভারতে স্থলে স্থলে প্রক্ষিপ্ত পাঠ আছে সত্য এবং সেই অংশগুলি আধুনিক ইহাও সত্য। কিন্তু মহাভারতের অধিকাংশ যে ৪০০০ সহস্র বৎসরের প্রাচীন ইহা প্রমাণ করা দুষ্কর নহে।

১। মহাভারত ভট্টনারায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন।

মহাভারত যে ভট্টনারায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বেণীসংহারে কেবল যে মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণিত তাহা নহে, ব্যাসের নামও স্পষ্ট আছে। ভট্টনারায়ণ ঘটকদের কারিকা মতে ৯৯৯ সংবতে বঙ্গদেশে আসেন। তখন তিনি কৃতী অর্থাৎ নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুতরা সহস্র বৎসরের অপেক্ষাও মহাভারত প্রাচীন স্থির হইল।

২। শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন

মহাভারত যে শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা শঙ্করাচার্য্যের গীতার ভাষ্য হইতে সুস্পষ্ট। শঙ্করাচার্য্যের বয়স লইয়া মতভেদ থাকিলেও তিনি যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অধস্তন নহেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং মহাভারত খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে প্রাচীন।

৩। বাণভট্ট অপেক্ষা প্রাচীন

হর্ষচরিতে বাণভট্ট ব্যাসকে প্রণাম করিয়াছেন

"নমঃ সর্ব্ববিদে তস্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে।
চক্রে পুণ্যং সরস্বত্যা যো বর্ষমিব ভারতম্॥"

কাদম্বরীতে উপমাচ্ছলে মহাভারতের নিখিল চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ আছে। বাণভট্টকে Peterson প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কবি বলিয়াছেন। কারণ তাঁহার উপজীব্য হর্ষবর্দ্ধন ঐ সময়ের রাজা। হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনও বাহির হইয়াছে। তাহারাও সপ্তম শতাব্দীর।

সুতরাং মহাভারত ১২০০ বৎসরেরও প্রাচীন।

৪। ভারবি অপেক্ষা প্রাচীন

ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় যে মহাভারত অবলম্বনে লিখিত তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। চালুক্যরাজচক্রবর্ত্তী সত্যাশ্রয় বল্লভ বা পুলকেশরীর ৫৫৬ শকের প্রশস্তিতে ভারবির নাম থাকায় ভারবি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী অপেক্ষ প্রাচীন ইহা স্থির শ্রীমৎ পৃথ্বী কোঙ্গনী মহারাজের ৬৯৮ শকের দানপত্রের দাতা পৃথ্বী কোঙ্গনীর পিতামহ নবকামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূরিক্রমের প্রপিতামহ দুর্ব্বিণীতকেও কিরাতার্জ্জুনীয় পঞ্চদশসর্গাদি কোত্থার বলা হইয়াছে। ঐ শব্দের যদি এরূপ অর্থ হয় যে দুর্ব্বিণীত ভারবিকে কিরাতার্জ্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গ লিখিতে প্রবৃত্ত করেন, তাহা হইলে ভারবি দুর্ব্বিণীতের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। ঐ দুর্ব্বিণীতের এক দানপত্র বাহির হইয়াছে। তাহার কাল ৪৩৫ শক। সুতরাং ভারবিকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই মহাভারত ১৫০০ বৎসরেরও প্রাচীন হয়।

৫। পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন

পঞ্চতন্ত্রের প্রথমেই সমুৎপরাশরকে প্রণাম করা হইয়াছে। যথা :—

মানবে বাচস্পতয়ে শুক্রায় পরাশরায় সসুতায়।
চাণক্যায় চ বিদুষে নমোঽস্তু নয়শাস্ত্র-কর্ত্তৃভ্যঃ॥

মহাভারত হইতে পঞ্চতন্ত্রকার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা "অশোচ্যান্

অনুশোচস্বম্" ইত্যাদি। সুতরাং মহাভারতের গীতাও যাহাকে প্রতীচ্যগণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন তাহাও পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। পঞ্চতন্ত্র খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে Anushirvan নামক পারস্য সম্রাটের প্রধান বৈদ্য বুজার চুম্মির কর্ত্তৃক অনূদিত হয়। সুতরাং পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। মহাভারত তদপেক্ষা বহু প্রাচীন।

৬। কালিদাস ও ভর্ত্তৃহরি অপেক্ষা প্রাচীন

মেঘদূতে গাণ্ডিবী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভর্ত্তৃহরি শৃঙ্গারশতকের ৯৫ শ্লোকে পরাশরের নাম যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বুঝায় যে সত্যবতী দর্শনে বৃষ্ণীর ধৈর্য্যচ্যুতি কবির বর্ণনীয়। আরও ভর্ত্তৃহরি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির পরবর্ত্তী হওয়ায় এবং পতঞ্জলি ব্যাসদেব ও তৎশিষ্য বৈশম্পায়নাদির এবং যুধিষ্ঠিরাদির নাম করায় ভর্ত্তৃহরি অপেক্ষা মহাভারত প্রাচীন। ভর্ত্তৃহরির কারিকাতেও কংসাদি মহাভারতোক্ত চরিত্রের উল্লেখ আছে; যথা—

শব্দোপহিতরূপাংস্তু বুদ্ধেবির্ষতাং গতান্।
প্রত্যক্ষমিব কংসাদীন্ সাধনত্বেন মন্যতে॥

ভর্ত্তৃহরির বয়স প্রবাদ মতে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শতাব্দীতে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। সুতরাং বেদব্যাস ২০০০ হাজার বৎসরের ও প্রাচীন।

৭। Weber মতে মহাভারত ২০০০ বৎসর প্রাচীন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Weber প্রভৃতি স্বীকার করেন যে মহাভারত খৃষ্ট জন্মের কিছু পূর্ব্বে Chrysoosun নামক খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ইউরোপীয় নাবিক মহাভারত নামক হিন্দুদের উপাখ্যানের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ মহাভারতকে উহার পর আনিতে পারেন না। উহার পূর্ব্বে অন্য কোন বিদেশী কর্ত্তৃক মহাভারত উল্লিখিত না হওয়ায় মহাভারত ২০০০ বৎসর অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিতে চান না। ধন্য যুক্তি!

৮। মহাভারত মহাভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও পাতঞ্জল দর্শনের পাতঞ্জল এক ব্যক্তি নহেন। মহাভাষ্যকার চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের নাম করিয়াছেন, ও শকগণ কর্ত্তৃক সাকেতাবরোধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে পণ্ডিত Gold Stucker খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহাভাষ্যে মহাভারতের সকল চরিত্রেরই উল্লেখ পাওয়া যায় "বৃষ্ণ্যন্ধক, বৃষ্ণি, কুরুভ্যশ্চ" (৪।১।১১৪। পা ১১৭ সি) এই সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি উগ্রসেন নামক অন্ধকবংশীয় রাজা, বাসুদেব কৃষ্ণ এবং কুরুবংশীয় ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের নাম করিয়াছেন; যথা—

উগ্রসেনো নামান্ধকঃ তস্মাৎ
উভয়ং প্রাপ্নোতি।

বাসুদেব বলদেবঃ।
অন্য স এব। বিশ্বক্সেনো নাম বৃষ্ণিঃ।
তস্মাৎ উভয়ং প্রাপ্নোতি।
ন্যো ভবতি বিপ্রতিষেধেন। বৈষ্যক্সেন্তঃ।
কুর্বণোরবকাশ। নকুলঃ সহদেবঃ।
অন্য স এব। ভীমসেনো নাম
কুরুস্তস্মাদুভয়ং প্রাপ্নোতি।

ন্ত্যো ভবতি বিপতিষেধেন। ভীমসেন্যঃ। উক্ত উগ্রসেন প্রভৃতি যে রক্তমাংসের জীব তাহা ঐ ঐ শব্দের উত্তর অপত্যার্থ প্রত্যয় অন্‌ বা ন্য হয় বলায় প্রকাশ পাইতেছে।

"জনপদ শব্দাৎ ক্ষত্রিয়াদঞ্"
(৪।১।১৬৮ পা ১১৮৬ সি)

এই সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি পঞ্চালানাং রাজা পাঞ্চালঃ বলায় পাঞ্চালগণ তাঁহার বিদিত ছিল বলিতে হইবে। ঐ সূত্রের পুরোরণ্‌ বক্তব্যঃ এই বার্ত্তিক তুলিয়া তিনি পৌরবঃ এই উদাহরণ দিয়াছেন এবং "পাণ্ডোর্ড্যণ্‌ বক্তব্যঃ" এই বার্ত্তিক ধরিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পুরু ও পাণ্ডু তাঁহার অবিদিত ছিল না। কুন্তীর পুত্র বুঝাইতে কৌন্তেয় শব্দ হয় বলায় মহাভাষ্যকার কুন্তীনন্দনগণকে জানিতেন বলিতে হইবে। বিশেষতঃ "গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ" (৮।৩।৫) এই সূত্র দ্বারা যুধিষ্ঠির শব্দ সাধিত হওয়ায় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের সহিত পাণিনিরও পরিচয় ছিল বলা যাইতে পারে। "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুণ্‌" পাণিনির এই সূত্রে যে বসুদেব পুত্র ক্ষত্রিয় বাসুদেব এবং তৎসখা অর্জ্জুনকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ভাষ্যে প্রকাশ। সুতরাং পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুনও ভাষ্যকারের পূর্ব্ব পরিচিত জানা গেল। কংসকে যে শ্রীকৃষ্ণ মারিয়াছিলেন তাহা ভাষ্যকার পাণিনির তৃতীয় অধ্যায়ে ১ম পাদের ব্যাখ্যার প্রথম আহ্নিকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা—

ইহ তু কথং বর্ত্তমানকালতা কংসং ঘাতয়তি, বলিং বন্ধয়তীতি, চিরহতে চ কংসে, চিরবদ্ধে বলৌ? তত্রাপি যুক্তা। কথম্? যে তাবদেতে শোভিকা নাম এতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি, প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়ন্তি ইতি। চিত্রেষু কথম্? চিত্রেষ্বপি উদ্গূর্ণা নিপততাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসস্য কৃষ্ণস্য চ।

অনুবাদ—কংস যখন বহুদিন হত হইয়াছে ও বলি বহুদিন বদ্ধ হইয়াছে, তখন কংসং ঘাতয়তি, বলিং বন্ধয়তি এইস্থলে কেন বর্ত্তমান কাল হইল? এইখানেও বর্ত্তমানকাল যুক্তিযুক্ত। কেন? যে সমস্ত নট আছে তাহারা এখনও কংসের হত্যা প্রত্যক্ষ দেখান এবং বলির বন্ধনও প্রত্যক্ষ দেখান। চিত্র সম্বন্ধে কেন কংসং ঘাতয়তি এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগান্বিত বাক্য-যুক্তিযুক্ত? চিত্রেও কংস এবং কৃষ্ণের প্রহার ও উদ্গূরণ ও পতন দেখান হয়, ইহা হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণ তখন এত প্রাচীন ও উপাস্য যে, তাঁহার চরিত্র লইয়া নাটকাদি ও চিত্রাদি ভাষ্যকারের সময় বহুল প্রচলিত ছিল। ভাষ্যকার সুধাতুরকঙ্ চ (৪।১।৯৭ পা ১০৯৭ সি) সূত্রের ভাষ্য 'সুধাতৃব্যাসয়োরিতি বাচ্যম্" ও "ব্যাসবরুড়নিষাদচণ্ডালবিম্বানামিতিবক্তব্যম্" এই দুইটী বার্ত্তিক তুলিয়া বৈয়াসকিঃ শুকঃ দুইবার বলিয়াছেন "কালাপি বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ" (৪।৩।১০৪ পা ১৪৬৪ f) সূত্রের ভাষ্যে তিনি বৈশম্পায়ন ও বৈশম্পায়নের শিষ্য কঠ এবং প্রশিষ্য খাড়ায়নেরও নাম করিয়াছেন। এইরূপে ভারতোক্ত যাবতীয় চরিত্র ও ভারতেরও রচয়িতা এবং বক্তার নাম করায় তিনি যে মহাভারতের পর তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ভাষ্যকারের বয়স ১৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইলে মহাভারত ২১০০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বলা যাইতে পারে।

৯। মহাভারত বার্ত্তিককার কাত্যায়ন অপেক্ষা প্রাচীন।

বার্ত্তিককার ব্যাসদেবের নাম "সুধাতুর-কঙ্‌চ" (৪।১।৯৭ পা ১০৯ সি) এই সূত্রের "ব্যাসবরুড়নিষাদচণ্ডালবিম্বানাং চেতিবক্তব্যম্" বার্ত্তিকে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ব্যাস শব্দে যে মনুষ্য বুঝাইতেছে তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না, কারণ ব্যাসের পুত্র বুঝাইতে অকঙ্‌ প্রত্যয় হওয়া উচিত বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার যে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, বাসুদেব, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন শাল্ব, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রুপদ, দ্রোণ, দ্রৌণি প্রভৃতি সকল মহাভারতের স্ত্রী ও পুরুষগণকে জানিতেন তাহাও তাঁহার বার্ত্তিকে স্পষ্ট। বাসুদেব পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা অব্যবহিত পরেই সিদ্ধান্ত করায় বাহুল্যভয়ে বার্ত্তিককার সম্বন্ধে অধিক বলা হইল না। কাত্যায়নের সময় ঠিক জানা নাই। তবে বোধ হয় তিনি বুদ্ধদেব অপেক্ষা নবীন নহেন, সুতরাং মহাভারত ২৫০০ বৎসর প্রাচীন বটে।

১০। মহাভারত পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন।

পাণিনিতে যুধিষ্ঠিরাদির আভাস পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির শব্দের বিশেষত্ব থাকায় পাণিনি "গবিযুধিভ্যাংস্থিরঃ" (৮।৩।৯৫ পা ৯৬৭ সি) সূত্র করিতে বাধ্য হন। অন্ধক, বৃষ্ণি ও কুরুর নাম "ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ" (৪।১।১৬৪ পা ১১১১ সি) সূত্রে প্রকাশ। অর্জ্জুনের নাম "রাজদন্তাদিষু পরম্" (২।২।৩১ পা ৯০২ সি) এই সূত্রের গণে বিষ্বক্‌সেনার্জ্জুনৌ উদাহরণে ও "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাম্" ৪।৩।৯৮ পা ১৪৭৮ সি) সূত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, গদ, সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, অর্জ্জুন প্রভৃতি নাম "বাহ্বাদিভ্যশ্চ" (৪।১।৯৬ পা ১০৯৬ সি, সূত্রের বাহ্বাদিগণে প্রদত্ত। বাহু প্রভৃতি ব্যক্তির অপত্য বুঝাইতে ইঞ্‌ প্রত্যয় হয় বলায় পাণিনির যুধিষ্ঠিরাদি যে ব্যক্তিবিশেষ তাহা বুঝা যায়। কর্ণ, দ্রুপদ, অর্জ্জুন ও কুন্তী "বুঞ্‌ছণ্‌কঠজিলসেনিরঢঞ্‌"—ইত্যাদি (৪।২।৮০ পা ১২৯২ সি) সূত্রের গণপাঠে উল্লিখিত। রুক্মিণী, রোহিণী, ও শকুনি এই তিন নামও "শুভ্রাদিভ্যশ্চ" (৪।১।১২৩ পা ১১২৬ সি) সূত্রের গণপাঠে ব্যক্ত। উহারা যে ব্যক্তিবিশেষ তাহা ঐ ঐ শব্দের উত্তর অপত্যার্থপ্রত্যয় ঢক্‌ হইবে বলা বুঝা যাইতেছে। "স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরুভ্যশ্চ" (৪।১।১৭৬ পা ১১৯৫ সি) সূত্রে কুন্তী, কুরু ও অবন্তি নামক ব্যক্তিগণ কথিত। গান্ধারী সাল্বেয়ের নামক ব্যক্তি "সাল্বেয়গান্ধারিভ্যাং চ" (৪।১।১৬৯ পা ১১৮৭ সি) সূত্রে প্রকাশ। "কুরুনাদিভ্যোণ্যঃ" (৪।১।১৭২ পা ১১৯০ সি) সূত্রে কুরু নামক ব্যক্তি আবার উল্লিখিত ও তাঁহার বংশধরেরা কৌরব্য বলা হইয়াছে। "সাল্বাবয়ব প্রত্যগ্রথ কলকূটাশ্মকাদিঞ্‌" (৪।১।১৭৩ পা ১১৯১ সি) সূত্রে অশ্মকের অপত্য এই অর্থে আশ্মকির উল্লেখ আছে। আমরা দেখিয়াছি যে এক অশ্মকী পুরুবংশীয় সংবর্ত্তর জননী। "দ্রোণপর্ব্বতজীবন্তাদন্যতরস্যাম্" (৪।১।১০৩ পাঃ ১১ ৫ সিঃ) সূত্রে দ্রোণ নামক ব্যক্তি ও তৎপুত্র দ্রৌণি উল্লিখিত। অর্জ্জুনের ধনু গাণ্ডীব ও পাণিনির সূত্রে স্থান পাইয়াছে,—যথা "গাণ্ডাজগাৎসংজ্ঞায়াম্" (৫।২।১১০ পা ১৭ সি) পরাশরের নামে "গর্গাদিভ্যোযঞ্‌" (৪।১।১০৫ পা ১১০৭ সি,) সূত্রের গণপাঠে আছে। ব্যাসের নাম তিনি স্পষ্ট করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বার্ত্তিককার "সুধাতুর-

কণ্ডচ” (৪।১।৭ পা ১০৯৭ সি,) সূত্রের বার্ত্তিকে ব্যাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী শাকটায়নও ব্যাসের নাম করায় পাণিনি অপেক্ষা ব্যাস যে প্রাচীন বুঝা যাইতেছে “নভ্রাজ নপাৎ” ইত্যাদি সূত্রে নকুল শব্দ আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যবাচী কি পশুবাচী বুঝা যায় না। সুতরাং ঐ সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া পাণ্ডুনন্দন নকুলের কথা পাণিনির বিদিত বলা যায় না। পাণিনি শাকল্যনামক শাব্দিকের নাম করিয়াছেন এবং তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা “লোপঃ শাকল্যস্য” (৮।৩ পা ৬৭ সি) সূত্রে প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অনুষঙ্গ পাদে দেখিতে পাই যে বেদব্যাসের জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, পৈল ও লোমহর্ষণ নামে পঞ্চশিষ্য থাকে। ব্যাসদেব জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, পৈলকে ঋগ্বেদ এবং লোমহর্ষণকে পুরাণ শিক্ষা দেন। পৈলের শিষ্যধারা ঐ পুরাণে এইরূপ দেওয়া

ব্যাস
|
পৈল
|
ইন্দ্রপ্রমতি
|
মার্কণ্ডেয়
|
সত্যশ্রবা
|
সত্যহিত
|
সত্যতর
|
সত্যশ্রী
|
শাকল্য | রথান্তর | বাস্কলি | ভরদ্বাজ

শাকল্য
|
মুদ্গল | গোলক | খালীয় | মৎস্য | শৈশিরেয়

আছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে শাকল্য ব্যাসদেবের প্রশিষ্যের প্রশিষ্যের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য এই শাকল্যকে পদবিভাগ বলা হইয়াছে। তিনি ঋগ্বেদের উপর কতকগুলি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের বোধ হয় এই শাকল্যই পাণিনির “নলোপঃ শাকল্যস্য” সূত্রের শাকল্য। পাণিনি অপেক্ষা ব্যাস বহু প্রাচীন, ইহা অন্য দিক্ হইতেও দেখান যায়, পাণিনি “কলাপি বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ’ (৪।৩।১০৪ পা ১৪৮৪ সি) সূত্রে বৈশম্পায়নের এবং “কঠচরকাল্লুক্’ (৪।৩।১০৭ পা ১৪৮৭ সি) সূত্রে কঠের ও চরকের এবং “পারাশর্য্য-শিলালিভ্যাম্ ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ” (৪।৩।১১০ পা ১৪৯০ সি) সূত্রে পারাশর্য ও শিলালির নাম করিয়াছেন। কঠ যে বৈশম্পায়নের শিষ্য তাহা মহাভাষ্য হইতে জানিতে পারি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও দেখিতে পাই যে বৈশম্পায়নের এক শিষ্যসম্প্রদায় চরক নামে অভিহিত হন। “কঠচরকাল্লুক্” এই সূত্রের কঠ ও চরক বৈশম্পায়নশিষ্য বলিয়া বোধ হয়। পারাশর্য্য একজন কৌথুম হওয়ায় কুথুমির শিষ্যধারা বটে কুথুমির গুরু পৌষঞ্জী, তাঁহার গুরু সুকর্ম্মা, তাঁহার গুরু সুত্বা, তাঁহার গুরু সুমন্ত, তাঁহার গুরু জৈমিনি ও জৈমিনির গুরু বেদব্যাস, সুতরাং ব্যাসদেব কুথুমির অপেক্ষাও প্রাচীন। বৈযুতিকন্যায়ে তিনি পাণিনির বহুপ্রাচীন। পাণিনির উল্লিখিত বৈশম্পায়ন যে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, ও চরক বৈশম্পায়নের শিষ্য তাহা ভাষ্য হইতে বুঝা যায়। অতএব মহাভারতের যাবতীয় পুরুষ রচয়িতা ও বক্তা পাণিনি কর্ত্তৃক উল্লিখিত বলা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন যে পাণিনির উল্লিখিত

যুধিষ্ঠিরাদি যে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরাদি তদ্বিষয়ে প্রমাণ কোথায়? তাহার উত্তর "বাসুদেবার্জ্জনাভ্যাং বুণ্" এই সূত্র। ইহার অর্থ এই যে বাসুদেব ও অর্জ্জুন শব্দের উত্তর তাঁহাদের ভক্ত বুঝাইতে বুণ্ প্রত্যয় হয়। এই সূত্রের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনই বুঝাইতেছে। প্রথমতঃ সাহচর্য্য বশতঃ ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য অর্জ্জুন বুঝাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় পাণ্ডবই নারায়ণের সখা নর ঋষির অবতার বলিয়া শাস্ত্রে বিদিত। তিনি ভিন্ন অন্য কোন অর্জ্জুন উপাস্য হন নাই। ঐ সূত্রে উপাস্য অর্জ্জুনেরই উল্লেখ হওয়ার পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনই উল্লিখিত। মহাভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই অর্জ্জুন শব্দে তাই বুঝিয়াছেন। ইহার উপর যদি দেখি যে পাণিনি মহাভারতশব্দও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। সেই উল্লেখ "মহান্ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসবাজালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু" (৬।২।৩৮ পা ৩৭৭২ সি) সূত্রে আছে। অতএব ইহা স্থির যে পাণিনি মহাভারতের পর। পাণিনির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক Gold Stucker যে বলিয়াছেন, তিনি বেদান্ত ন্যায় মীমাংসা পাতঞ্জল সাংখ্য প্রভৃতির প্রাচীন, তাহা কেবল প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। পাণিনি শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী বটে, বোম্বাই অঞ্চলের অধ্যাপকগণ তাঁহাকে খৃষ্ট জন্মের ৮০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলেন। আমরাও যেরূপ প্রমাণ পাইলাম তাহাতে তিনি ঐরূপ কালেরই লোক হইবেন। যাহা হউক পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন হওয়ায় মহাভারত অন্ততঃ ২৮০০ বৎসরের প্রাচীনগ্রন্থ প্রমাণিত হইল।

শাস্ত্রী শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাগরের ঋণ-পরিশোধ

যে সকল মহাত্মা স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পদ্ ব্যয় করিয়া মানব সমাজের দুঃখ হরণ ও সুখ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই অপব্যয়-বিমুখ। ভাসাভাসা ভাবে তাঁহাদের আচার-আচরণ অবলোকন করিলে তাঁহাদিগকে ব্যয়-কুণ্ঠ, এমন কি কৃপণস্বভাবের লোক বলিয়া মনে হইতে পারে।

আমাদের চিরপূজনীয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ ধাতুর লোক ছিলেন। তিনি নানাস্থান হইতে যে সকল পত্র পাইতেন, সেই সকল পত্রের ব্যবহারযোগ্য অংশ, পত্র-পাঠান্তে, কাটিয়া লইতেন এবং সেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতেন। একদা স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়কে ঐরূপভাবে পত্রাংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখিতে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তুমি এরূপ চুরি-বিদ্যা কোথায় শিখিলে?" উত্তরে দুর্গামোহন বাবু প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "এ বিদ্যা আমি আপনার দেখিয়া শিখি নাই,

এটা আমার নিজেরই বিদ্যা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, ' তুমি অত বড উকিল হইয়া এক কথায় ধরা দিলে জেরার সুযোগটাও দিলে না। আমার দেখিয়া শিখিয়াছ কি না, আমি ত তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই " দুর্গামোহন বাবু সহাস্যে উত্তর করিলেন, 'সত্যই এ চুরি-বিদ্যা, আপনার দেখিয়া ইহা শিখিয়াছি, এ বিষয়ে আপনিই আমার গুরু।"

গৃহে পরিচারিকা বাটনা বাটিয়া শিল ধোয়া জলটা ফেলিয়া দিতেছে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "করে কি? অতটা বাটনার জল ফেলিয়া দিলে, ওটা তরকারিতে দিলে ত লোকসান হইত না। দেখ, এমন করে অপব্যয় করিও না।" পরিচারিকা সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, "দাদা মশাইয়ের কত টাকা অপব্যয় হয়, আর শিল ধোয়া জলে নজর পড়েছে, বাটনার জল আর ফেল্‌বো না।" দয়ারসাগর পরিচারিকাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমার একটি পয়সাও অপব্যয় হয় না। মানুষকে হাতে তুলে দিলে কি অপব্যয় হয়? যে দেয় তারও সুখ, আবার যে পায়, তারও সুখ। এ যে তুমি ফেলে দিলে।" যাহারা নিকটে ছিল, তাহারা সে দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন।

দোকান হইতে কোন দ্রব্য কাগজে বাঁধিয়া আনা হইলে, ঐ কাগজ ও দড়িগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়া নিজের শয়নকক্ষের আলমারির উপর রাখিয়া দিতেন, বাড়ীর সকলে বিশেষভাবে সে সময়ে বালক দৌহিত্রদ্বয় সুরেশচন্দ্র ও জ্যোতিশ্চন্দ্র ঐ বাজে কাগজ ও দড়ি মজুত করা দেখিয়া সর্ব্বদাই পরিহাসের স্বরে দু'এক কথা বলিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর কোন বিশেষ প্রয়োজনে জ্যোতিশ্চন্দ্রের ঐ বাজে কাগজ ও দড়ির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শয়নকক্ষে আলমারির মাথা হইতে ঐ বাজে কাগজ ও দড়ি আনিতে গিয়া তিনি ধরা পড়িয়া যান। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে সম্বন্ধ সঙ্গত গালি দিয়া বলিয়াছিলেন, ' ঐগুলি কুড়াইয়া জড় করবার সময়ে যে বড় ইয়ারকি হয়, তখন হেসে কুটিকুটি, আর এখন যে বড় সেই ছেঁড়া মাল চুরি করিতে এসেছিস্? থাম্ থাম্ আমি দিচ্ছি।" এইরূপ বহু বহু ঘটনায় দেখা যায়, আহারান্তে পাতে অন্নব্যঞ্জন পড়িয়া থাকা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। তাই অর্জ্জিত অর্থের উপযুক্ত ব্যবহারের জ্ঞানও তাঁহার জীবনে অতি উচ্চভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনার সারভাগ এই যে, জনসমাজে বাস করিতে হইলে, জনসমাজের সুখ সুবিধা সর্ব্বাগ্রে সাধন করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণোচিত উচ্চনীতি অতি সহজভাবে তাঁহার জীবনকে আশ্রয় করিয়াছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ ও বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। সেই প্রথম অনুষ্ঠান কালে কলিকাতার ও বঙ্গের নানাস্থানের সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি বিধবা-বিবাহ-সমিতির কার্য্য পরিচালন জন্য প্রচুর সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে অগ্রসর হন, তখন স্বর্গীয় মতিলাল শীল মহোদয় প্রথম বিধবাবিবাহ অনু-

ষ্ঠানে লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম বিধবা-বিবাহের সময়ে তিনি লোকান্তর গমন করেন। তিনি জীবিত থাকিলে অবশ্যই লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় কখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নাই। কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে হীরালাল শীলের এবং তদীয় সহোদরগণের সাহায্যদানের অঙ্গীকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল. কিন্তু আক্ষেপের বিষয় কার্য্যকালে তাঁহারা এক পয়সাও সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। এইরূপ অনেকেই আপন আপন প্রতিশ্রুতি পালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায়, অল্পদিনের মধ্যে মহামনা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্থসাহায্য-প্রাপ্তির আশায় ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। একের পর এক, এইরূপে বিধবা-বিবাহের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণের পরিমাণও অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সকল প্রাথমিক অনুষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিতে তিনি নিজেই বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও পাঁচ শত টাকা বেতন পান, সুতরাং নির্ভয়ে নিজের মনের মত করিয়া বিবাহানুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত মনোমালিন্য নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ করিলেন। বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা স্যর ফ্রেডারিক্ হ্যালিডে মহোদয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। ছোট লাট অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই পণ্ডিতের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। বিধবা-বিবাহ ব্যাপার স্মরণ করাইয়া ছোট লাট ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "এরূপ অবস্থায় চলিবে কেমন করিয়া?" উত্তরে পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "আপনি যখন ভয় দেখাইতেছেন, তখন আর ও পদত্যাগপত্র প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কিছুই ভাবিব না। আমি অধ্যাপক বংশের লোক, এক পোয়া চাউল আর একটা কাঁচকলা হইলেই আমার দিন চলিবে। আমি ইজ্জৎ হারাইয়া চাকুরি করিব না।" চাকুরি ছাড়িয়া দিলেন।

উপার্জ্জন বন্ধ হইল, অপর দিকে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন বন্ধুবান্ধবেরা বুঝিলেন এ ঋণ হইতে তাঁহার অব্যাহতি লাভ একেবারে অসম্ভব, তখন তাঁহার সহোদরতুল্য সুহৃদ্ প্যারিচরণ সরকার মহাশয় এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক। তিনি বিধবা-বিবাহ-নিবন্ধন ঋণের পরিমাণ ও তজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপদ্‌বার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া অর্থ-সংগ্রহের আয়োজন করিলেন। বোধ হয় দু'একটা বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদ অবগত হইবা মাত্র তাহা বন্ধ করাইয়া দেন এবং বলেন, "যে দেশে লোক বিধবা-বিবাহ-ফণ্ডে অর্থ-সাহায্য অঙ্গীকার ও স্বাক্ষর করিয়া পরে টাকা দিবার সময় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সে দেশে আমার ব্যক্তিগত বিপদ্-বার্ত্তা জানাইয়া অর্থ সংগ্রহ করার ন্যায় ঘৃণিত কাজ আর কি হইতে পারে? আমার ঋণ আমিই পরিশোধ করিব। বিজ্ঞাপন উঠাইয়া দেও।" পরে উল্টা বিজ্ঞাপনও বাহির হইয়াছিল। ঋণের পরিমাণ যেমন একদিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বিধবা-বিবাহ-অনুষ্ঠানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইতে

লাগিল। ক্রমে এমন দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল যে, দশটা টাকাও কোন কোন দিন বিদ্যাসাগরের পক্ষে মূল্যবান্ বস্তু হইয়া পড়িল। এই সময় তাঁহার ঋণের পরিমাণ ৭০।৮০ হাজার টাকা; এ কথা তিনি নিজেই আমাদের নিকট প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন।

এইরূপে ঋণজালে জড়িত বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ও পর বৎসরের প্রথম ভাগে বিদেশবাসী অমর কবি মধুসূদনের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে তিনি অর্থাভাবে বিদেশে বিপন্ন। অর্থ সাহায্য না পাইলে শীঘ্রই তাঁকে কারাগারে যাইতে হইবে। মধুসূদনের এই বিপদ্‌বার্ত্তা অবগত হইয়া অগ্রে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সদুপায় অবলম্বনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেখানে ব্যর্থচেষ্ট হইয়া পরিশেষে উপর্য্যুপরি দুই বারে, প্রথমবারে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট ১৫০০৲ টাকা ও পরের মেলে জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট ২৫০০৲ টাকা, মোট চারি হাজার টাকা নিজ দায়িত্বে ঋণ করিয়া পাঠাইয়া দেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখনকার অবস্থায় এই প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে করা যে সুবিবেচনার কাজ হইয়াছিল, সংসারে ইহা সকলে অবশ্য বলিবে না এবং তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বও সকলে বুঝিবে না, কিন্তু বঙ্গীয় বহু ধনী বন্ধু পরিবেষ্টিত মধুসূদন ও তাঁহার ন্যায় আরও বহু বিপন্ন ব্যক্তিই কেবল বিদ্যাসাগরের হৃদয়-শক্তির অপরিমেয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাই বঙ্গের মধুসূদন,—বিদেশে বিপন্ন মধুসূদন,—সাগর-সদনে উপকৃত মধুসূদন তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে নিজ হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে!
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে—
গিরীশ * * * ।" ইত্যাদি।

মধুসূদন এই চারি সহস্র মুদ্রার ঋণ কোনও দিন পরিশোধ করিতে পারেন নাই। সুদসহ ঐ ঋণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও সেই অসামান্য শক্তিশালী মহাকবি মধুসূদন বিদ্যাসাগর-সদনে বহু অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। শেষে সময়ে সময়ে সাগরের রত্নোত্তোলনের ন্যায় লুটপাট করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। উত্তমর্ণের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া এবং মধুসূদনের নিকট টাকা আদায়ের কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, বিপন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রেসের অদ্ধাংশ বিক্রয় করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করেন।

যে সময়ে অর্থবিষয়ে তাঁহার কেবল সুবিধার সূত্রপাত হইতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বকৃত বহুঋণ পরিশোধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদা তাঁহার পূর্ব্বতন হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও এডিশনাল ইন্‌স্‌পেক্টরের পদে অবস্থিতি কালে

তাঁহার হাতে সরকারি টাকা কিছু থাকিয়া গিয়াছে। হিসাব দৃষ্টে, তাহা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়কে প্রাচীন হিসাব দৃষ্টে, তাঁহার নিকট প্রাপ্য টাকার পরিমাণ স্থির করিতে ও তাঁহাকে জানাইতে লিখিলেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ সেই পত্রখানি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের হিসাব-দপ্তরে (Office of the Accountant General) পাঠাইয়া প্রাপ্য স্থির করিতে বলিলেন। সেখান হইতে সংবাদ আসিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এক পয়সাও পাওনা নাই। তাঁহার হিসাবে দেনাপাওনা ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। ডাইরেক্টর মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রোত্তরে ঠিক তাহাই জানাইলেন। পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক লোক এতেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু সৃষ্টিছাড়া বিদ্যাসাগর এতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার হিসাবে ৪৯১১।৴৫ টাকা গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। এ টাকা তিনি কোথায় কাহার নিকট পাঠাইবেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তসহ তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে তাঁহার নিকট কোনও পাওনা নাই, তথাপি তিনি যখন ঋণ স্বীকার করিয়া টাকা পাঠাইতে চাহিতেছেন, তখন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট ঐ টাকা পাঠাইলেই হইবে। তদনুসারে তিনি ঐ টাকা পাঠাইয়া পরস্ববিষয়ে অতি উচ্চ ন্যায়নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

এখনকার দিনে ইংরাজ-বাঙ্গালীতে একটা মৌখিক আত্মীয়তা দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে কালের ইংরাজ-সরকারের বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত বাঙ্গালী প্রধানগণের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আর আজ কাল দেখা যায় না। আজকাল দয়া ও অনুকম্পার সম্বন্ধই স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সমানে সমানে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা আজ কাল আর নাই। সে কালের হ্যালিডে সাহেবের সহিত এবং অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষদের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেইরূপ সম্বন্ধই স্থাপিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় গভর্ণমেণ্টের হিসাব-দপ্তরে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিসাবে পাই পয়সা ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল, ইহার তলদেশে কোন গোপন তত্ত্ব লুকাইয়া আছে। আমাদের বোধ হয় তদানীন্তন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে এই প্রাপ্যের সম্বন্ধে এরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে হিসাব ঠিক ঠিক মিলিয়াছিল! নতুবা ৪৯১১।৴৫ টাকা হিসাব মিলিয়া যাওয়া সহজ কথা নহে। এরূপ কোন ঘটনা ইহার অন্তরালে লুকাইয়া থাকুক আর নাই থাকুক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ-বিষয়ক উচ্চ নীতিজ্ঞান যে মানব-সংসারের আদর্শ দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নিকট সরকারের এক পয়সা পাওনা নাই, এ কথায় তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি সায় দিল না; এ চরিত্র এত মহৎ বলিয়াই আজ দেশের সমগ্র লোকের পূজার বস্তু হইয়াছে।

সে কালের এডুকেশন গেজেটে পূর্ব্ব-কথিত যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, সেই বিজ্ঞাপন-সংবাদ পুণ্যশীলা ও পরদুঃখকাতরা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার কর্ণগোচর হয়।

তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপদ্‌বার্ত্তায় ব্যথিত হইয়া সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার তদানীন্তন প্রধান কর্ম্মচারী রাজীবলোচন রায় মহাশয় দ্বারা এক পত্র লিখাইয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পত্রোত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহারাণীর এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সে পত্রে আরও বলিয়াছিলেন যে বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি ঋণ-জড়িত হইয়াছেন অনেকে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। এ ঋণ পরিশোধের জন্য বিধবা-বিবাহ ফণ্ডে কেহ কিছু দিলে লইতে পারি, কিন্তু মহারাণী মহোদয়া হিন্দু-বিধবা, তাঁহার পক্ষে বিধবা বিবাহ-ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করা সঙ্গত নহে, ইহাও আমি বেশ বুঝি ; তবে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় মহারাণীর প্রদত্ত সাহায্য ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। এ সময়ে ঋণের আকারে ঐ টাকা পাইলে আমার বিশেষ উপকার হইবে। দেওয়ানজী রাজীবলোচন রায় মহারাণীর আদেশমত ৭৫০০৲ টাকা কাশীমবাজার-হিসাব-দপ্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দান বলিয়া খরচ লিখাইয়া পাঠাইলেন, তৎসহ লিখিয়া দিলেন যে উহা ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। মহারাণী জানিলেন সাহায্য করা হইল।

পরবর্ত্তিকালে, রাজীবলোচনের লোকান্তর গমনের পর এবং রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের পর্য্যবেক্ষণকালে ১২৮৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক পত্র সহ ঐ ৭৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। ঐ পত্রের কিয়দংশ এখানে দেওয়া গেল :—"বহুদিন হইল অধুনা লোকান্তরবাসী রাজীবলোচন রায় শ্রীমতীর অনুমতি অনুসারে রাজধানীর ধনাগার হইতে আমাকে ৭৫০০৲ দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, এ টাকার সুদ দিতে হইবেক না, যখন সুবিধা হইবেক পরিশোধ করিবেন।" বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সদাশয় ও উদারচেতা রাজীবলোচন বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে সুদের দায়ে অব্যাহতি দিয়া এবং সময়ের অনির্দ্দিষ্টতা জানাইয়া ঐ টাকা একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গছাইতে পারিলেই উহা মহারাণীর সাহায্যদানে পরিণত হইবে। তিনি বিষয়বুদ্ধির দৃষ্টিতে বিষয়টার বিচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়নিষ্ঠার জ্ঞানের গভীরতা ততটা অনুভব করিতে পারেন নাই, আর তাহা না পারিবারই কথা, কারণ তাঁহার আমলেও এই বর্ত্তমান মহামান্য মহারাজ বাহাদুরের আমলে কতশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সামান্য কিছু প্রাপ্তির আশায় কতই না ছুটাছুটি করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত রচনাকালে কৃষ্ণনাথ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সমভিব্যাহারে রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন সে দরবারে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বাৎসরিক প্রাপ্য বিদায়ের জন্য যেরূপ দরবার করিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেরূপ স্থলে রাজীবলোচন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যদি টাকার পরিমাণের হিসাবে একটু ভুল বুঝিয়াছিলেন, এরূপ হয়, তাহাতে তাঁহাকে দোষারোপ করা চলে না। কারণ অর্থ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোভশূন্যতার

উচ্চ আদর্শ কয়টা লোকই বা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে ?

রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর সেই দিন পরিচয়ের পর আমার নিকট ঐ পত্রের প্রতিলিপি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে ঐ ৭৫০০৲ টাকা আমকেই গ্রহণ করিতে ও উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রায় বাহাদুর আরও বলিয়াছিলেন "ঐ টাকা লইয়া সে দিন বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল ৭৫০০৲ টাকা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্যদান বলিয়াই খরচ লেখা হইয়াছিল, এখন মহারাণী দান করা টাকা পুনর্গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেলেন। উপায় কি ? বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ টাকা ফিরাইয়া দিলে, তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন, বিরক্ত ও হইতে পারেন ; এইরূপ অনেক তর্ক বিতর্কের পর টাকা রাখা এবং তাঁহাকে তাঁহার অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লেখা হয়।" সে পত্রও তিনিই লিখিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই যে মধুসূদনের যে ঋণ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিয়াছিলেন, আজ সেই ঋণটা জাতীয় ঋণ বলিয়া স্বীকার করা বাঙ্গালীর অবশ্য কর্ত্তব্য। আর তাহাই যদি নীতিধর্ম্মের দৃষ্টিতে ন্যায়ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসভবনখানি যাহা কর্ত্তৃপক্ষগণের সুব্যবস্থার অভাবে ঋণদায়ে বিক্রয় হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালী জাতির সেই মহাতীর্থস্থান, সেই মহাপুরুষের বাসস্থানটি অন্যের হস্তে চলিয়া যাওয়া কি বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কের কথা নহে ? বাঙ্গালীর জাতীয় ধন ভাণ্ডারের অবস্থা কি, ঠিক জানি না, সম্ভব হইলে এখন সেই অর্থের দ্বারা অথবা বঙ্গের বর্ত্তমান কোন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ব্যক্তির যত্ন চেষ্টায় নূতন অর্থ সংগ্রহ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসভবন খানি তাঁহারই স্মৃতিমন্দির রূপে সুরক্ষিত হয় না ? ঐ শোভন দৃশ্য অট্টালিকা খানি অন্যের সম্পত্তি হইতে যাইতেছে, কিন্তু উহা মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার স্বর্গারোহণ সময়ে অসামান্য শক্তিশালী রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের সুবিবেচনার ফলে তাঁহারই আদেশে ভারত গভর্ণমেণ্টের চিহ্নিত অট্টালিকা। ঐ অট্টালিকার দ্বারে মেমোরিয়াল টেব্‌লেট্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ গৃহ উনবিংশ শতাব্দীর পুণ্যতীর্থ, ও অনেকগুলি সুন্দর প্রতিকৃতি ঐ গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে কালের উদারহৃদয় ইংরাজ বন্ধুগণের মহামূল্য চিত্রপট সকল এখনও ঐ গৃহে বর্ত্তমান। প্রতিকৃতিগুলি সমেত ঐ গৃহে তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে তাঁহার "স্মৃতিমন্দির"রূপে বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করায় আমাদের জাতীয় সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের কেবল কোন আপত্তি হইবে না, তাহা নহে তাঁহারা সাহ্লাদে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এরূপ স্থলে এরূপ অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীর প্রধানগণ অগ্রসর না হইলে, বাঙ্গালী জাতির চিরকলঙ্ক অর্জ্জন, ও মজ্জাগত অযোগ্যতার পরিচয় দান ভিন্ন গতি নাই। তাই আজ আমি দেশের প্রধানগণের নিকট বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানের আয়োজন

করুন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিজনবর্গ উহাতে বাস করিতে পান, আর না পান, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু উহা অন্যের ব্যক্তিগত ভোগের সম্পত্তি হইবে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না, মনের এ ক্ষোভ মরিলেও যাইবে না। এইজন্য বাঙ্গালীর প্রাণরূপ ও গুণগৌরব-সম্পন্ন প্রধানগণের দ্বারে এই কাতর প্রার্থনা লইয়া, উপস্থিত হইতেছি। জাতীয় অর্থে ঐ অট্টালিকা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত ও চিহ্নিত হইলে, এবং ঐ অট্টালিকা তাঁহার "স্মৃতিমন্দির"রূপে ব্যবহৃত হইলে, আমাদের জাতীয় গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

এই শ্রাবণ মাস তাঁহার স্বর্গারোহণ-মাস, জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রাবণ মাস আমাদের তর্পণ-মাস, তাই তাঁহার লোকান্তর-গমন-মাসে তাঁহার ঋণ-পরিশোধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র জীবন অনুধ্যান করিলে, মনে হয় যেন তিনি বিধাতার রাজদরবার হইতে বিপন্ন বাঙ্গালী জাতির ঋণ-পরিশোধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিজ চরিত্র, কার্য্য এবং বাক্যের দ্বারা বাঙ্গালীকে এই ঋণ-পরিশোধের মহাতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। অসংখ্য কর্ম্মঠ গণ্য মান্য ও পদস্থ ব্যক্তির বর্ত্তমান সুখ-সৌভাগ্য-সম্ভোগের সুবিধা সাধনের জন্য তিনি বঙ্গে বাঙ্গালীর পিতৃদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এমন লোক এখনও অনেকে জীবিত আছেন, যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন আজকার উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইতেন না। বাঙ্গালীর সে সেবা ও প্রতিপালনের তুলনায় তাঁহার নিজের ঋণ-পরিশোধ ও মধুসূদনের ঋণ-পরিশোধ তুচ্ছ কথা, এমন মহাপুরুষের বাসভবন অন্যের সম্পত্তি হইবে, আর আমরা দেশের লোক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পঙ্গুর ন্যায় কি বসিয়া দেখিব?

আজ বাঙ্গালা দেশে ঐশ্বর্য্যসম্পদ্‌সম্পন্ন কৃতী পুরুষের অভাব নাই। অনেকেই আছেন, কিন্তু স্বদেশের নানাবিধ হিতসাধনে উৎসর্গীকৃতজীবন মহৎ ব্যক্তির সংখ্যা করিতে গেলে তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বিরলসংখ্যক হৃদয়বান্ ও লোকসেবা-ব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণের পুরোভাগে আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ লোকবৎসল মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের কার্য্যকলাপ সর্ব্বাগ্রে স্মরণপথে উদিত হয়। বহুপদস্থ বন্ধু-পরিবেষ্টিত বিপন্ন মধুসূদন যেমন সকলকে ত্যাগ করিয়া বিপন্ন বিদ্যাসাগরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আমিও ঠিক সেইরূপ 'খানা ডোবা, বিল খাল, নদী নালা," ত্যাগ করিয়া বহুসদনুষ্ঠানে লিপ্ত সাগরসদৃশ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতেছি। আমার কাতর প্রার্থনা যদি তাঁহার কোমল হৃদয়ে চঞ্চলতার সৃষ্টি করিতে পারে, সে হৃদয়ে যদি একটা তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহা হইলে, এই বহুপুণ্যপূর্ণ সদনুষ্ঠান সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

আমার তাঁহার নিকট প্রার্থনা ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী। সে অনুষ্ঠানের যশোরাশি দীর্ঘ দীর্ঘ ভবিষ্যতে কীর্ত্তিত ও বন্দিত হইবে। আমার প্রার্থনা বা আব্দার এই যে তিনিই কর্ণধার হইয়া অর্থ-সংগ্রহে অগ্রসর

হইলে, চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ হওয়া কঠিন হইবে না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসভবনের বর্ত্তমান মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। সে অট্টালিকার ও উদ্যানের পুনঃসংস্কার-কার্য্যেও কিছু ব্যয় হইবে। এই জন্য মোট চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। মাননীয় মহারাজা বাহাদুর এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্‌যোগীদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইলেই, এ অনুষ্ঠান সহজেই সুসিদ্ধ হইবে। আশা করি, বিধাতার কৃপায় আমাদের প্রার্থনা অরণ্যরোদনে পরিণত হইবে না।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জমাল জমিল

শিখ রাজ্যের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, কারণ মহারাজা রণজিৎ সিংহ প্রকৃত পক্ষে পঞ্জাবের প্রথম ও শেষ শিখ রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর যে কয় জন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ক্ষমতাশালী ছিলেন না এবং কেহই দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করেন নাই। কিন্তু সেই সময় অপর কয়েক জন লোক নানাবিধ কৌশলে ক্ষমতাবান্ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারাও দীর্ঘকাল প্রতাপশালী হইতে পারে নাই; কারণ, এক জন পদস্থ হইলেই তাহার অনেক শত্রু হইত এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে হত্যা করিত। কিন্তু অর্থের ও ক্ষমতার এমনই প্রলোভন যে, এত আশঙ্কা থাকিলেও কেহ ভীত বা বিরত হইত না, প্রাণের ভয় না করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিত।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের আমলে লাহোরের প্রসিদ্ধ ফকীরবংশীয়গণ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। রণজিৎ সিংহ দেশের লোককে বা আত্মীয়-স্বজনকে বড় বিশ্বাস করিতেন না, বাহিরের লোক আনিয়া প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। বহুকাল নির্য্যাতন সহ্য করিয়া শিখেরা ঘোর মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি মহারাজা রণজিৎ সিংহ কয়েক জন মুসলমানকে কয়েকটী প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখনও হিন্দু রাজার মুসলমান মন্ত্রী ও মুসলমান রাজার হিন্দু মন্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ হয়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী হিন্দু ছিলেন; জয়পুরের মহারাজা নিষ্ঠাবান্ পরম হিন্দু; তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এখন একজন মুসলমান। যাঁহারা হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ লইয়া সর্ব্বদা জল্পনা করেন, তাঁহারা এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

ফকীর নূরউদ্দীনের অনুচরবর্গের মধ্যে জমাল ও জমিল দুই ভাই ছিল। তাহারা যমজ, দেখিতে অনেকটা এক রকম; কিন্তু প্রভেদ ছিল। জমাল, জমিলের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, অতএব সে বড়। জমালের মুখে একটা বড় আঁচিল, জমিলের তা ছিল না। জমাল মোটা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, জমিল কৃশ। কিন্তু দুই জনে বড় মনের মিল, আর দুই জনের প্রকৃতি এক রকম। দুই জনের চটকদার পোষাকও এক রকম। দুই জনই ধূর্ত্ত, ক্রূর,

সাহসী, লোভী। বয়স হইবে চব্বিশ পঁচিশ বৎসর। তবে জমালের অপেক্ষা জমিল অধিক চতুর; জমাল কোন সংশয়ে পড়িলে জমিলের পরামর্শ লইত। একটা ফন্দী জমিলের যত শীঘ্র যোগাইত, জমালের তত শীঘ্র যোগাইত না; জমিলের সাহস অদম্য, জমালের সকল সময় সাহস কুলাইয়া উঠিত না। অথচ কোন কর্ম্মে জমিল প্রকাশ্যে অগ্রণী হইত না, জমালকে আগে রাখিত; বড় ভাই বলিয়া তাহাকে সম্মান করিত। সেই জন্য দুই ভাইয়ের কথা উঠিলে লোকে বলিত 'বড়ে মিঞা তো বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা তো সুভানল্লা!'

২

জমাল বলিল, "সাওয়ল সিং আমাদের ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে।"

জমিল বলিল, "ভাই সাহেব, সে ত বড় আজব কথা। তাহাতে তাহার কি লাভ হইবে?"

"শুনিতেছি যে সে লছমী কওরের সঙ্গে গোপনে ষড় করিতেছে, যাহাতে ফকীর সাহেব মশীর মাল (খাজাঞ্চি) না থাকিতে পান। তাহা হইলেই ত আমাদের মুস্কিল!"

জমিল গোঁফ পাকাইয়া কহিল, 'এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

"রামদীন বলিয়াছে। লছমীর সঙ্গে তার আশ্‌নাই আছে জান ত?"

'হাঁ, সে নিজে তাহাই বলে। কথা সত্য কি না জানি না।"

"সত্য না হইলে বলিয়া তার কি লাভ? রাণী সাহেবা ত লছমীর হাতে, সে যাহা বলে তিনি তাহাই করেন।"

"সে কথা ঠিক। রামদীনের কথা সত্য কি না জানিতে হইবে। আর যদি লছমী কাহারও জন্য চেষ্টা করে ত রামদীনের জন্যই করিবে, সাওয়ল সিংহের জন্য কেন?"

"সাওয়ল সিং সদর তহশীলদার, তার একটা পদ আছে, রামদীনকে কে চেনে? সাওয়ল সিং নামে খাজাঞ্চি হইবে, কিন্তু রামদীন আর লছমীর হাতে সব ক্ষমতা থাকিবে।"

জমিল ভাবিতে লাগিল। মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর কাহারও পদের স্থিরতা ছিল না। ফকীর নূরউদ্দীনের যথেষ্ট সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি, কিন্তু শত্রুতে তাঁহার অনিষ্ট করিতে কত ক্ষণ? রাণী মীরা সাহেবা সর্ব্বেসর্ব্বা। লোকে মনে করিত লছমী তাঁহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে পারে। জমাল জমিল ফকীর সাহেবের বদৌলত যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের আশা ছিল যে তাহারা দরবারে বড় পদ পাইবে। ফকীর সাহেব পদচ্যুত হইলে, তাহাদের সকল আশা যায়। ভাবিয়া জমিল কহিল, "আসল কথা জানিয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।"

জমাল কহিল, "সে কাজ তোমাকে দিয়াই হইবে।"

৩

লছমী রাণী সাহেবার ঠিক দাসী বা পরিচারিকা ছিল না। নিজের বাড়ীতে থাকিত, রাণীর মহলে নিত্য যাতায়াত করিত। লছমী যুবতী, কিন্তু বিশেষ সুন্দরী নয়। তবে তাহার একটা আচ্‌কা শ্রী ছিল, আর

মুখের হাসি বড় মধুর ; তাহার উপর বড় বুদ্ধিমতী। লছমী কর্ত্তার ঘরে চাকর বাকর ছাড়া অন্য পুরুষ ছিল না। সে বিধবা, ইচ্ছা করিলেই সগাই করিতে পারিত ; কারণ জাতিতে জাট। জাটেদের মধ্যে সগাই ও চাদর ঢাকা দুই রকম সগাই আছে, কিন্তু লছমী সগাই করে নাই। রাণী তাহার বশীভূত জানিয়া লছমীর কাছে অনেক উমেদার ও অনুগ্রহপ্রার্থী আসিত। লছমী দরজার আড়াল হইতে তাহাদের সহিত কথা কহিত। কথা-বার্ত্তা রামদীনকে দিয়া হইত। লোকে বলিত রামদীন লছমীর জার, রামদীনও কথার ভাবে তাহা স্বীকার করিত।

অপরাহ্ন কালে মুক্ত বাতায়নের নিকট বসিয়া লছমী সূচ সূতা দিয়া ফুলকারির কাজ করিতেছিল। এমন সময় রামদীন সেই গৃহে প্রবেশ করিল। রামদীনের বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে, শরীর বলিষ্ঠ, মাঝারি গড়ন, দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু মুখ দেখিলে বিশেষ বুদ্ধিমান্ মনে হয় না। সে আসিয়া লছমীর নিকটে দাঁড়াইল। লছমী তাহাকে দেখিয়া, সূচ সূতা রাখিয়া, মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। তাহার হস্তের ও বক্ষের গঠন লাবণ্যপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। রামদীনের দিকে চাহিয়া সে কটাক্ষে প্রশ্ন করিল।

রামদীন ঘনাইয়া আর একটু কাছে আসিল, কিন্তু সহসা লছমীকে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। সে মনে করিত, লছমী তাহাকে ভালবাসে এবং লোকের কাছে সেই কথা বলিত ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে ভালবাসার কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। লছমীর বড় তেজ, হঠাৎ যদি রাগিয়া উঠে, তাহা হইলে রামদীনের বিপদ্। সে একবার এগাইত, আবার পিছাইত।

রামদীন কহিল, "সাওয়ল সিংহের সেই কথাটা বলিতে আসিয়াছিলাম।"

লছমী কহিল, "কি কথা ?"

"কেন, তোমাকে ত বলিয়াছি !"

লছমী মট্ মট্ করিয়া দুইটা আঙ্গুল মট্কাইল। অলস ভাবে কহিল, "কত লোকে আমাকে কত কথা বলে, সব কি আমার মনে থাকে ?"

রামদীন বুঝিল—লক্ষণ ভাল নয়। লছমী কখন কোন কথা ভুলে না, কিন্তু যখন ভুলিবার ভাণ করে, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়! রামদীন আর এক দিক্ দিয়া কথাটা পাড়িল।

"সাওয়ল সিং তোমার বিশেষ অনুগত।"

লছমী ভ্রূ তুলিল, "ওয়সা বহুত হয় !"

রামদীন কহিল, "সে ত সত্য কথা। তোমার মত ক্ষমতা কাহার আছে ? তবে একটা কথা তোমাকে বলি নাই। সাওয়ল সিং মন্ত্রীর মাল হইলে তোমাকে লক্ষ টাকা নজর দিবে।"

লছমী মুখে বলিল, "আমি কি টাকার কাঙ্গাল ?" কিন্তু লোভে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রামদীন বলিল, 'তোমার টাকার ভাবনা কি ? কিন্তু ফকীর নূরউদ্দীন তোমাকে গ্রাহ্য করে না, তোমার আশ্রিত একজন লোকের হাতে খাজানা থাকিলে ক্ষতি কি ?"

লছমী অল্প হাসিল, কহিল, "তা ত

বুঝিলাম, কিন্তু ইহাতে তোমার স্বার্থ কি ?”

“সাওয়ল সিং মশীর মাল হইলে আমি নায়েব খাজাঞ্চি হইব।”

“এইবার কথাটা স্পষ্ট হইল। তাহা হইলে আমার কাছে কে থাকিবে ? লোক জনের সহিত আমি কেমন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিব ?”

“আমি সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিব। খাজানা দেখিতে কতক্ষণ লাগিবে ?”

লছমী কওর বলিল, “তবে পাকা চাকরী এখানেই থাকিবে। দোসরা লোক বাহাল করিবার আবশ্যক নাই ?”

রামদীন হাত তুলিয়া কহিল, “আমি থাকিতে আর কাহারও প্রয়োজন কি ?”

লছমী রামদীনের দিকে চাহিয়া কুটিল হাসি হাসিল। কহিল, “সাওয়ল সিং ত লাখ টাকা নজর দিবে, তুমি কত দিবে ?”

“টাকা কি ছার ? আমি তোমার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত।” রামদীন সাহস করিয়া লছমীর হস্ত ধারণ করিল।

উচ্চ হাস্য করিয়া লছমী হাত সরাইয়া লইল। কহিল, “শুনিতে পাই তুমি বলিয়া বেড়াও যে তোমার সঙ্গে আমার আশনাই আছে। এখন কি কাজেও তাই করিবে না কি ?”

রামদীন লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। লছমীর দিকে না চাহিয়া কহিল, “মিথ্যা কথা। আমার কি এমন স্পর্দ্ধা যে তোমার দিকে নজর তুলিব। তুমি ইচ্ছা করিলে বড় বড় সর্দ্দারেরা তোমার পদানত হয়।”

লছমী উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘৃণাপূর্ব্বক কহিল, “সে কথা মনে রাখিও। গোলামের অবস্থা গোলামের মত থাকে, সে কখন মনিব হয় না।”

লছমী চলিয়া গেল। রামদীন লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে অস্থির হইয়া বাহিরে গেল।

লছমী কাজটা ভাল করিল না। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শত্রুসংখ্যা বাড়াইতে নাই।

৪

পাগড়ী মাথায় বুক ফুলাইয়া রামদীন ডব্বী বাজারে বেড়াইতেছিল, এমন সময় জমিলের সঙ্গে দেখা। জমিল ঝুঁকিয়া সেলাম করিল, “আদাব জনাব। মিজাজ তো অচ্ছা হয় ?”

রামদীন একটু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, “বন্দিগী, মেহেরবান। মিজাজ মোবারক ?”

দুই চারিটা কথা হইতে রামদীনের লছমীকৃত অপমানের কথা সহসা মনে পড়িয়া গেল। বলিল, “আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। কখন ফুরসৎ হবে ?”

জমিল কহিল, “আমি হাজির আছি। আমার গরিবখানা নিকটে। আমার সঙ্গে আসুন।”

বাজারের ভিতর দিয়া একটা গলি দিয়া জমিল রামদীনকে আপনার বাড়ী লইয়া গেল। দিব্য সাজান পরিষ্কার বাড়ী, ঘরে মসলিন পাতা, রামদীনকে খুব সমাদর করিয়া বসাইল। জমাল ও জমিল দুই জনে স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিত, একত্রে বাস করিত না। দুই জনের কেহই এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই।

জমিল কহিল, “আমার বড় খুশ নসীব

যে আমার বাড়ীতে আপনার কদম মোবারক আসিল।"

রামদীন কহিল "বলেন কি সাহেব। আমার ত পরম সৌভাগ্য। কোন দিন আশা করি আমার গরিবখানায় আপনি তশরীফ আনিবেন।"

জমিল কহিল, "আমি আপনার তাবেদার, যখন হুকুম করিবেন, তখনি হাজির হইব।"

কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর জমিল আসল কথা পাড়িল। কহিল, "লালাজি, আমাদের খোলাখুলি কথা হওয়া উচিত। গোপন করিলে কাহারও লাভ নাই।"

রামদীন এ কথায় সায় দিল, বলিল, "তা বটেই ত!"

"দেখুন, আমরা বরাবর জানি যে সর্দ্দার সাওয়ল সিংহ ও আপনি আমাদের দোস্ত, আমরা সব কাজ পরামর্শ করিয়া করিব। এখন যে আপনারা ফকীর সাহেবের বিরুদ্ধে কাররওয়াই করিতেছেন, সেটা কি ভাল হইতেছে?"

রামদীন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কহিল "এ কথা আপনাদিগকে কে বলিল?"

"সে কথায় কাজ কি? কথাটা সত্য আপনারা তাহা বেশ জানেন। ফকীর সাহেবের পদ যাইলে আমাদের রুটী মারা যায়। আপনাদের কোন অভাব নাই, তবে আমাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করিতেছেন কেন?"

"শেখ সাহেব, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন হইতে আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিব না। বরং আমরা আপনাদের সাহায্য চাই।"

"কি কাজে?"

"আপনারা মনে করেন যে লছমী কওর আমাদের পক্ষে ও আমাদের সহায়তা করিতেছে?"

"সে ত জানা কথা। লছমী কওরও আপনার হাতে।" জমিল চোক টিপিয়া একটু হাসিল।

রামদীন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আপনারা সে সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন মিথ্যা। আমারও ভুল হইয়াছিল। লছমীর বড় অহঙ্কার, আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না।"

"বলেন কি, লালাজি, এ কথা ত সহজে বিশ্বাস হয় না। আপনার মত তাহার খয়েরখাঁ কে আছে?"

"সে কিছু পরোয়া করে না, আমাকে চাকরের চেয়ে অধম মনে করে। এই সে দিন আমাকে অত্যন্ত অপমান করেছিল।"

"আপনাকে? এ ত বড় অসম্ভব কথা!"

"আমি কি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি? সে অপমান আমি কখন ভুলিব না, নিশ্চয় তাহার প্রতিশোধ লইব।"

"অলবৎ, আপনি কি একটা যে সে লোক!"

"আমি ভাবিতেছি তাহাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিব। তখন সে বুঝিতে পারিবে আমি কে।"

"এই ত কথার মত কথা! যদি আমাকে দিয়া কিছু হয় ত আমি সব সময় হাজির আছি।"

"আপনার মত ত অবশ্য চাই। কিন্তু এ কথা প্রকাশ হইলে আমাদের দু'জনেরই

বিপদ্। রাণী সাহেবা লছমীর উপর বড় মেহেরবান।"

"তোবা! আপনি আমাকে মনে করিয়াছেন কি? আমাকে দিয়া কোন কথা প্রকাশ হইতেই পারে না।"

"লছমীকে জব্দ করিলে সে আমাদের শত্রু হইবে। এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে সে আমাদের কোন অপকার না করিতে পারে। যাহাতে রাণী সাহেবা তাহার উপর নারাজ হইয়া যান, এমন কোন কৌশল করিতে হইবে।"

'কেয়া বাৎ লালাজি, এই ত বুদ্ধির কথা! আপনার মত বুদ্ধিমান্ কয়জন আছে?"

রামদীন খুসী হইয়া সগর্ব্বে গোঁফে চাড়া দিতে লাগিল। জমিল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কিছু হিকমৎ বাহির করিয়াছেন?"

"না, তাই ভাবিতেছি। আপনিও খুব হুসিয়ার লোক, আপনার মাথায় কিছু খেলিতেছে?"

জমিল স্বর নীচু করিয়া, রামদীনের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কয়েকটা কথা বলিল। শুনিয়া রামদীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জমিলের পিঠ চাপড়াইতে লাগিল। "কেয়া খুব, শেখ সাহেব, এ হিকমৎ বহুত আচ্ছা! কেমন করিয়া বন্দোবস্ত করিবেন?"

জমিল কহিল, "এখনি গিয়া তাহার উপায় করিতেছি। বন্দোবস্ত করিয়া আপনাকে জানাইব।"

জমিল উঠিলে রামদীন তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে খুব খাতির করিয়া বিদায় দিল।

৫

লাহোরের কেল্লায় শীশ মহলে রাণী জীন্দা সাহেবা বাস করিতেন। শীশ মহলের এখন জীর্ণাবস্থা, তখন খুব সৌষ্ঠব ছিল। শীশ মহলের ছাদে উঠিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। মহলের ভিতর হমাম, তয়খানা, নদী দেখিবার ঝরোখা। প্রবেশ করিবার দুই পথ; এক সদর ফটক দিয়া, আর এক নদীর দিক্ দিয়া। সদরে সান্ত্রীর পাহারা। নদীর দিকে দরজায়ও সিপাহী থাকিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা সচরাচর রাণীর কাছে যাইত, তাহারা এই পথে যাইত। সিপাহীদের সঙ্গে এক জন খোজা থাকিত, সে পাল্কীর ভিতর দেখিয়া লইত। পরিচিত স্ত্রীলোক হইলে পাল্কী মহলে প্রবেশ করিত, নহিলে খবর দিতে হইত। দাসীরাও পাল্কীতে যাতায়াত করিত। কেল্লায় প্রবেশ করিলে চারিদিকে পরিখা। পুল পার হইয়া অনেক ঘুরিয়া মহলের প্রবেশদ্বার। সেই দ্বারের পাশে সুসজ্জিত গৃহে খোজাদের সর্দ্দার ফকীরা বসিয়া থাকিত। ফকীরার প্রবল প্রতাপ। রাণীর কাছে তাহার পথ অবারিত, পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া রাণী সাহেবা অনেক সময় তাহার কথা শুনিতেন। সকল বিষয়ে সে তাঁহার পরামর্শদাতা। রাণীর কাছে কোন আরজি করিতে হইলে, প্রথমে ফকীরার শরণাগত হইতে হইত। ফকীরা যখন ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তায় চলিত, তখন পথের দুই পাশে লোকে তাহাকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিত। ফকীরা দেখিতে নপুংসকের মত কুৎসিত নয়। গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মুখে গুম্ফ শ্মশ্রু না থাকিলেও মুখের ভাব প্রসন্ন গম্ভীর, কুটিলতার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই।

কেল্লার বাহিরেই ফকীরার নিজের বাড়ী। রাত্রি দশটার সময় সে মহল হইতে বাহির

হইয়া বাড়ী যাইত। রাত্রে কোন সময় ডাক পড়িলে তৎক্ষণাৎ আবার আসিত।

এক রাত্রে ফকীরা বাড়ীতে আসিয়া দেখে জমিল বসিয়া আছে। কহিল, "সেলাম শেখ সাহেব, এত রাত্রে এত তকলিফ করিলেন কেন?"

জমিল কহিল, "সে কি কথা, উজীর সাহেব! আপনার দর্শন পাওয়া ত আমাদের সৌভাগ্য। আমি আপনার কাছে জরুরি কাজে আসিয়াছি "

ফকীরা বসিয়া বলিল, কি বলুন?"

"আপনার কাছে কোন কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, বলিলেও কোন ফল নাই। ফকীর নূরউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হইতেছে, যাহাতে তাহা সফল না হয়, সেই জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি।"

"ফকীর সাহেব ত বড় অশরাফ লোক, তাঁহার শত্রু কেন?"

"ভাল লোকেরই ত আজকাল জিয়াদা মুস্কিল, কারণ তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না।"

"কে ফকীর সাহেবের শত্রুতা করিতেছে?"

"সাওয়ন সিং ফকীর সাহেবের পদ চায়। লছমী কওর তাহার সহায়তা করিতেছে।"

"কেন?"

"সাওয়ন সিং তাহাকে লক্ষ মুদ্রা নজর দিবে।'

"বটে? রাণী সাহেবা লছমীর মেহেরবান, কিন্তু তাহার কথায় কি তিনি এমন অন্যায় কর্ম্ম করিবেন?"

"কি জানি! অওরতের কথা কিছু বলা যায় না।"

"সত্য কথা। যাহাতে ফকীর সাহেবের অনিষ্ট না হয়, আমি সে চেষ্টা করিব, কিন্তু লছমীকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় নাই?'

"আমরা সে চেষ্টাও করিতেছি। আপনার কথায় বড় আশ্বস্ত হইলাম।" আর কিছুক্ষণ কথোপকথন করিয়া জমিল উঠিয়া গেল।

নিশীথের অন্ধকারে রাবী তর তর রবে বহিয়া যাইতেছিল। তীরে গাছতলায় বসিয়া এক জন ফকীর গান করিতেছিল,—

কইসে বেড়া হোওয়ে পার।
পনিয়া গ'হিরী লইয়া মেরি পুরাণী,
মওলা করে পার!

আকাশে চাহিয়া জমিল দেখিল, মাথার উপর চঞ্চলরশ্মি নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে। নৈশ পবন সর্ব্বত্র সমীরিত, বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতেছে। মানুষের কূট বুদ্ধিতেই কি সব হয়, মানুষের উপর কেহ নাই?

৬

আনারকলি বাজারে আলিজান নামে এক প্রসিদ্ধা গায়িকা বাস করিত। আলিজান প্রবীণা, দেখিতেও তেমন সুন্দরী নয়। নাচ মোজরায় সে বড় একটা যাইত না। প্রথম বয়সে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইদানীং সে বাইজীর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহার বাড়ীতে কখন কখন মোজরা হইত, সেখানে বাছা বাছা লোক উপস্থিত থাকিত। আলিজান বুদ্ধিমতী; তাহার চরিত্রও সাধারণ বাইজীদের মত নয়, সেরূপ ধরণ-ধারণও ছিল না।

একদিন সন্ধ্যার পর ভৃত্য আসিয়া আলিজানকে খবর দিল, "শেখ জমিল সাহেব আপনার সহিত মুলাকাত করিতে আসিয়াছেন।"

আলিজান কহিল, "তাঁহাকে ডাকিয়া আন।"

জমিল আসিয়া আলিজানকে সম্ভাষণ করিল, "সেলাম ওয়ালেকুম !"

"ওয়ালেকুম সেলাম ! শেখ সাহেবের বড় মেহেরবানি। বসুন "

জমিল উপক্রমণিকার বাহুল্য না করিয়া কহিল, "আমি তোমার কাছে নিজের গরজে আসিয়াছি। ইচ্ছা করিলে তুমি ফকীর নূর-উদ্দীন সাহেবের বিশেষ উপকার করিতে পার।"

"ফকীর সাহেব সাধুপুরুষ ও পদস্থ ব্যক্তি। আমার মত লোককে দিয়া তাঁহার কি উপকার হইতে পারে ?"

"লছমী কওর রাণী সাহেবাকে বলিয়া তাঁহার পদে সাওয়ল সিংহকে নিযুক্ত করাইবার চেষ্টায় আছে। ফকীর সাহেব পদচ্যুত হইলে আমরা নিরুপায় হইব।"

"রাণী সাহেবার মহলে লছমীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি। আমি এ বিষয়ে কি করিতে পারি ?"

"ফকীরা আমাদের পক্ষে, সে আমাদের সাহায্য করিতেছে। রাণী সাহেবা যাহাতে লছমীর প্রতি নারাজ হন, সেই উপায় করিতে হইবে।"

"কেমন করিয়া ?"

"তোমাকে বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। তোমার পাশের বাড়ী কাহার ?"

"আমার বাড়ী। উহাতে আমার সম্পর্কে এক বহিন থাকে।"

"ঐ বাড়ীটা কিছুদিনের জন্য আমার চাই।"

"কি হইবে ?"

জমিল অনুচ্চস্বরে আলিজানকে কয়েকটা কথা বলিল। শুনিয়া আলিজান হাসিতে লাগিল। কহিল, "শেখ সাহেব, আপনার যেমন বুদ্ধি, তাহাতে সময়ে আপনি এই রেয়াসতে উচ্চপদ লাভ করিবেন। আমি হুকুম তামিল করিতে প্রস্তুত, কিন্তু দেখিবেন শেষে যেন আমার গরদন না যায়।"

"তোমার কোন আশঙ্কা নাই। আমরা যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেছি, তাহাতে আশা আছে যে আমাদের কাহারও কোন বিপদ্ হইবে না।"

"বহুত খুব। বাড়ী আপনার কবে চাই ?"

"যত শীঘ্র সুবিধা হয়।"

"আমার বহিনকে কালই গাঁয়ে পাঠাইয়া দিব। বাড়ী কাল হইতেই আপনার হাতে রহিল।"

জমিল অনেক ধন্যবাদ দিয়া, সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

৭

অপরাহ্নকালে শীশ মহলে রাণী মীরা বসিয়াছিলেন। সম্মুখে লছমী কওর বসিয়াছিল। ঘর খিলান করা, উপরে কড়িকাঠ ছিল না। ঘরের উপরে দেখিতে গুম্বজের মত, তাহাতে অসংখ্য ছোট ছোট পারামাখা কাচ বসান। সায়ং-সূর্য্যকিরণ গবাক্ষ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সহস্র কিরণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

মীরা প্রৌঢ়া, বিধবা, বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গ স্থূল, মুখ সুশ্রী, মুখের ভাব গম্ভীর। লছমীকে ভাল বাসিতেন বলিয়া সে তাঁহার কাছে একটু আধটু আবদার করিত।

লছমী বলিল, "আমার আরজীর কি হইল ?"

রাণী কহিলেন, "এ রকম মামলা এক কথায় হয় না। ফকীর নূরউদ্দিন পুরাতন বিশ্বাসী লোক, বংশক্রমে রেয়াসতে কাজ করিয়া আসিতেছে, বিনা অপরাধে তাহাকে বিদায় করিয়া তাহার স্থানে আর একজন লোক বাহাল করিলে অনেক কথা উঠিবে।"

"আপনি মল্কা, আপনার উপর আবার কথা কি !"

"সেই জন্যই আমাকে অনেক দিক্ ভাবিতে হয়।"

লছমী মুখ ভার করিয়া কহিল, "তবে কি আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল ?"

"আমি তাহা ত বলি নাই, তবে আমাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ফকীর সাহেবের বিরুদ্ধে তুমি কিছু শুনিয়াছ ?"

"রাণী সাহেবা, মুসলমানেরা ত সকলেই আপনার বিপক্ষে, তাহাদের উপর বিশ্বাস কি ?"

"ফকির নূরউদ্দিন নিমকহারাম নন। তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলে মুসলমান-শত্রু বাড়িবে।"

"মুসলমানের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। খালসার বিরুদ্ধে তাহারা কি করিবে ?"

এমন সময় কেল্লার সদর দরজায় ডঙ্কা বাজিল। মীরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "আজ অমাবস্যা, রাবীতে স্নান করিতে যাইব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে ?"

"যেমন হুকুম হয়।"

রাণী সাহেবা যখন বাহিরে যাইতেন, তখন কেল্লার সিংহদ্বারে ও সহরের সকল চৌমাথায় ডঙ্কা বাজিত। অমনি যে পথে রাণীর যাইবার কথা, সে পথ পরিষ্কার হইয়া যাইত ; পথে বড় একটা লোক থাকিত না। রাণীর শিবিকা কিন্খাবের ঘেরাটোপ দিয়া মোড়া, আগে অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত, পশ্চাতে পরিচারিকা-দিগের পাল্কী, তাহার পিছনে সৈন্য। ফকীরা অশ্বারোহণে রাণী সাহেবার পাল্কীর পাশে থাকিত।

শীশ মহলে যাইবার সময় লছমী রাম-দীনকে দিয়া পাল্কী ডাকাইয়াছিল। পাল্কীর বেহারারা যে নূতন, পাল্কীতে উঠিবার সময় লছমী তাহা লক্ষ্য করে নাই।

কেল্লা হইতে যখন রাণী সাহেবার পাল্কী বাহির হইল, তখন লছমীর শিবিকা রাণীর পাল্কীর ঠিক পশ্চাতে। নদীতীরে রাণীর স্নানের স্বতন্ত্র স্থান ছিল, চারিদিকে কানাত দিয়া ঘেরা। স্নানাদি সমাপন করিয়া মীরা আবার পাল্কীতে উঠিলেন।

বাজারের ভিতর দিয়া ফিরিবার সময় এক স্থানে পথ সঙ্কীর্ণ। পথের পাশ দিয়া কয়েকটা গলি।

সহসা যে সকল সৈন্যেরা রাণী সাহেবার শিবিকার অগ্রে যাইতেছিল, তাহাদের সম্মুখে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হইল। তোপের আওয়াজ হইলে যেমন শব্দ হয়, প্রায় সেইরূপ শব্দ। মাটী কাঁপিয়া উঠিল, অশ্বসমূহ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, পথে লোক ছুটিয়া আসিল, পশ্চাতে যে সকল সৈনিক ছিল কি হইয়াছে জানিবার জন্য ধাবিত হইল। কেবল ফকীরা অশ্বপৃষ্ঠে রাণীর শিবিকার পাশে অবিচলিত রহিল।

গলির ভিতর একজন লোক প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়াছিল। গোলমালে যখন লোকেরা

শঙ্কিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, সেই সময় সে অগ্রসর হইয়া লছমীর পাল্কীর বাহক-দিগকে সঙ্কেত করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ পাল্কী লইয়া সেই গলিতে প্রবেশ করিল। আর কেহ ততটা দেখিল না, কিন্তু ফকীরার সকল দিকে নজর ছিল। সে চিনিল যে, যে ব্যক্তি বাহকদিগকে সঙ্কেত করিল সে আর কেহ নহে, রামদীন। ফকীরা একজন খোজাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া, অশ্বের স্কন্ধের পাশে মস্তক অবনত করিয়া, চুপিচুপি কি আদেশ করিল। আদেশ মত সে অলক্ষিতে লছমীর শিবিকার অনুগামী হইল।

কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই জানিয়া ফকীরা রাণীর শিবিকাবাহকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। সৈন্যেরা রাণীর পাল্কী ঘিরিয়া চলিল। সে স্থানে পাহারা বসিল ও সহরকোতওয়াল আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিলেন।

৮

গলিতে প্রবেশ করিয়া লছমীর পাল্কী চলিয়া যাইতেছে, আগে আগে রামদীন। এমন সময় একজন আসিয়া রামদীনের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "এ সওয়ারি কোথায় যাইবে?"

রামদীন রাগিয়া বলিল, "সে খোঁজে তোমার কাজ কি? কে তুমি?"

সেই সময় আর এক ব্যক্তি আসিয়া, যে রামদীনের পথ রোধ করিয়াছিল তাহার পৃষ্ঠে হস্ত অর্পণ করিল। সে ফিরিয়া, বিস্মিত হইয়া কহিল, "জমিল!"

"জমাল!"

জমিল কহিল, "তুমি এখনি একটা গোল বাধাইবে। পথ ছাড়িয়া দাও।"

জমাল কহিল "কি হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

জমিল বিরক্ত হইয়া কহিল, "যেমন তোমার শরীর তেমনি তোমার বুদ্ধি! আমার সঙ্গে আইস, বলিতেছি।"

জমিল জমালের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল। শিবিকা রামদীনের প্রদর্শিত পথে চলিয়া গেল।

বাহকেরা শিবিকা লইয়া একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। শিবিকা প্রাঙ্গণে রাখিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল। রামদীনও তাহা-দের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া, বাহির হইতে সদর দরজার শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

শিবিকা ঘেরাটোপে ঢাকা ছিল, বাহিরে কি হইতেছিল লছমী জানিতে পায় নাই। কেল্লার ভিতর মহলে পাল্কী আসিয়াছে মনে করিয়া, পাল্কীর দরজা খুলিয়া, ঘেরাটোপ তুলিয়া লছমী দেখিল অপরিচিত বাড়ী কেহ কোথাও নাই। তখন ভীত হইয়া লছমী পাল্কীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল। লছমীকে দেখিয়া, সেলাম করিয়া বলিল, "আসুন, বিবিসাহেব, ভিতরে আসুন।"

লছমী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার বাড়ী?"

দাসীও বিস্মিতা হইয়া কহিল, "কেন, আপনার বাড়ী, আবার কাহার বাড়ী হইবে?"

"কেন, আমার কি বাড়ী নাই যে আমি পরের বাড়ীতে আসিব ?"

দাসী আরও বিস্মিত হইল, কহিল, "আপনি কি বলিতেছেন ? এ বাড়ী আপনার জন্য ভাড়া করা হইয়াছে, আমি আপনার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি। আপনি বিস্মিত হইতেছেন কেন ?"

লছমী বুঝিল, ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে, ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে কোন ফল নাই। স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এ বাড়ী ভাড়া করিয়াছে ?"

"আমি তাঁহার নাম জানি না। দেখিতে বিদেশী লোকের মত, আমাকে নিযুক্ত করিয়া জিনিসপত্র আনিয়া দিয়াছেন।"

"কাহার জন্য বাড়ী ভাড়া হইয়াছে ?"

"আপনার জন্য। আপনার নাম কি লছমী কওর নয় ?"

লছমী দেখিল ভিতরে কোন গভীর অভিসন্ধি আছে, এই দাসী তাহার কিছু জানে না। এমন স্থলে ভয় পাওয়া নির্ব্বোধের কাজ।

লছমী কহিল, "তবে আমারই ভুল হইয়া থাকিবে। বাহিরের দরজা খোল।"

দাসী দরজা টানিয়া দেখিল বাহির হইতে বন্ধ। ফিরিয়া লছমীকে কহিল, "যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় আসিয়া এখনি খুলিয়া দিবেন।"

আর কোন কথা না কহিয়া লছমী বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সকল ঘর দেখিয়া ছাদে উঠিল। ছাদের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। আপাততঃ এই গৃহে লছমী বন্দিনী।

কাহার এ কাজ ? লছমী ভাবিতে বসিল।

সন্ধ্যা হইলে দাসী ঘরে আলো জ্বালিল। সেই সময় সদর দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল। তাহার পর বাড়ীর ভিতরে গিয়া যে ঘরে লছমী বসিয়াছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লছমী সরিয়া দরজার আড়ালে গেল। আড়াল হইতে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।

তাহার বেশ মুসলমানের মত। লম্বা দাড়ী, চক্ষে সুরমা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা, চাপকানের উপর কাবা, পায়ে রাওয়ালপিণ্ডীর জুতা। কহিল, "বিবি সাহেব, তসলীম !"

লছমী তাহার সম্মুখে না আসিয়া, দরজার পাশ হইতে কহিল, "আমার উপর এ অত্যাচার কেন ? আমি কে, জান ?"

"আপনি লছমী কওর, রাণী সাহেবার বিশেষ অনুগৃহীতা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পাবেন।"

"আমি কে জানিয়াও আমার উপর এ জুলুম কেন ? রাণী সাহেবা জানিতে পারিলে তোমার মাথা থাকিবে ?"

"আমার আশা আছে যে তাহার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার নিকা হইয়া যাইবে। কাল সকাল বেলা কাজি ও সাক্ষী ডাকিব। তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।"

"তুমি কে ?"

"আমি শেখ নিজামুদ্দীন, অটারীর জমিদার।"

লছমী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "তুমি শেখ রামদীন, আমার নিমকহারাম জাতিভ্রষ্ট গোলাম !"

রামদীন থ হইয়া গেল। কিছু পরে ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমি সত্য সত্যই মুসলমান হই নাই। তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া অপমান করিয়াছিলে, মনে পড়ে? আমি সে কথা ভুলিয়া যাইব কিন্তু তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। তুমি আমাকে আনন্দ মনে বিবাহ কর, আমি সমস্ত আয়োজন করিয়াছি।"

"কবে বিবাহ হইবে?"

"তুমি যবে বল। আজই রাত্রে হইতে পারে।"

লছমী মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি এই ছিলে শেখ, তাহার পর সৈয়দ হবার কথা, তাহা না হইয়া হইতে চাও শিখ। তোমার কেশ ও হাতের কড়া কোথায়?"

রামদীন লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। কহিল, "আমাকে বিদ্রূপ করিয়া তোমার কি কোন লাভ হইবে?"

"আমি ভাবিতেছি, তুমি যে আমার খসম হইবে আমি এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি।"

রামদীন রাগিয়া উঠিল। "এখন তুমি আমার হাতে পড়িয়াছ তুমি রাজি না হও আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিব।"

লছমী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে রামদীনকে দেখিতেছিল। ধীরে ধীরে কহিল, "এই কাজে তোমার পিছনে কে আছে বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয় ফকীর নুরউদ্দীনের লোক হইবে। তোমার ঘটে এত বুদ্ধি নাই।"

কোথায় লছমী ভয় পাইয়া রামদীনের শরণাপন্ন হইবে, না তাহাকে এইরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল। রামদীন কহিল, "তুমি মনে কর আমার নিজের কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই। তোমার বুদ্ধির কত দৌড় এই বার দেখা যাইবে।"

লছমী কহিল, "তোমার যদি বুদ্ধিই থাকিবে ত আমার সঙ্গে এমন নিমকহারামি করিবে কেন? আমি যাহাই করিয়া থাকি, তোমার ত কোন অনিষ্ট করি নাই?"

লছমী ভিতরের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। রামদীন রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া কুলুপ দিয়া গেল।

৯

শীশ মহলে উপনীত হইয়া রাণী ফকীরাকে ডাকাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথে কি হইয়াছিল?"

ফকীরা কহিল, "বোধ হয় কোন দুষ্ট বালক আতসবাজি ছুড়িয়াছিল। কোতওয়াল তদারক করিতেছেন।"

লছমীকে দেখিতে না পাইয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "লছমী কোথায় গেল?"

একজন পরিচারিকা কহিল, "হয় ত বাড়ী গিয়া থাকিবে।"

ফকীরা কহিল, "বাড়ী গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তাহার পাল্কী হীরা-মণ্ডির একটা গলিতে গেল। তাহার বাড়ী সে দিকে নয়।"

"কোথায় গিয়াছে, জান?"

"না। জানিবার জন্য আমি এক জন খোজাকে পাঠাইয়াছি।"

"সংবাদ পাইলে আমাকে জানাইও।"

"যো হুকুম," বলিয়া ফকীরা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাণী নিভৃতে বসিয়াছিলেন,

ফকীরা আসিয়া সেলাম করিল। রাণী কহিলেন, 'কি সংবাদ ?"

ফকীরা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সংবাদ বড় বিস্ময়জনক।"

"কি রকম ?"

"লছমী পাল্কী করিয়া হীরামণ্ডি দিয়া বরাবর আনারকলি চলিয়া গিয়াছে। সেখানে একজন মুসলমানের বাড়ীতে গিয়াছে পাল্কী সেই বাড়ীতেই আছে। পাড়াও ভাল নয়।"

ক্রোধে রাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "মিথ্যা কথা !"

ফকীরা হাত জোড় করিয়া, মাথা নোয়াইয়া কহিল, "যে খোজাকে পাঠাইয়াছিলাম সে এই কথা বলিতেছে।"

"তুমি নিজে গিয়া জানিয়া আইস।"

ফকীরা ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, পিছু হটিয়া, ঘরের বাহিরে গেল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফকীরা ফিরিয়া আসিল। রাণী সেই স্থানে, সেই ভাবে বসিয়া ছিলেন, ফকীরার প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করিলেন।

ফকীরা বলিল, "খোজার কথা সত্য।"

রাণীর চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইল। কঠোর স্বরে কহিলেন, "তাহাকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দাও।"

"কেন ?"

"তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব।"

"সে কি অপরাধ করিয়াছে ?"

"আমার অপমান করিয়াছে। যাহার এমন স্বভাব সে কোন্ সাহসে আমার মহলে আসে ?"

ফকীরা যুক্ত করে কহিল, "লছমী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার মত কোন অপরাধ করে নাই। আপনি তাহাকে মহল হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ্য রূপে কোন শাস্তি দিলে লোকে আপনার নামে নানা কথা রটাইতে পারে।"

রাণী ভাবিয়া কহিলেন, "তবে কি করা কর্ত্তব্য ?"

"তাহাকে মহলে প্রবেশ করিতে না দিলেই তাহার যথেষ্ট শাস্তি হইবে।"

"সেই কথা ভাল। সেই রূপ আদেশ দাও।"

"তাহাই হইবে," বলিয়া রাণীকে অভিবাদন করিয়া ফকীরা চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে যখন জমিল ফকীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন ফকীরা তাহাকে বলিল, 'সেখ সাহেব, মোবারক! তোমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।"

"কি হইয়াছে ?"

"লছমীর মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে তোমাদের আর কোন আশঙ্কা নাই।"

জমিল সকল কথা শুনিয়া, ফকীরার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

১০

প্রভাতে উঠিয়া লছমী দেখিল বাড়ীর সদর দরজা মুক্ত, বাড়ীতে কেহ কোথাও নাই, দাসীও চলিয়া গিয়াছে। পাল্কীর কাছে চার জন বাহক দাঁড়াইয়া আছে।

লছমীর সংশয় হইল যে হয় ত কোন নূতন বিপদ্ উপস্থিত। ভাল করিয়া দেখিল, বেহারারা তাহার পরিচিত। তাহাদিগকে

ডাকিয়া কহিল, "তোরা কাল আমাকে এ বাড়ীতে আনিয়াছিলি কেন ?"

তাহারা এক বাক্যে বলিল, "আমরা কেন আনিব ? কাল ত আমরা পাল্কী লইয়া যাই নাই।"

"আজ কেমন করিয়া আসিলি ?"

"এক জন লোক বলিয়া দিল "

"কে সে ?"

"তা জানি না।"

পাল্কীতে উঠিয়া লছমী নিজের বাড়ী গেল। আহারাদি করিয়া মধ্যাহ্নের পর শীশ মহলে গমন করিল। দস্তুরমত প্রহরী ফটকে পাল্কীর পথ রোধ করিল, 'কিস্‌কি সওয়ারি ?"

"লছমী কঞর কি।"

প্রহরী খোজাকে ডাকিল। সে পাল্কীর পরদা তুলিয়া লছমীকে দেখিল। বলিল, "মহলে যাইবার হুকুম নাই।"

লছমী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু লোহিত বর্ণ করিয়া কহিল, "কি ! আমি কে জানিস্ ?"

খোজা কহিল, "তা আর জানি না, তোমাকে নিত্য দেখিতেছি ?"

"তবে আমার পাল্কী আট্‌কাস্ কোন্ সাহসে ?"

"তেউড়ীর হুকুম।"

লছমী কহিল, "ফকীরা সর্দ্দার কোথায় ?"

"আপনার ঘরে।"

'তাহাকে ডাক।"

"রাণী সাহেবা ছাড়া তাঁহাকে আর কেহ ডাকিতে পারে না।"

"বল, একবার আমি দেখা করিতে চাই।"

খোজা চলিয়া গেল। একটু পরে ফকীরা পাল্কীর কাছে আসিয়া পরদা তুলিল। খোজা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাগ সম্বরণ করিয়া লছমী কহিল. 'আমার এ অপমান কেন ? আমি কি করিয়াছি ?"

"নিজে বুঝিয়া দেখ।"

"আমি ত কিছুই করি নাই।"

"তোমাকে রাণী সাহেবা অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু দরবারের অহল্‌কারেরা অন্দর মহলের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। সে বিষয়ে তুমি কেন হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছিলে ?"

"সে কথা রাণী সাহেবা আমাকে বলিলেই ত আমি নিরস্ত হইতাম।"

"সে কথা যাক্। কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে ?"

লছমী মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া শপথ করিল। "আমার সহিত কেহ শত্রুতা করিয়া আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল। আমাকে যে শপথ করিতে বল আমি করিতেছি, কেহ আমাব অঙ্গস্পর্শ করে নাই।"

"সে কথা তুমি জান আর তোমার ধর্ম্ম জানে। আমরা কোন কৈফিয়ৎ চাহি না।" বাহকদিগকে আদেশ করিল, "সওয়ারি ফিরাইয়া লইয়া যাও।"

লছমী কাঁদিতে লাগিল, "একবার রাণী সাহেবার কাছে যাইতে দাও, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি।"

"হুকুম নাই," বলিয়া গম্ভীর পদ ক্ষেপে ফকীরা চলিয়া গেল। লছমী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। শীশ মহলে প্রবেশ আর তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না।

১১

জমাল জলিম দুই ভাই একত্রে বসিয়া ছিল। জমিলের বুদ্ধি-কৌশল দেখিয়া জমাল এখন তাহাকে সমীহা করিত, জমিল মুখে জমালের সম্মান করিত, কিন্তু এখন তাহার কথাতেই সব হইত।

রামদীন আসিয়া সেলাম করিয়া একটু দূরে বসিল। জমিল অল্প মাথা নাড়িয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাকে সেলাম করিল।

রামদীন দুই একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কহিল, "আমার প্রতি কি হুকুম হয়?"

জমিল কহিল, "কি বিষয়ে?"

"একটা ভাল কর্ম্ম-কাজের?"

"কেন?"

"আমি আপনাদের উপকার করিয়াছি। আমি আপনাদের পক্ষে না থাকিলে ফকীর সাহেবের কর্ম্ম লইয়া গোল বাধিত।"

"তোমার প্রধান উদ্দেশ্য লছমীর অপকার করা। তাহার নিমক খাইয়া নিমকহারামি করিয়াছ, সে তোমাকে বিশ্বাস করিত, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ। তাহারই পুরস্কার চাও?"

রামদীনের চক্ষু বাহির হইল, মুখ খুলিয়া গেল। "এ কি রকম কথা?"

"এই ত ঠিক কথা! তুমি লছমীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, দুই দিন পরে যে আমাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবে না, তাহাই বা কে জানে? তুমি কিছু টাকা চাও লইয়া যাও, কিন্তু কাজ-কর্ম্ম পাইবে না।"

"লছমীর কাছে যাইলে সে বাড়ী ঢুকিতে দেয় না, আপনারা এই রকম বলিতেছেন। তবে আমি যাই কোথা?"

"যেখানে নিমকহারামেরা যায়—দোজখে।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(৩)

পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষাকেই মিরিয়েল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁর মত এমন প্রাণস্পর্শী সহানুভূতি বুঝি আর কেহ দিতে পারিত না। তাঁর নীরব সহানুভূতিটুকু ব্যথিতের প্রাণে একটা যথার্থ সান্ত্বনার প্রলেপ দান করিত। বাজে বাঁধিগতের কথা তিনি কহিতেন না, শোককে ভুলিতেও তিনি কখনো বলিতেন না। তিনি জানিতেন, নিরাশ শোকই বড় তীব্র, তাই শোকার্ত্তের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া, শোককে তিনি বরং মহিমামণ্ডিত করিয়াই তুলিতেন। তিনি বলিতেন—"ব্যর্থ শোকে মৃতের স্মৃতিকে দীন কোরো না। যা হতে পারত, মৃত্যুর

জন্য যা ঘট্‌ল না—তার কথা ভেবো না। মনের মধ্যে আশা আন, বিশ্বাস রাখ, স্থির-ভাবে সম্মুখদিকে চেয়ে দেখ—মরণের পর-তীরে, স্বর্গলোকে, প্রিয়তমের মহিমা-সমুজ্জ্বল ছবিখানি দেখতে পাবে।"

জনসাধারণের উপর মিরিয়েলের প্রভাব কতখানি বিস্তৃত ছিল, একটা সামান্য ঘটনা দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এক সময় পরিদর্শন-কার্য্য উপলক্ষে, দুর্গম পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া তাঁহাকে কোন এক স্থানে যাইতে হয়। সে সময় সে অঞ্চলে ক্রাভাট নামক এক দুর্দ্দান্ত দস্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল। সঙ্গে রক্ষী লইয়াও সে প্রদেশে গমনাগমন তখন নিরাপদ্‌ ছিল না। মিরিয়েল, সকলের নিষেধ অনুজ্ঞা অনুনয় উপেক্ষা করিয়া, নিঃসঙ্গ সেই পথে যাত্রা করিলেন, বলিলেন—'বহুদিন সেখানে যাইনি, আমি না গেলে ভগবানের নাম-গান আর তাদের কে শুনাবে?"

"আপনার সবই যে তারা লুট নেবে।"

"লুটে নেবার মত ত আমার কিছুই নেই।"

"আর যদি তারা আপনাকে হত্যা করে?"

"আমাকে? আমার মত সামান্য এক জন ধর্ম্মযাজককে হত্যা করে তাদের লাভ?"

"আপনি বিপদ্‌ বুঝ্‌ছেন না। পথে যদি আপনাকে তারা আটকায়?—"

"ভালই ত।—দরিদ্রদের জন্য ভিক্ষা চেয়ে নেবো।"

যথাসময়ে নিরাপদে মিরিয়েল গন্তব্য-স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রত্যা-বর্ত্তনের দু'একদিন পূর্ব্বে, দুইজন অজানা অশ্বারোহী একটা বড় কাঠের সিন্দুক বহিয়া আনিয়া গির্জ্জার ফটকের কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রধান গির্জ্জা হইতে অপহৃত বহুমূল্য সমস্ত দ্রব্যাদিই তাহার মধ্যে পাওয়া গেল; সিন্দুকের ভিতরে এক টুকরা কাগজে কেবলমাত্র দুইটি কথা লেখা ছিল—"ক্রাভাট—মিরিয়েলকে।" সে সব বহুমূল্য দ্রব্যাদি গির্জ্জায় প্রত্যর্পিত হইয়াছিল কি না আমরা জানি না। তবে মিরিয়েলের মৃত্যুর পর তাঁহার খাতাপত্রের মধ্যে এক স্থানে একটা লেখা পাওয়া যায়—সম্ভবতঃ তাহা এই ঘটনার উল্লেখেই লিখিত। "এখন কথা এই, এ সব জিনিস গির্জ্জায় না হাঁসপাতালে—কোথায় দেওয়া যায়?"

আর একবার কোন এক কাউন্টের সহিত নিমন্ত্রণোপলক্ষে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কাউন্টটি আধুনিক সভ্যতাপ্রসূত অদ্ভুত একটি জীব, ঘোরতর জড়বাদী; মিরিয়েলের কাছে এই ভাবে তিনি তাঁহার মনোবিজ্ঞানের সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন—

"আচ্ছা, এই যে এত বড় পৃথিবী, এটা কি? এক চামচ ময়দার উপর বিন্দু পরিমাণ ছিটা মাত্র; মানুষই তার পর তাকে গড়ে তোলে। তবে—সৃষ্টিকর্ত্তা আবার কে? অনাদ্যনন্ত কালের বিশ্বপিতাই বা কে? জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ, তার একটা সাধারণ বুদ্ধি, তার নিজের একটা বুদ্ধি-বিচার আছে। যে শুধু আত্মোৎসর্গ এবং বৈরাগ্যের উপদেশ দেয়, তাকে ত্রাণকর্ত্তা বলে লোকে তার কথা মেনে চল্‌বে কেন? জীবন ক'দিনের? যতদিন বেঁচে আছ হেসে খেলে নাও। আত্মোৎসর্গ কার জন্য?

বৈরাগ্য কিসের? পাপ-পুণ্যের বিচার?—হায়রে ভ্রান্তি, মৃত্যুর পর যদি অস্তিত্ব থাকে, তবেই না পাপ-পুণ্য! সে অস্তিত্ব মরীচিকা মাত্র। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেউ দিতে পারে? মৃত্যুর পর বুঝি মানুষ দেবদূত হয়, তার ঘাড়ের ওপর দুটো সবুজ পাখা বেরোয়, আর সেই পাখা নিয়ে ফড়িঙের মত হুপ হাপ্ করে এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রে লাফিয়ে লাফিয়ে সে শেষে ভগবানের কাছে যায়। এমন অ'জগুবি কথাও আজকাল লোকে বিশ্বাস করে! আমি ত বুঝি পৃথিবীই সব; পৃথিবীর সুখ ছেড়ে যে স্বর্গের পানে চায়, তার পক্ষে 'যো ধ্রুবাণি'র ব্যাপারই ঘটে। আমি কে? কিছুই নই,—জন্মের পূর্ব্বেও কিছু ছিলাম না, পরেও কিছু থাক্‌ব না। এ জন্মেই আমার আরম্ভ, মৃত্যুতেই আমার শেষ। তবে সুখ ছেড়ে আমি দুঃখকে বরণ কর্‌ব কেন? সুখের পরিণাম কি?—কিছুই না; দুঃখের?—কিছুই না। তবে স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝাটা ঘাড়ে নিই কেন? ভক্ষ্য কেন হতে যাব? হই ত ভক্ষকই হব। এই আমার মনোবিজ্ঞানের মূল-সূত্র। মৃত্যুর পর জুজুর ভয় দেখাতে পার, কিন্তু সে সবই কল্পনা; মৃত্যুর পর জীবন নেই, এটা স্থির জেনো। তবে হাঁ, সাধারণলোক—যাদের চিন্তা এবং বিচার-বুদ্ধি তেমন উৎকর্ষ লাভ করেনি, তাদের পক্ষে আত্মা, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, স্বর্গলোক প্রভৃতি কথাগুলা কতকটা কার্য্যকরী হয় বটে। সেই সব অজ্ঞ বেচারাদের জন্যই বেচারা ভগবানের কল্পনা—আমাদের জন্য নয়।"

মিরিয়েল শেষ পর্য্যন্ত ধীরভাবে কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন—"এ জড়বিজ্ঞান মন্দ নয়। এতে আর কিছু হোক্ না হোক্, মানুষকে নির্ব্বিবাদে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন করে দেয়—কোন কিছুর জন্য মনে আদৌ গ্লানি জন্মাতে দেয় না। তবে এ ধর্ম্ম আপনাদের মতই শিক্ষিত, উন্নত এবং অর্থবান্ লোক—যাঁরা জীবনের স্ফূর্ত্তির পথে কোন বাধাই রাখ্‌তে চান না—তাঁদের পক্ষেই পোষায়। কিন্তু আপনাদের এ তত্ত্ব গভীর গুহায় নিহিত, অনেক অনুসন্ধান করে বা'র কর্‌তে হয়। যা হোক্ ভগবানের প্রতি নির্ভর করা যে অন্ততঃ সাধারণ লোকেদের পক্ষেও প্রয়োজনীয়, এ কথাটাও যে আপনারা মানেন, সে আপনাদের উদারতা!"

(৪)

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা মিরিয়েলের চরিত্র-বর্ণনার উপসংহার করিব।

ডি—সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে নির্জ্জন এক অধিত্যকায় একটি বৃদ্ধ বাস করিত। লোকটা রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় সাধারণতন্ত্র-দলভুক্ত ছিল; এবং সাক্ষাৎভাবে তৎকালীন সম্রাটের মৃত্যুদণ্ডের সপক্ষে ভোট না দিলেও, সে যে একজন চরমপন্থী ছিল, সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ ছিল না। তার উপর নাস্তিক বলিয়াও তার আর একটা অখ্যাতি ছিল; ফলে বহুবৎসর ধরিয়া সে অধিত্যকায় বাস করিলেও একমাত্র ভৃত্য ব্যতীত একদিনও অন্য কোন মনুষ্যের সাক্ষাৎ লাভ সেখানে সে পায় নাই। কিন্তু মিরিয়েল প্রায়ই সুদূর

দিক্-চক্রবালে বিটপিবনচ্ছায় সে অধিত্যকার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কি সুযোগে তাহার সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়, তাহাই ভাবিতেন। তত্রাচ, সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, বৃদ্ধের প্রতি জনসাধারণের ন্যায় তাঁহারও কতকটা বিতৃষ্ণা ছিল—তাই, সুযোগ ঘটিলেও, কতদিন মিরিয়েল অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সহসা একদিন বৃদ্ধের সাংঘাতিক পীড়ার কথা সহরময় রাষ্ট্র হইল—তাহার একমাত্র ভৃত্যই ডাক্তার ডাকিতে আসিয়া এ সংবাদ দিয়াছিল। মিরিয়েল তৎক্ষণাৎ গায়ে একটা মোটা কোর্ত্তা জড়াইয়া, ছড়ি হাতে করিয়া, বৃদ্ধের বাসস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্য তখন ডুবুডুবু, বৃদ্ধের জরাজীর্ণ কুটীরখানি দূর হইতে মিরিয়েলের নয়নপথে পতিত হইল। তাঁহার ধমনীস্রোত দ্রুততর প্রবাহিত হইতেছিল;—এক লম্ফে নালা অতিক্রম করিয়া, বেড়া ডিঙ্গাইয়া, কাঁটা-গুল্মের প্রতি দৃক্ষেপ না করিয়া, মিরিয়েল একটা অযত্নরক্ষিত পুরাতন বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তারপর নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হইয়া সহসা বৃদ্ধের সম্মুখীন হইলেন। বৃদ্ধ তখন দরজার সম্মুখে চাকাওয়ালা একখানা পুরাতন চেয়ারের উপর বসিয়া অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি চাহিয়াছিল—তাহার চক্ষে একটি শান্ত আনন্দ-লেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পার্শ্বে ভৃত্যটি একবাটি দুধ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বৃদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া, ধন্যবাদ দিয়া, পাত্রটি তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। সহসা মিরিয়েলকে সম্মুখে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া উঠিল; কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"আমার এ নির্জ্জন কুটীরে আজ সর্ব্বপ্রথম বাইরের লোকের দেখা পেলাম। কে আপনি মশায়?—কি চান?"

"আমি বিয়েঁভ্ মিরিয়েল।"

সে নাম বৃদ্ধের নির্জ্জনাবাসেও প্রবেশ করিয়াছিল।—"ওঃ, তা হলে আপনি আমার ধর্ম্মদেষ্টা?"

"হয় ত, বটে।"

"আসুন, ভিতরে আসুন"—বলিয়া বৃদ্ধ করমর্দ্দনের জন্য হস্তপ্রসারণ করিল। মিরিয়েল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন—"যাক, ভাল; যা শুনেছিলাম তা নয়, আপনাকে দেখে ত তেমন পীড়িত বলে মনে হচ্ছে না।"

"আমার পরমায়ু আর তিন ঘণ্টা মাত্র।" বলিয়া বৃদ্ধ একটু থামিয়া বলিল—"চিকিৎসা-শাস্ত্রে মোটামুটি আমার অভিজ্ঞতা আছে। কাল পা ঠাণ্ডা হয়েছিল, আজ কোমর পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, বুক পর্য্যন্ত উঠতে যেটুকু দেরী। জন্মের মত একবার শেষবার প্রকৃতি-জননীকে ভাল করে দেখ্‌ব বলে চেয়ারখানা বাইরে টানিয়ে এনেছি। সূর্য্যাস্ত বড় মনোরম না? আর একটা ঊষা দেখে মরবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা ঘটবে না। যাক্, ঊষার অরুণ, না হয় নক্ষত্রপুঞ্জের আলো—একই কথা।"

বৃদ্ধ ভৃত্যটিকে বিদায় দিল; বলিল—"সে দিন রাত্রি জেগেছ, আজ এখন ঘুমাওগে যাও।" তারপর মৃদুস্বরে বলিল—"তার ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমিও মরব। তার ক্ষণ-নিদ্রা আর আমার মহা-নিদ্রা—দু'য়েতে মিলবে ভাল।"

মিরিয়েল যাহা আশা করিয়া আসিয়া-

ছিলেন, তাহা পাইলেন না—এ ত সাধুর মৃত্যু-শয্যা নয়! আর একটা কথা,—ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যাপার লইয়াই চরিত্রের সমষ্টি। মিরিয়েল যে সর্ব্ববিষয়ে দেবচরিত্র ছিলেন, এমন কথা আমরা বলি না, তাই সকলের নিকটে বিশেষ সম্মানসূচক সম্বোধনে অভ্যস্ত মিরিয়েল, বৃদ্ধের কাছে এ সাধারণ ব্যবহার পাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণই হইলেন; এবং তাহার সহিত একটু রূঢ় ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার জন্মাইল। বিশেষতঃ বৃদ্ধ রাজদ্রোহী—বিপ্লব-সম্প্রদায়ভুক্ত।

কিন্তু আশ্চর্য্য সে আকৃতি—সে সমুন্নত দেহাবয়ব, স্থিরগম্ভীর স্বর এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখভাব! অশীতিবর্ষ বয়সেও, মৃত্যুর দ্বারে আসিয়াও, তাহার সর্ব্বদেহে পূর্ণস্বাস্থ্যের লক্ষণ জাগিতেছিল। তার এ মৃত্যু যেন স্বেচ্ছামৃত্যুমাত্র, মৃত্যু-যন্ত্রণায় তাহাকে বিন্দুমাত্র কাতর করিতে পারে নাই। তাহার আকটি পদদ্বয় শীতল এবং অসাড় হইলেও, আরব্যোপন্যাসবর্ণিত নৃপতির ন্যায়, তখনও তাহার মস্তকে পূর্ণতেজ বিরাজমান ছিল।

মিরিয়েল সহসা বলিলেন—"যা হোক্, আপনি যে রাজ-হত্যায় মত দেন নি, সেটা খুবই ভাল করেছেন।"

"আপনি ভুল বুঝছেন—আমি সত্যই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলাম।"

"সত্য কথা?"

"হাঁ, সত্য। তবে সে অত্যাচারী, রাজা নিজে নন—তাঁর অজ্ঞানতা! আমি সেই অজ্ঞানতাকেই দূর করতে চেয়েছিলাম। অজ্ঞানতা থেকে যে রাজশক্তির উদ্ভব এবং প্রভাব সে শক্তি মিথ্যা শক্তি। যথার্থ শক্তি বিজ্ঞানের—কারণ, সত্য থেকেই বিজ্ঞানের বিকাশ। মানুষের এই বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করা উচিত।"

"বিবেকের পথও বটে।"

"একই কথা। বিবেক অর্থে যে জ্ঞান আমাদের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে।"

মিরিয়েলের কাছে কথাটা একটু নূতন;—বিস্মিত হইয়া তিনি বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"সেই অজ্ঞানতার বিরুদ্ধেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সম্রাট্ ষোড়শলুইয়ের বিরুদ্ধে নয়। মানুষ হয়ে মানুষকে হনন করবার আমার কি অধিকার আছে? কিন্তু যেটা পাপ, সেটা দূর করা সবারই কর্ত্তব্য। সাধারণতন্ত্রের স্বপক্ষে ভোট দেবার সময় আমি শুধু স্ত্রীলোকের দৈন্য, পুরুষের হীনতা এবং বালক-বালিকার জীবনের অন্ধকারই দূর করতে চেয়েছিলাম; পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সামঞ্জস্য এবং জ্ঞানের মহিমাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম; দুর্নীতিপূর্ণ অন্ধকারময় পুরাতন আচারব্যবহার ধুয়ে মুছে ফেলে মানুষকে তার যথার্থ মহত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম। তবে আমাদের আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয়নি; দুর্নীতির বাহ্যাবরণই আমরা ভেঙেছিলাম—কিন্তু ভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারিনি। দুর্নীতি দূর করাটাই সব নয়—লোকের স্বভাবচরিত্র মতিগতিরও পরিবর্ত্তন সংসাধন করা চাই—নইলে কোন সংস্কারই চিরস্থায়ী হয় না, তার যথার্থ ফললাভ হয় না। শুধু হাওয়ার যন্ত্রটাকে ভেঙ্গে কি লাভ? হাওয়া ত তবু সে-ই বইতে থাকে!"

"কিন্তু আপনাদের এ সংস্কার ত সংস্কার

নয়, এ যে একেবারে চুরমার করা। রাগের মুখে যা করা যায়, তার পরিণাম সম্বন্ধে আমার তেমন ভরসা হয় না।''

"কিন্তু ন্যায় বিচারেও ক্রোধের বশবর্ত্তিতা একটু থাকেই—সেটা দোষের নয়, সেটা সমাজকে বরং অগ্রসর করেই দেয়। এই যে ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লব,—এটা অসম্পূর্ণ হোক্ তাতে ক্ষতি নেই,—কিন্তু এমন একটা মহান জিনিস পৃথিবীতে আর ঘটেনি খৃষ্টের অভ্যুদয়ের পর মানুষ আপন উন্নতির জন্য এর চেয়ে বড় চেষ্টা আর একদিনও করেনি। এর ফলে সমাজের গুপ্তবন্ধন অত্যাচার সব শিথিল হয়ে গেছে, এ বিপ্লব মানুষকে করুণার্দ্র করেছে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর ক'রে একটা শান্তির শৃঙ্খলা এনে মানুষকে উন্নত ক'রে, সমগ্র পৃথিবীর উপর যথার্থ সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত ক'রে দিয়েছে;—মানবত্বের চরম পরিণতির আভাষ দেখিয়ে দিয়েছে। পনের শ' বছর ধরে যে মেঘ জড় হচ্ছিল, পনের শ' বছরের শেষে তা' থেকে বজ্রপতন হয়েছে—সে বজ্রের দোষ কি ?"

"মানি বটে ; তবে, বিচারক ন্যায়ধর্ম্মের নজীর দেখায়, আর ধর্ম্মযাজক করুণার দোহাই দেয়। আচ্ছা, বালক সপ্তদশ লুইয়ের কি অপরাধ ছিল ?"

"কার্ত্তুসের শিশুভ্রাতারই বা কি অপরাধ ছিল ? শুধু কার্ত্তুসের ভ্রাতা বলেই বা সে নৃশংসভাবে হত হল কেন ? কথাটা দুই পক্ষ থেকেই দেখা উচিত। এ বিচারে উচ্চ-নীচ ধনাঢ্য-গরীব, রাজা প্রজার প্রভেদ কর্‌লে চলে না। আমার সঙ্গে নির্য্যাতিত দরিদ্রদের জন্য আপনি কাঁদুন, আমিও আপনার সঙ্গে অত্যাচারিত রাজবংশীয়দের জন্য কাঁদব—নইলে নয়।"

"আমি সবারই জন্য কাঁদি"

"সবারই জন্য সমানভাবে কাদতে হবে। করুণাটা বরং দরিদ্রের জন্যই বেশী থাকা দরকার—কারণ নির্য্যাতিত তাহারাই বেশী হয়েছে। শুধু তাই নয়"—বলিয়া, থামিয়া, বৃদ্ধ সহসা বলিয়া উঠিল—"কিন্তু আপনি কে মশায়, যে এ সময় এ সব প্রশ্ন করেন ? আগে পাছে চোপদার, বাসের জন্য প্রাসাদ, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে, যে যীশু পদব্রজেই ঘুরতেন, তাঁর নামের দোহাই দিয়ে ঘুড়ি হাঁকিয়ে বেড়ান—এই ত আপনার পরিচয় ?—আপনার যথার্থ স্বরূপ কি, আপনার মহত্ত্ব কোন্‌খানে যে আপনি আমাকে জ্ঞানের উপদেশ দিতে আসেন ?"

"আমি সামান্য কীট মাত্র।"

"কীট মাত্র! কীট আবার গাড়ীতে চড়ে না কি ?"

মিরিয়েলের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন—'মানি, না হয় যে আমি খুব ভাল খাই দাই পরি, আমার প্রাসাদ চোপদার কিছুরই অভাব নেই, ফটকের ওপাশে বাগানের ভেতর না হয় আমার ঘুড়িগাড়ীখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে—এ সবই না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু করুণা যে একটা ধর্ম্ম নয়, জীবে দয়া যে একটা কর্ত্তব্য নয়, '৯৩ খৃষ্টাব্দের সে বিপ্লবটা যে নির্ম্মায়িকতার প্রতিমূর্ত্তি নয় - এ কথা তা থেকে কি ক'রে প্রমাণিত হয় ?"

"এ কথার উত্তর দেবার পূর্ব্বে, আমি আমার অসৌজন্যতার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আপনি আমার অতিথি—

আপনার অর্থ, সমাজ, সম্মান প্রভৃতি নিয়ে কোনরূপ কথা বলা আমার ভাল হয় না। বিপ্লবটাকে তবে আপনি নির্ম্মম ঘটনাচক্রের ফলমাত্র বলেন ?"

"নিশ্চয়ই। 'গিলটিন' দেখে মারাটের সে আনন্দোচ্ছ্বাসটা কি ?"

"আর রাজ-সৈন্য যখন জনসাধারণকে দ'লে পিষে মারছিল, তখন বস্তুয়েত যে নাম-সংকীর্ত্তন বা'র করেছিল—সেটা ?"

উত্তরটা রূঢ় হইয়াছিল—শাণিত ছুরিকার ন্যায় তাহা মিরিয়েলকে যাইয়া বিদ্ধ করিল। মিরিয়েল পরাজিত নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

সহসা বৃদ্ধের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল তবু সে বলিতে লাগিল—"বিপ্লবটা যদি এতই নির্ম্মম হয়, রাজতন্ত্রটা তবে কি ? দু'দিকেই সমান অত্যাচার আছে। আপনি সম্রাজ্ঞী মেরী আণ্টয়নেটের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছেন কিন্তু মহানুভব লুই'য়ের সময়ে যে স্তন্যদান-নিরতা জননী ধাত্রীকে উন্মুক্তবক্ষা করিয়া কাষ্ঠদণ্ডের সহিত বাধিয়া রাখিয়া, বুভুক্ষু শিশুকে জননীর দুগ্ধস্রাবী পূর্ণ স্তনদ্বয় দেখাইয়া,—হয় দেহের না হয় আত্মার বিনাশ এ দু'য়ের মধ্যে একটাকে বরণ করিয়া লইতে বলিয়াছিল,—তার বিষয়ে আপনি কি বলেন ? এই যে টাণ্টালাসের দাহ—এর মত রূঢ় কঠোর আর কিছু কোথাও খুঁজিয়া পান কি ?—ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের বিচার করবার সময় এ কথাটা মনে রাখ্‌বেন। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা এর ভীষণতাকে ক্ষমা করবে ;—এর তীব্রতম আঘাত থেকে মানবজাতির কল্যাণই হবে।"

"কিন্তু সকল উন্নতির মূলেই ভগবানের প্রতি নির্ভর থাকা চাই। যে নাস্তিক—সে মানুষকে শুধু বিপথেই নিয়ে যায়।"

বৃদ্ধের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।—দূর আকাশগাত্রে, যেখানে সন্ধ্যার অন্ধকার এবং গোধূলির পাটলরাগ মিশিতেছিল—বৃদ্ধ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল,—দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পতিত হইয়া ভূমিতল সিক্ত করিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় মৃদু কম্পিত হইয়া উঠিল,—"প্রভু, স্বামি, আমার জীবনের আদর্শস্থল। একমাত্র তুমিই আছ !"

তার পর সুদূর আকাশগাত্রে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, মিরিয়েলকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"কালাতীত কিছু আছেই ; —আছে, ওইখানে। সেই অনন্তের মধ্যে যদি 'আমি' না থাকি, তবে, অন্ততঃ আমার কাছে, 'আমাতে'ই সে অনন্তের পর্য্যবসান হ'ত ; অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর আর তার অস্তিত্ব থাকৃত না। কিন্তু তা ত নয়। 'আমি' যে ওর মধ্যে আছি। এই যে আমার বড় বড় স্বরূপ যা' অনন্তের মধ্যে অভিন্ন হয়ে রয়েছে—তাই-ই ভগবান্।"

মিরিয়েল ক্রমশঃই বৃদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার তুষার-শীতল দক্ষিণ হস্তখানি আপন হস্তের উপর তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"ভাই, এ মুহূর্ত্ত ভগবানের নিজস্ব। তাঁর নাম-গান না করে এ মুহূর্ত্ত বাজে কথায় কাটাব ?"

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ চক্ষুরুন্মীলন করিল। সে মুখের উপর শান্তির ছায়া ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।—

"অধ্যয়ন, চিন্তা এবং ধ্যানধারণায় আমি

আমার সারাজীবন অতিবাহিত করে এসেছি। ষাট বৎসর বয়সে স্বদেশের আহ্বানে আমি প্রথম স্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত হই। আমার যথাসাধ্য আমি সে বিষয়ে আমার কর্ত্তব্যপালন করেছি। সত্য বটে, আমি একদিন পূজাবেদী থেকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি লুণ্ঠন করেছি,— কিন্তু সেটা নিজের স্বার্থের জন্য নয়, সে বস্ত্র দিয়ে দেশেরই ধারাশোণিতস্রাবী ক্ষতমুখ ঢেকেছি। নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে আমি, যতদূর সম্ভব বরাবর দাঁড়িয়েছি—মানুষকে চিরদিনই আলোকের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছি।—কিন্তু আজ ?— যাদের জন্য কলঙ্কের পসরা মাথায় করেছি— আজ আমি তাদেরই উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি; নির্জ্জিত, ঘৃণিত, নিঃসঙ্গ হয়ে এ নির্জ্জন অধিত্যকায় বাস করছি। কিন্তু সেজন্য আমি দুঃখিত নই।—আমার জীবনের এখন শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত; এ সময় আপনি আমার কাছে কি চান ?"

মিরিয়েল নতজানু হইয়া আনতমস্তকে উত্তর করিলেন—"শুধু আপনার আশীর্ব্বাদটুকু ভিক্ষা করি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন মিরিয়েল বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিলেন—বৃদ্ধের আত্মা তখন মহাযাত্রার পথিক হইয়াছে!

চিন্তাভারমনে ধীরে ধীরে মিরিয়েল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বৃদ্ধের কথা উঠিলেই অতঃপর তিনি শুধু উর্দ্ধে স্বর্গের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেন। ইহার পর হইতে দুর্ব্বল এবং নির্য্যাতের প্রতি তাঁহার করুণা এবং যত্ন আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।— তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে সে আত্মার মহাপ্রয়াণের দৃশ্য, এবং সেই মহান্ চরিত্রের প্রতিবিম্ব যে তাঁহার চরিত্রের উপর পতিত হইয়া, তাঁহাকে পূর্ণতর করিয়া তোলে নাই—এ কথা কেহ বলিতে পারে না।

এ সংসারে দরিদ্রের আদর নাই, ত্যাগী সন্ন্যাসীরও তেমন আমল নাই; লোকে তাকে দূরে দূরেই রাখিতে চায়—পাছে তার সহবাসে এবং স্পর্শদোষে দারিদ্র্যের বোঝা চিরকালের মত ঘাড়ে চাপে, পাছে তার ত্যাগের আদর্শ জীবনের ত্যাগের মাত্রাটা বৃদ্ধি করিয়া দেয়! মানুষ তাই এই 'ছোঁয়াচে সাধুতা' থেকে যত পারে দূরে দূরে থাকে। মিরিয়েলেরও সেই জন্য ধর্ম্মযাজক মহলে তত খাতির ছিল না; অন্যান্য বিশপদিগের ন্যায় তাই তাঁর চারিধারে গ্রহ-বেষ্টনী উপগ্রহের ন্যায়, অধস্তন ধর্ম্মযাজক-দিগের তেমন সমাগম হইত না। এই আমাদের সমাজ! 'যেন তেন প্রকারেণ' সাংসারিক সাফল্যলাভ কর—এই তাহার শিক্ষা!

কিন্তু সে সাফল্য কি? সে ত মেকি জিনিস;—ভ্রান্ত মানবের চক্ষে ধূলা দিবার ছল মাত্র! সাধারণ মানুষ এই সাফল্য লইয়াই মানবের সকল উন্নতি-অবনতির বিচার করে; তাহাদের চক্ষে অর্থসৌভাগ্যই মানুষের কার্য্যকরী শক্তির পরিচায়ক, মহত্ত্বের মাপকাঠি। গিল্টিকেই তাহারা সোণা বলিয়া দেখে, সাফল্য মাত্রকেই—(সে যেরূপ সাফল্য হউক না কেন)—প্রতিভা নামে অভিহিত করে। নক্ষত্রের দীপ্তি এবং খদ্যোতের আলো এ দুয়ের মধ্যে তাহারা বড় একটা প্রভেদ করিতে পারে না।

এরূপ ভাবে কতকটা উপেক্ষিত হইয়াও কিন্তু মিরিয়েলের মনে কোন দিন ক্ষোভ

আসে নাই। আপনার সচ্চিন্তা এবং সৎকার্য্য প্রসূত যে আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া থাকিত। উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতই সে চরিত্র, তাহাতে নকলতা কিছু ছিল না; লোকব্যবহারে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁর কোন বুজরুকী ছিল না। সে চরিত্র শিশুরই মত নির্ম্মল, পবিত্র উদার,—'বশ্বকে আপন করিতে সমুৎসুক।

তত্রাচ, প্রতিভা যাহাকে বলে, মিরিয়েলের তাহা ছিল না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংশয়-প্রশ্নাদি লইয়া তিনি বড় একটা মাথা ঘামাইতে চাহিতেন না। তাঁর ধর্ম্ম যতটা হৃদয়ের, ততটা তাঁর মস্তিষ্কের নয়; সেটা বিশ্বাসের ধর্ম্ম, তর্ক-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম নয়। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কখনও তিনি তর্কবিতর্ক করিতে চাহিতেন না: তাঁর অস্তিত্বানুভূতি, তাঁর শান্ত মাধুরীটুকুই মিরিয়েলের জীবনখানিকে ভরিয়া রাখিত। ভবিষ্যৎ?—সে ত রহস্যাচ্ছন্ন; অতীত?—সে যে আরও রহস্যময়; বিশ্বের সকল জিনিসই এক মহারহস্যাবৃত!—সে দুর্জ্জেয় রহস্য তিনি ভেদ করিতে চাহিতেন না;—প্রশান্তভাবে চাহিয়া চাহিয়া শুধু তাহার লীলা-বৈচিত্র্য দেখিতেন। এই যে প্রকৃতির বুকে চঞ্চল অণু-পরমাণু প্রতিনিয়ত কোন্ এক অদৃশ্য শক্তিতে চালিত হইয়া, একই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া, এত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতেছে,—একের মধ্যে বহু, বহুর মধ্যে একের সমাবেশ করিতেছে;—তার কোথাও একটু ভুলচুক নাই, কোথাও কিছুর অভাব পড়ে না; এই যে অনন্ত হইতে সান্তের উদ্ভব, আলোক হইতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি; এই যে প্রতিদিনের নিত্যনূতন ভাঙ্গাগড়া, মৃত্যু ও জীবনের বিকাশ;—বিস্মিত বিমুগ্ধ মিরিয়েলের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ইহা এক অপূর্ব্ব চিত্ররেখা অঙ্কিত করিয়া দিত।

এমন লোক অনেক আছে, যাহারা বিশ্লেষণের অতলস্পর্শ গহ্বরে এবং খাঁটি কল্পনার দ্বারে, সকল গোঁড়ামি বর্জ্জিত হইয়া, ভগবানের কাছে একটা মীমাংসার জন্য আসিয়া দাঁড়ায় তাহাদের প্রার্থনা, ভক্তের আত্মনিবেদন নয়—তাহাতে তর্ক করিবার একটা ধৃষ্টতা জাগিয়া থাকে, ভগবানকে তাহারা শুধু প্রশ্নই করিতে থাকে। এ ধর্ম্ম—মুখ্য ধর্ম্ম, ইহার উদ্বেগ এবং দায়িত্ব খুবই বেশী।—মানবের কল্পনা সীমাবদ্ধ নহে, আপন উদ্দাম কল্পনাশক্তি দ্বারা প্রকৃতিতে সে মোহের সৃজন করে, এবং প্রকৃতিতে আবার সে প্রতিফলিত মোহ-মাধুরী দেখিয়া নিজেই আত্মহারা হয়। কিন্তু এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা সাধনবলে সৃষ্টির রহস্যলীলার মূলমন্ত্রের সন্ধান পান,—কল্পনার দিক্-চক্রবালে সীমাহীন অনন্ত-শৈলের ভীষণ ছবির দর্শন-লাভ করেন।—সে সাধনপথ বড় বন্ধুর, বিপজ্জালজড়িত,—সুইডেনবর্গ পাস্কেলের মত অতি বড় সাধকবৃন্দও সে মার্গ অবলম্বন করিয়া উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে, মানি বটে যে, এই তীব্র চিন্তাশক্তির একটা নৈতিক লাভ আছে; এই বন্ধুর পথের অবসানে একটা শ্রেষ্ঠ উন্নতির আদর্শ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বিয়েঁভু মিরিয়েল চিরদিন এ মার্গকে ভয় করিয়া চলিতেন; যেটা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ, তাহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন—সেটা তাঁর ধর্ম্ম-গ্রন্থোক্ত ঈশ্বরের আদেশ-বিধান পালন।

সমস্ত পৃথিবীময় এই যে আধিব্যাধি

পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—ইহার রহস্যানুসন্ধিৎসু না হইয়া কিসে তাহার মোচন হয়, তাহারই চেষ্টা তিনি করিতেন। সৃষ্টির যত কিছু কঠোরতা ভীষণতা তাঁর মনে শুধু করুণারই উদ্রেক করিত, আর্ত্ত পৃথিবী যেন চিরদিন বেদনা-ছলছল নেত্রে সান্ত্বনার ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাই ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিত; সান্ত্বনা এবং সহানুভূতি দিবার জন্য তাই তিনি এত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

লোকে যেমন খনি হইতে স্বর্ণ খুঁড়িয়া বাহির করে, তিনি তেমনি বিশ্বের দুঃখ-যন্ত্রণারূপ খনি হইতে মঙ্গলময়ের ছবিখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেন। তিনি বলিতেন—"পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস—তাতেই জীবনের চরম সার্থকতা।" একবার কোন ব্যক্তি তাঁহার এ উক্তি লইয়া পরিহাস করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"যদিই এটা বোকামি হয়, তা হলেও আত্মাকে, শুক্তির ভিতর মুক্তার ন্যায়, এর অভ্যন্তরে নিবদ্ধ করে রাখাই যুক্তি।" আপন জীবন সম্বন্ধে তিনি চিরদিন এইভাবে চলিয়াছিলেন, এবং ইহা হইতেই তাঁহার চিত্তের সে মহান্ গাম্ভীর্য্য এবং শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সকল মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে, অথচ নিরাশ করিয়া দেয়; abstractionএর অতলস্পর্শ গহ্বর, metaphysicsএর গগনচুম্বী শিখরদেশ, রহস্যাচ্ছন্ন গভীরতম ভাবসমূহ, অবতারবাদ, নাস্তিকতার নির্ব্বাণবাদ, অদৃষ্টবাদ, সদসতের বিচার, জৈবসংগ্রাম, মানবের বিবেকবুদ্ধি, মানবেতর জীবসমূহের চৈতন্যবোধক স্বপ্ন, মৃত্যুর রূপান্তর, মৃতের পুনর্জ্জীবন, নানা আঘাত-সংঘাত এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আত্মার একতানুভূতি, সৃষ্টির মূলভূত কারণ, 'অস্তি' এবং নাস্তি', আত্মা, প্রকৃতি এবং স্বাধীনতা, দুঃসাধ্য সমস্যাবলী—দান্তে, লুক্রেসিয়াস, সেণ্টপল প্রভৃতি যাহার মীমাংসার জন্য আপনাপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন—সে সকল লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া, মুগ্ধ হইয়া তিনি শুধু তাহার লীলা-বৈচিত্র্যই দেখিতেন।

(৫)

প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার দিন মিরিয়েল আপন অভ্যস্ত সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া আসিয়া, অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত আপন কক্ষে বসিয়া, কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। ভগবানের প্রতি, আপনার প্রতি, মানবের প্রতি এবং মানবেতর জান্তব পদার্থের প্রতি—এই চতুর্ব্বিধ কর্ত্তব্য এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। দুঃখের বিষয় মিরিয়েল তাঁহার সে পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার যখন তাঁহার শয্যাশিয়রস্থ দেওয়াল-আলমারি হইতে রূপার বাসনাদি লইতে আসিল, তখনও তিনি নিবিষ্ট চিত্তে লিখনরত।

সহসা মিরিয়েলের চমক ভাঙ্গিল; হয় ত বা ভগ্নী খাবার আগলাইয়া বসিয়া আছে ভাবিয়া, কাগজ-পত্র তুলিয়া রাখিয়া, ভোজন-কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইলেন

এইখানে মিরিয়েলের বাস-ভবনের একটু বর্ণনার আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, —বাড়ীটি ছোট, দ্বিতল এবং তাহার পশ্চাদ্দিকে ফুল-ফলের একখণ্ড বাগান ছিল। একতালায় লম্বালম্বি ধরণের সারিসারি তিনটি

কক্ষ; কক্ষের মধ্য দিয়াই কক্ষান্তরে যাইতে হইত, পার্শ্বদিকে অন্য কোন দরজা ছিল না। সদর রাস্তার উপরেই প্রথম কক্ষটি অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্যাপ্তিস্তাইন ও ম্যাগলোয়ার দ্বিতলে থাকিতেন।

ভোজনে বসিয়া, তাহার পূর্ব্ব হইতেই, সদর দ্বার বন্ধ রাখার বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল। মিরিয়েল এ নূতন বাটীতে আসিয়াই বহির্দ্বারের খিল খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, ম্যাগলোয়ারের প্রতিবাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন—"দেখ, ডাক্তারের আর ধর্ম্মযাজকের বাড়ীর মধ্যে এইটুকু মাত্র প্রভেদ—ডাক্তারের বাড়ীর দ্বার কখনো বন্ধ রাখা উচিত নয়, আর ধর্ম্মযাজকের বাড়ীর দরজা সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকা উচিত।" তাঁহার সচরাচর ব্যবহৃত কোন এক পুস্তকের একস্থানে তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—'অতিথির পরিচয় জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কোরো না—নিজের নামটা যার পক্ষে দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হয়ে পড়েছে সাধারণতঃ সেই রকম লোকই তোমার দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করতে আসে।"

আজ কিন্তু ম্যাগলোয়ার না-ছোড়-বান্দা হইয়া মিরিয়েলকে এ বিষয়ে ধরিয়া বসিল। তার কারণও ছিল। সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে যাইয়া সে একটা গুজব শুনিয়া আসিয়াছিল যে, একটা দুর্দ্দান্ত ফেরার আসামী সেই দিন রাত্রে সহরে প্রবেশ করিয়া কোথায় লুকাইয়া আছে, রাত্রে যেন সবাই সাবধানে চলাফেরা করে, প্রধান শাসনকর্ত্তা ও সহর-কোটালের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় পুলিস এখন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছে, কাজেই ধনপ্রাণ রক্ষার ভার এখন নিজেদের উপর; প্রাণের মায়া যার আছে সে যেন সর্ব্বদা সদর দরজা তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখে ইত্যাদি। শুনিয়া আসিয়া অবধি বৃদ্ধা ভয়ে কাঁপিতেছিল। মিরিয়েল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—

"এত ভয় কিসের বাছা?"

"ভয় কিসের? আ, আমার কপাল। তবে এতক্ষণ কর্ত্রীকে বলছিলাম কি?" বলিয়া ম্যাগলোয়ার রঞ্জিত করিয়া গুজবটার পুনরাবৃত্তি করিল।

"তবেই ত!" বলিয়া মিরিয়েল গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

বৃদ্ধা জো পাইয়া গেল, বলিল—"সহরের অবস্থাই দেখুন দেখি, কি ভয়ানক! এমন একটা পার্ব্বত্য সহরে, পথে কি না একটা আলো নেই! রাস্তাও আবার তেমনি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তাই বলছি, কর্ত্রী ঠাকরুণ ত বলছিলেন যে—

"আমি?" অনুচ্চ অথচ গম্ভীর স্বরে ব্যাপ্তিস্তাইন বলিলেন—"আমি কিছুই বলিনি, দাদা যা করবেন তাই ঠিক।"

ম্যাগলোয়ার তবু দমিবার পাত্রী নয়, সে বলিয়া চলিল—'কিন্তু বাড়ীটা যে একেবারে খোলা পড়ে রয়েছে, সে কথা ত মানেন? দোহাই কর্ত্তামশাই, বলুন আমি এখনি মুসবুয়া তালাওয়ালাকে ডেকে পুরাণো খিলগুলো সদর দরজায় আঁটিয়ে নিই। অন্ততঃ আজকের রাত্রিটার মত তাই করুন। ভেবে দেখুন দেখি, সামান্য একটা ছিটকিনি (তাও বাইরে থেকে খোলা যায়) যে কেউ এসে খুললেই হল—এমন অবস্থায় বাড়ীতে বাস করা দায় না? আর আপনি ত, দিনই বা কে জানে, রাত দুপুরই বা কে জানে, দরজা

ঠেললেই অমনি 'আসুন মশাই' বলতেই আছেন!—তাও আবার না আছে অনুমতির অপেক্ষা, না আছে—"

অকস্মাৎ বহির্দ্দেশে দরজার উপর প্রচণ্ড এক আঘাত পড়িল।

"কে মশায়? ভিতরে আসুন।"

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয়পুরের রাজবংশ ত্রেতাযুগাবতার ভগবান্ রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশসম্ভূত। এ জন্য ইঁহারা 'কাছোয়া রাজপুত' নামে পরিচিত। অম্বরাধিপতি ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজ মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎসিংহের নাম বঙ্কিমচন্দ্রের অমর-লেখনী আজ বঙ্গদেশে সর্ব্বজনবিদিত করিয়াছে। কুমার জগৎসিংহ পিতার পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ মহাসিংহ ১৬৭১ সংবতে সিংহাসনে উপবেশন করেন। দ্বিতীয় পুত্র ঝুঝরসিংহের তিন পুত্র। এই ঝুঝরসিংহের বংশাবলী "জগৎসিংহোত রাজাবত" নামে অভিহিত। এই তিন পুত্র তিনটি পৃথক্ পৃথক্ জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। ঝালায়ার, সেওয়াড় ইসরদা এবং বারওয়াড়ার ঠাকুরগণ উক্ত তিন পুত্রের বংশসম্ভূত। এই রাজাবত-বংশীয় ঠাকুরগণ বর্ত্তমান কালে টোঙ্ক প্রভৃতি স্থানেও বাস করিতেছেন। জয়পুরের মহারাজ কেহ অপুত্রক হইলে এই রাজাবতগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া দত্তক লওয়া হইয়া থাকে।

ইসরদার ঠাকুরগণ রাজাবত-বংশের একটি বিশিষ্ট শাখা। বর্ত্তমান জয়পুরাধিপতি মহারাজ সবাই মাধোসিংহ ইসরদার স্বর্গীয় ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র,—ইঁহার পূর্ব্বের নাম কুমার কায়েমসিংহ, ইহার মাতা ছিলেন পরলোকগত ইসরদার ঠাকুরের দ্বিতীয় 'ঠকুরাণী'। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিষয়-বিভাগ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। মাতামহ ও মাতার সহিত কুমার কায়েমসিংহও এই বিবাদে যোগ দিলেন। বাল্য ও কৈশোরে কায়েমসিংহ অত্যন্ত সাহসী ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মাতামহের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিয়া একটা কেল্লা দখল করিয়া বসিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরাজিত হইয়া জয়পুররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, কায়েমসিংহকে শাসন করিবার জন্য রাজ-সৈন্য প্রেরিত হইল। কায়েমসিংহ পরাজিত হইয়া আপন মাতা সহ বন্দী অবস্থায় জয়পুরে প্রেরিত হইলেন। মহারাজ রামসিংহের নিকট নীত হইয়া, কায়েমসিংহ বিচার প্রার্থনা করিলেন। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ মহারাজ রামসিংহ এই তেজস্বী বুদ্ধিমান বালককে প্রশংসমান চক্ষে দেখিলেন—হুকুম হইল

নজরবন্দী অবস্থায় কায়েমসিংহকে তদীয় মাতা সঙ্গ জয়পুরে বাস করিতে হইবে। শিক্ষার জন্য ইহাকে 'রাজপুত-বিদ্যালয়ে' ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল এবং তদীয় মাতাকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে জয়পুরে রাখা হইল।

কিছুকাল পরে কুমার কায়েমসিংহ কয়েক জন সহচরসহ জয়পুর হইতে পলায়ন করিলেন এবং বৃন্দাবনে তদীয় মাতৃদেবীর গুরুদেব ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পলায়নকালে মহারাজ যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ণনা করেন। জয়পুর হইতে বৃন্দাবন—এই সুদূর পথ তিনি অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। অনেক সময় অনাহারেই কাটিত। যখন আহার্য্য জুটিত, তখন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই আহার করিতে হইত—কেননা পশ্চাতে জয়পুরের অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাদের ধরিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে। এমনও অনেকবার ঘটিয়াছে যে, তাঁহারা আগুন জ্বালাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বর্ষার অগ্রে বিদ্ধ মাংস আহারের জন্য ঝলসাইয়া লইতেছেন—এমন সময় সংবাদ পাইলেন, জয়পুর-সৈন্য নিকটবর্ত্তী। অর্দ্ধ দগ্ধ মাংস বর্ষার অগ্রেই রহিল—তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ ঘোড়া ছুটাইয়া পলায়ন করিলেন। এমনি করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন—গুরুদেব আশ্রয় দিলেন, কিছুকাল পরে তাঁহার মাতাও বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসজীর উদ্যোগে যদুবংশীয় রাজপুত অমরগড়ের ঠাকুরের কন্যার সহিত কুমার কায়েমসিংহের বিবাহ হইল। বিবাহের সমস্ত খরচ বহন করিলেন অমরগড়ের ঠাকুর। এই অমরগড়-কন্যাই ভবিষ্যতের প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা মহারাণী যাদোনজী। মহারাণী যাদোনজীর মহামত দরিদ্র রাজপুত—তাঁহারই পর্ণকুটিরে আলিগড়ের সন্নিহিত কোরাগ্রামে অম্বরাধীশ্বরীর জন্ম হয়। শুনা যায়, মহারাণীর কুষ্ঠী দেখিয়া ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাস বলেন যে ইনি ভবিষ্যতে রাণী হইবেন,—এদিকে কুমার কায়েমসিংহের কুষ্ঠীতেও রাজগদি প্রাপ্তির যোগ আছে—তাই গুরুদেবের চেষ্টা ও আগ্রহে এই বিবাহ সংঘটিত হয়।

গুরু গিরিধারী দাস ব্রহ্মচারী একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে তিনি সে সময়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজপুতানার এবং অন্যত্র অন্যান্য হিন্দুরাজ্যের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল এবং তখনকার এতৎস্থানের রাজন্যবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন—ভয়ও যে না করিতেন এমন বলা যায় না। সকলেই নতশিরে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। অন্যায় করিয়া তাঁহার নিকট কাহারো নিস্তার ছিল না,—উপদেশে ক্ষান্ত না হইলে বিশেষ রূপে ভর্ৎসিত হইতে হইত। রাজা বা ধনী বলিয়া তিনি কাহাকেও কখনো খাতির করিতেন না। উত্তরকালে যে নরপতি অম্বরাধিপতি হইয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মে পরমভক্তিমান্ এবং রাজ্যশাসনে বিবেচক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাস তাঁহার উপযুক্ত গুরু ছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষার যে ফল তাহা বর্ত্তমানে মহারাজ মাধোসিংহের চরিত্রে ও প্রতি কার্য্যে প্রকাশিত। মহারাজ গুরুকে

যে প্রকার ভক্তি ও সম্মান করিতেন, গুরু-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের এই অধঃপতনের দিনে তাহা বাস্তবিকই পুরাকালের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিবাহের পর কুমার কায়েমসিংহ বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারী কুমারের জন্য তাঁহার শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া বুধসিংহ নামক এক ব্যক্তিকে তাহার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন;—ইংরাজী শিখাইবার জন্য সহকারী রাখিলেন এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, নিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কুমার কায়েমসিংহ তখন যুবক। তাঁহার মত উৎসাহী কর্ম্মিষ্ঠ যুবকের পক্ষে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা অসম্ভব। তাই রাজপুত যুবক তথা হইতে টোঙ্কে গিয়া নবাবের নিকট তাঁহার রেসালায় কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন।

তাঁহার টোঙ্কে অবস্থানকালে জয়পুরাধিপতি মহারাজ রামসিংহ সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইলেন। মহারাজ রামসিংহ জীবনের শেষাংশে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তিনি শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রাসাদের যে অংশে তিনি বাস করিতেন, তাহার পার্শ্বেই তিনি "রাজরাজেশ্বর" শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সেইখানেই কাটাইতেন, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে মহারাজ ক্ষয়রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথারীতি ঔষধ দেওয়া সত্ত্বেও মহারাজ কোন বিধি-নিষেধ মানিতেন না বলিয়া রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেল। শরীর দুর্ব্বল হইলেও তাঁহার মানসিক বলের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তিনি নিজের অবস্থা বুঝিয়া তুলাদানাদি সম্পন্ন করিলেন। এই সময় তদানীন্তনের প্রধানামাত্য ঠাকুর ফতেসিংহ কথা উঠাইলেন যে, মহারাজের স্বর্গলোক প্রাপ্তির পর কাহাকে তিনি রাজগদির উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিতে চাহেন? মহারাজ কেবলমাত্র উপযুক্ত পাত্রের একটা লিষ্ট করিয়া পেশ করিবার আদেশ দিলেন—কেহই তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ধ্যা হইতে মহারাজের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল। অন্তিমকাল সন্নিকট বুঝিয়া মহারাজ বলিলেন যে তাঁহাকে খাট হইতে নামাইয়া নীচের বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়া হউক। আজ্ঞা অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল। তখন তিনি যথারীতি সংকল্প করিয়া স্বহস্তে দুইলক্ষ টাকা দান করিলেন। তৎপরে পুনরায় যখন দত্তক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল, তখন মহারাজ অস্থায়ী পলিটিকেল এজেন্ট ডাক্তার হেণ্ডলি এবং অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারী এবং উপস্থিত সর্দ্দারদিগের সমক্ষে ইসরদার কুমার কায়েমসিংহের নাম করিলেন। কর্ণেল হেণ্ডলি তৎক্ষণাৎ কাগজে ইহা লিখিয়া লইয়া উপস্থিত সকলের দস্তখত করাইয়া লইলেন। তারপর অষ্টমহাদান সম্পন্ন করা হইল। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় মহারাজ অন্যের সাহায্য ব্যতীত উঠিয়া পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। রাত্রি ১২টার সময় তৎকালের দেশীয় রাজন্যবর্গের আদর্শ-স্বরূপ মহারাজ রামসিংহ যোগীর ন্যায় স্বর্গারোহণ করিলেন।

রাত্রিতে আর অন্দর-মহলে কাহাকেও কোন সংবাদ দেওয়া হইল না। প্রত্যুষে

মহারাণীদিগের নিকট বিশ্বস্ত দাসী ও খোজা পাঠাইয়া এই দুঃসংবাদ প্রকাশ করা হইল। ক্রমে সমস্ত সহরময় এ সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল—নগরে হাহাকার উঠিল। প্রাতে স্বর্গীয় মহারাজের দেহ "গেটোরে"* লইয়া যাওয়া হইল—সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত প্রধান, অপ্রধান সর্দ্দার, রাজ-কর্ম্মচারী এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ। পশ্চাতে সমগ্র সহরবাসী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে—নগর জনশূন্য। রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম্ম, আনন্দ উৎসব বন্ধ হইয়া গেল।

কুমার কায়েমসিংহকে আনিবার জন্য টোঙ্কে লোক পাঠান হইল। এদিকে স্বর্গীয় মহারাজের মাতৃগণ ও মহারাণীদিগের দ্বারায় কুমারকে দত্তকগ্রহণের কাগজে দস্তখত করান হইল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় কুমার কায়েমসিংহ তাঁহার শিক্ষক বুধসিংহ সহ জয়পুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। মহারাজ রামসিংহের শ্যালক যোধপুরের রাজভ্রাতা মহারাজ স্যার প্রতাপসিংহ পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন—কুমারকে তাঁহার নিকট রাখা হইল।

মহারাজ রামসিংহের স্বর্গারোহণ-সংবাদ ও কুমার কায়েমসিংহকে দত্তকগ্রহণ সংবাদ পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট তার যোগে দেওয়া হইয়াছিল—ইতি মধ্যে তাহার ও উত্তর আসিল যে গভর্ণমেণ্টের রাজপুতানাস্থিত প্রতিনিধি (Agent to the Governor-General for Rajputana) স্বয়ং আসিয়া কুমার কায়েমসিংহের অভিষেকে যোগদান করিবেন। স্থির হইল যে তিনি মহারাজ সবাই মাধোসিংহ নাম গ্রহণ করিবেন।

কুমার যথারীতি স্বর্গীয় মহারাজের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা করিলেন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার মাতৃদেবী এবং সহধর্ম্মিণীকে জয়পুরে আনার বন্দোবস্ত করা হইল।

স্বর্গীয় মহারাজের শ্রাদ্ধোপলক্ষে দ্বাদশ দিনে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা। জয়পুরের চন্দ্রাতপ-আবৃত বিস্তৃত রাজপথে এবং সুবৃহৎ রাজবাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এবং অন্যান্য মহলে জাতি হিসাবে আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বেলা ১২ টার সময় কেল্লা হইতে তোপধ্বনি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়পুরের লক্ষাধিক নর-নারী একত্রে আহার করিতে বসিল। মন্ত্রী, রাজ-কৌন্সিলের মেম্বর প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিগণ এক এক বিভাগের পরিদর্শক—তাঁহাদের সুব্যবস্থায় বেলা ২ টার মধ্যে এই লক্ষাধিক লোকের ভোজন সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ইহা ব্যতীত সে দিন জয়পুর দিয়া যত ট্রেণ গিয়াছিল, তাহার সমস্ত আরোহিগণ এবং রবাহুত, অনাহুত, প্রজা বা বিদেশী—উপস্থিত সকলকেই ভোজন করান হইল।

সেইদিন বেলা তিনটার সময় কুমার কায়েমসিংহ চন্দ্রমহলে রাজ-পোষাক ধারণ করিয়া সর্দ্দার, অমাত্য এবং রাজ-কর্ম্মচারিগণ বেষ্টিত হইয়া দেওয়ান-ই-খাসে আগমন করিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্যার এড্‌বার্ড ব্রাডফোর্ড (Sir Edward Bradford) দরবারে আসিয়া যথারীতি নবীন মহা-

* সহরের বাহিরে প্রাচীরবেষ্টিত একস্থানে জয়পুরের মৃত মহারাজগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তার পর যেখানে দাহক্রিয়া হয় তাহার উপর ছত্র বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানের নাম "গেটোর।" ইহা জয়পুরের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

রাজের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে, ১৮৮০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মহারাজ সবাই মাধোসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মহারাজ মাধোসিংহ তখন নাবালক বলিয়া Council of Regency নামক মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। রাওল বিজয়সিংহ নামক এক-জন সর্দ্দার মহারাজের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন।

১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসর সংসারচন্দ্র অধ্যাপন-কৃতিত্বে এবং চরিত্রবলে সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তৎকালীন রেসিডেণ্ট ও রাজ-কর্ম্মচারী সকলেই তাঁহাকে সচ্চরিত্র, বিবেচক এবং কর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। তাহার ফলে রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেনন্ এবং স্যার এডবার্ড ব্রাড্‌ফোর্ড-এর পরামর্শমতে মন্ত্রিসভা সংসারচন্দ্রকে নবীন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং সেই বৎসরের বড় দিনে কর্ণেল বেনন্ "বড় দিনের উপহার" বলিয়া সংসারচন্দ্রকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিলেন। (ক্রমশঃ)

সৌন্দর্য্য

সেদিন কথোপকথনের মধ্যে * * মহাশয় বলিলেন "আমাদের দেশে দিন দিন দুধ দই কমে যাচ্ছে; লোকে যতই কোন খাদ্যাদি না পাইতেছে, ততই তাহারা গাদা গাদা সাবান মুখে মাখিতেছে।" তিনি যদি স্পেন্‌সার না পড়িয়া থাকেন এবং তাহার যদি originalityর (নূতন তথ্যের আবিষ্কারকের) অভিমান থাকে, তাহা হইলে তিনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে স্পেন্‌সারও ঠিক ঐ কথাটাই বলিয়া গিয়াছেন। এ সংসারে লোকে আসল প্রয়োজনীয় জিনিষটা অপেক্ষা যে সকল জিনিষ অলঙ্কার-ভাবে প্রয়োজনীয় তাহাদিগকেই অধিক মান্য করিয়া থাকে। *

সৌন্দর্য্যের নশ্বরতা সম্বন্ধে জ্ঞানিগণ যতই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করুন না কেন, পৃথিবীর সাধারণ লোকে তাহাতে কোন কালেই বিশেষরূপ আস্থা প্রদর্শন করে নাই এবং কোনও কালে করিবে কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। মানুষের এই দুর্ব্বলতার জন্য পৃথিবীতে পমেড প্রভৃতি সৌন্দর্য্য-পদার্থের এত আদর। সভ্যদেশসমূহে সৌন্দর্য্যের বিশেষজ্ঞেরও (Beauty specialist) যথেষ্ট খাতির। এ দেশেও তাহার আবির্ভাবের বেশী দেরী আছে, তাহা বোধ হয় না।

অঙ্গহীনের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিপক্ষে বর্ত্তমান যুগের শিল্প ও বিজ্ঞান অনেক করিয়াছে। কাণার নষ্ট চক্ষুতে এমন বেমালুম কৃত্রিম চক্ষু বসান যায় যে তাহা দেখিলে অকৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। কৃত্রিম-দন্তের কথা সকলেরই জানা আছে। কৃত্রিম পা ও চুল প্রভৃতির দ্বারা লোককে বেমালুম সাজান যাইতে পারে।

* Spencer's Education, Chap. I.

তদ্ব্যতীত স্বাভাবিক অঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। মোটা নাককে যন্ত্র দ্বারা বাঁকাইয়া সরু ও লম্বা করা হইয়াছে। চামড়াও এক ব্যক্তির অঙ্গ হইতে অন্য ব্যক্তির অঙ্গে বসান যাইতে পারে।

তবুও কোনও ব্যক্তির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বেশী বৃদ্ধি করিবার উপায় পূর্ব্বের অপেক্ষা যে অধিক ভাল হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। সাবানের বিজ্ঞাপন যতই চটকদার হউক, উহা কালো ব্যক্তিকে ফর্সা করিতে পারে না। কলপ, পমেড প্রভৃতি অধিকাংশই অনিষ্টকর পদার্থে প্রস্তুত। বর্ণ-হীন ও গন্ধহীন কেরোসিন তৈলের প্রতি-দ্বন্দ্বিতার বাজারে নারিকেল তৈল পাওয়া ভার। প্যারাফিন তৈল অত্যন্ত সস্তা হওয়ায় উহা বর্ণহীন নারিকেল তৈল বলিয়া বিক্রীত হইতেছে এবং বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ গন্ধতৈল উহার দ্বারা প্রস্তুত। নারিকেল তৈলের যে পুষ্টিকারিতা আছে, উহার তাহা কিছুই নাই। তবে উহা অধিকাংশ স্থলেই অধিক অপকারী নহে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শের যে বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে, তাহা বোধ হয় না। চুল মাথার পশ্চাদ্‌ভাগে খুব বেশীই থাক, কিম্বা নাই থাক, তাহাতে আসল সৌন্দর্য্যের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। গহনার ও পোষাকের চাকচিক্য কদাকার ব্যক্তির কুৎসিতত্বকে আরও পরিস্ফুট করে মাত্র। আসল সুন্দরের সৌন্দর্য্যকে সাজ-পোষাকের জৌলুসে আরও একটু ভাল দেখাইতে পারে বটে। বর্ণের আদর্শ সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক মতের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভারতের দুই মহাকবি শ্যাম বর্ণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ; কিন্তু আমরা এক্ষণে গৌরবর্ণেরই পক্ষপাতী। তবে সৌন্দর্য্যের অন্য আদর্শের বিশেষ পার্থক্য হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে এক সুন্দরের বর্ণনা এইরূপঃ—

তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ-
করোরুবাহ্বংসকপোলগাত্রং।
চার্ব্বায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণ-
সুভ্র্বাননং কম্বুসুজাত কণ্ঠং ॥ ১।১৯।২৪ ॥
নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষ-
সমাবর্ত্তনাভিং বলিবল্গূদরঞ্চ।
দিগম্বরং চক্রবিকীর্ণকেশং
প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভং ॥ ২৫ ॥
শ্যামং সদাপীব্যবয়োঙ্গলক্ষ্যা
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন।

* * * *

"তাহাকে ষোড়শবর্ষ বয়স্কের মত দেখিতে। তাহার চরণ, কর, ঊরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল ও গাত্রাবয়ব অতি সুকুমার; আকর্ণায়ত লোচন, সুদীর্ঘ নাসিকা, সুন্দর কর্ণদ্বয়, সুন্দর ভ্রূযুক্ত তাহার আনন। তাহার রেখাত্রয়াঙ্কিত কণ্ঠদেশ সুন্দর। তাহার কণ্ঠদেশের অধোভাগস্থ অস্থিদ্বয় মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত। বক্ষঃস্থল অতি বিস্তীর্ণ ও উন্নত। নাভিস্থল আবর্ত্তের ন্যায় গভীর ও মনোহর। তাহার উদর ঈষদ্বক্র তিনটী রেখাযুক্ত সুন্দর। তাহার বাহুযুগল দীর্ঘ, দেহ উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট এবং মুখ হাস্যময়। * ইত্যাদি—

* ভাগবতোক্ত শুকদেবের বর্ণনা ভারতবর্ষের নূতন শিল্পকলার বিশেষ সমর্থন করে। শুকদেবের উদরে

সুন্দর বর্ণ, নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতির সামঞ্জস্য ও সুগঠন প্রাপ্তি মানুষের নিজের ইচ্ছায় হয় না। কিন্তু শরীরের সৌকুমার্য্য সাধন অনেকটা নিজের চেষ্টায় হইতে পারে। চরক ও সুশ্রুতের মতে সূর্য্যতাপে অতিরিক্ত পরিশ্রম বর্ণের পক্ষে অনিষ্টকর। এ কথার যাথার্থ্যও আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। শরীরের সৌকুমার্য্যের পক্ষে অতিস্থূলত্ব এবং অতিকৃশত্ব হানিকর। অতএব এজন্য অতি স্থূলকে তাহার স্থূলত্ব কমাইতে হইবে এবং অতিকৃশকে স্থূল হইতে হইবে। চেষ্টার দ্বারা এই উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে। অতি স্থূল ব্যক্তি উপবাস, কঠোর পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের দ্বারা কৃশত্ব পাইতে পারে। * এই গ্রীষ্মের দিনে স্থূলকলেবর ব্যক্তিগণের পক্ষে অধিক পরিশ্রম করা প্রায়ই হইয়া উঠে না। পরিশ্রম করিতে এত কষ্ট হয় যে তাহারা আদৌ কোনও রূপ শ্রম করে না। অথচ গ্রীষ্মকালই স্থূলতা বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ। আমার বিবেচনায় স্থূলকলেবর ব্যক্তিগণের পক্ষে স্থৌল্যনিবারণের জন্য সন্তরণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। উহাতে দেহ শীতল জলের সংস্পর্শে থাকে বলিয়া পরিশ্রমজনিত কষ্ট অধিক বোধ হয় না।

কৃশদিগকে স্থূল করিবার পক্ষে প্রচুর আহার, অল্প ব্যায়াম, ইন্দ্রিয় সংযম ও সুনিদ্রা উত্তম ব্যবস্থা। শরীরের যাহাতে ক্ষয় হয় তাহাই রোধ করিতে হইবে। †

ব্যায়াম শরীরকে সুন্দর করিবার এক শ্রেষ্ঠ উপায়। অবশ্য অত্যধিক পরিশ্রমে শরীরের আবার ক্ষতি হয়। ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গের গঠন যথাযথরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নৃত্য এক উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ভুঁড়ি কমা-

তিনটী পাঁজ ছিল, উহাতে প্রমাণ হয় তাঁহার ভুঁড়ি ছিল না। নাভির বর্ণনাও ইহার পোষকতা করে। তাঁহার গলার হাড় (collar bone) প্রকাশিত ছিল, ইহাতে প্রমাণ হয় তিনি রোগা ছিলেন না। অতএব যোগী ঋষিগণের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় তাঁহাদিগকে শুষ্ক কাষ্ঠের মত করিয়া চিত্রিত করা সমীচীন বোধ হয় না। শুকদেবের মত যাঁহারা অল্প বয়সেই যোগসিদ্ধ, তাঁহারা এবং দেবগণ ষোড়শবর্ষ বয়স্কের মত চিরযৌবনসম্পন্ন। যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত নাহেন এবং তাঁহার ভুঁড়ি থাকিতে পারে না। তবে রজতগিরি উপমা হইতে তিনি যে প্রকাণ্ডকায় ছিলেন তাহা বলা যায়। প্রাচীন গুহা ও মন্দিরে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলিকে বর্ত্তমান কালের শিল্পের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করায় একটা বিপদ্ আছে। মন্দির-গুহার ভিতরের আলোক অতি অল্প। প্রাচীন শিল্পিগণ সেই আলোকের সাহায্যে তাঁদের মূর্ত্তি কেমন দেখাইবে, তাহা ভাবিয়া অনেক মূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন গুণকে অতিরিক্ত ভাবে দেখাইয়াছেন। হাত-পা একটু বেশী লম্বা করিতে হইয়াছে, কটী একটু বেশী ক্ষীণ করিতে হইয়াছে, ইত্যাদি। উজ্জ্বল আলোকে যে সকল চিত্র দেখা যায়, সে গুলিকে ক্ষীণ আলোকে যাহাদের দেখা হইত তাহাদের আদর্শে গড়িলে অনেকটা বেখাপ বে দেখাইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* প্রজাগরং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাভিপ্রবর্দ্ধয়েৎ॥
১৬।২১ অ, সূত্রস্থান, চরক।

"Less food and more exercise, and specially the latter is the one and only remedy for fat people."—Recent Advances in Physiology, p. 310.

† "Fat may be put on (1) by increased food, (2) by lessened expenditure of energy, (3) by these two causes acting together."—Recent Advances in Physiology, p. 306.

হইবার পক্ষেও উহা পরম প্রয়োজনীয়। চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের সঙ্কীর্ত্তন কালীন নৃত্যের দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য সাতিশয় বিকশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালের সভ্য-দেশসমূহের অধিকাংশ নরনারীই নৃত্য করিতে শিখেন। ইংরাজদিগের বল-নাচ একটী দৃষ্টান্ত। আমাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাচীনকালের ব্রত ও গৃহকর্ম্মাদিতে যে সকল পরিশ্রম করিতে হইত তাহা বিসর্জ্জন করিতেছেন, অথচ কোন প্রকার ব্যায়াম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কাজেই তাঁহাদের শরীরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাড়াইতেছে।

দুশ্চিন্তা সৌন্দর্য্যের এক প্রধান ক্ষতি-কারক। উহাতে শীঘ্র লোককে বৃদ্ধ করিয়া ফেলে। এক ফরাসী অভিনেত্রী বহুকাল নিজের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। তাহার কৃতকার্য্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত যে, 'আমি মনোমধ্যে দুশ্চিন্তাকে স্থান দিই না; তাহাই আমার সৌন্দর্য্য অটুট রাখিবার প্রধান কারণ।' ঈশ্বরবিশ্বাসী বা অদৃষ্টবিশ্বাসীর এইখানে একটা বিশেষ সুবিধা আছে। ঈশ্বর বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তাহার অনেক দুশ্চিন্তার বোঝা কমিয়া যায়। ভারতবর্ষে যদি অদৃষ্ট না থাকিত, তবে এখানে আত্মহত্যার সংখ্যা কতই না বেশী হইত? *

এ পর্য্যন্ত আমরা শুধু শারীরিক সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণ করিতে পারে না। মানসিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের অভাবে উহা একেবারেই দাঁড়াইতে পারে না। এমন কত দেখা যায় শারীরিক গঠন, নাক, মুখ, চোখ আদি সকলই নিখুঁত, কিন্তু হয়ত কেমন একটা নির্ব্বুদ্ধিতা মুখখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হয়ত উহাতে কেমন একটা নৃশংসতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির ভাব রহিয়াছে, যাহাতে উহা লোককে আকর্ষণ করা দূরে থাকুক, বিপ্রকর্ষণই করিয়া থাকে। অবিনয়, গর্ব্ব বা সৌন্দর্য্যের অভিমান অনেকের সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করিয়াছে। সরলতা, সহানু-ভূতি, বিনয় প্রভৃতি গুণ লোককে এমন জোরে আকর্ষণ করে যে, যাহাদের ঐ সকল গুণ স্বভাবতঃই নাই, তাহারা অন্ততঃ উহার ভাণও করে। আমি এক সুশিক্ষিতা ইউরোপীয় মহিলাকে দেখিয়াছিলাম, তিনি এক অল্পবুদ্ধি লোকের কতকগুলি অতি সাধারণ গল্পকে এমনভাবে শুনিতেছিলেন, যেন তিনি সেরূপ জিনিস জীবনে কখনও শুনেন নাই। তাঁহার এ বিনয় তাঁহাকে বড় মানাইয়াছিল।

মানসিক বা অন্যান্য সদ্‌গুণ অনেক রূপ-হীনকেও সুরূপে পরিণত করে। এ কথা বোধ হয় অনেকেই নিজ নিজ জীবনে অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমার একটা অনুভূতির কথা বলিতেছি। সে একজন বক্তার বক্তৃতা শুনিতেছিলাম। তিনি যে সুন্দর ছিলেন এমন বলা যায় না। কণ্ঠস্বর প্রথম প্রথম বড় কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার হাঁটা যেন বড় প্রকাণ্ড। দাঁতগুলি যেন কোদাল কোদাল। কিন্তু সেই লোক আর খানিকক্ষণ বক্তৃতার পর যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার কণ্ঠস্বর আর কর্কশ নহে, হৃদয়স্পর্শী।

---

* Saleeby's "Worry" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উহা সর্ব্বতোভাবে মনকে আকর্ষণ করিয়াছে—তাহাকে Hypnotise করিয়াছে। নাক, চোখের আয়তন ও সামঞ্জস্য লইয়া তাহার বিচার করিবার চেষ্টাও নাই, সামর্থ্যও নাই, বক্তার সবই তাহার পক্ষে মধুময়।

আমাদের মনের ভাবনাগুলির ছায়া মুখের উপর পড়িয়া থাকে। মুখের কাঠামটা বহুসংখ্যক হাড়ের দ্বারা গঠিত। সেগুলি আবার বহুসংখ্যক মাংশপেশীর দ্বারা ঢাকা। সর্ব্বোপরি ত্বকের আচ্ছাদন। চক্ষুর চারিদিকে অনেকগুলি মাংসপেশী আছে। নাকেও সামান্যসংখ্যক মাংশপেশী আছে। গালে, ঠোটে, দাড়িতে, চোয়ালের উপর ও অধোভাগে বহুসংখ্যক মাংশপেশী আছে। এই গুলি হইতেই মুখের ভাব প্রস্তুত হয়। মনে যেরূপ সব ভাবনা হয়, তদনুসারে ঐ সকল মাংসপেশীর কতকগুলি আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়। ঐ সকলের আকুঞ্চন বা প্রসারণ সাধারণ লোকের স্ববশানুযায়ী (voluntary control) নহে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি (প্রায় রাজনীতিজ্ঞগণ) তীব্র ইচ্ছাশক্তির বশে উহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন। তাঁহাদের মনের ভিতর ঝড় বহিয়া গেলেও মুখে তাহার কিছু প্রকাশ নাই, অথবা যাহা আছে, তাহা অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারে না। মুখের মাংসপেশীগুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণের ফলে মুখের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চামড়াও ভিন্নভাবে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। একই ভাবে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া চামড়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানাবিধ দাগ পড়িয়া থাকে। এই সকল দাগ দেখিয়া বুদ্ধিমান্ লোকে কাহার কিরূপ চরিত্র, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন। কোন লোকের কোন বিধ চরিত্র বদ্ধমূল হইবার পর অর্থাৎ পরিণত বয়সে ঐ সকল দাগগুলি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখ দেখিয়া উহাদের মধ্যে কে চিন্তাশীল, কে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত, কোপনস্বভাব, লম্পট, স্বার্থপর, দয়ালু, উদারস্বভাব ইত্যাদি আমরা অনেকটা ঠিক করিয়া বলিতে পারি। *

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে মুখের ভাব বা রেখা সৌন্দর্য্যের এক প্রধান কারণ। যাহার মনে সতত অপকৃষ্ট ভাবনা সকল বিরাজ করে, তাহার মুখের ভাবও ক্রমে ক্রমে কদর্য্য হইয়া উঠে। আর যাহার মনে উৎকৃষ্ট ভাবনা সকল সতত বিরাজ করে, তাহার মুখের ভাবও ক্রমশঃ সুন্দর হইয়া পড়ে।

তবে সকলেই ইচ্ছামাত্রে নিজের মনের ভাবনা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে কি না সন্দেহ। যে লাম্পট্যের চিন্তায় বা হিংসায় সুখ পাইয়াছে, সে তাহা ছাড়িবে কেন? বিষ্ঠার কীটকে যদি বলা যায় "ওহে তুমি ওখানে কি করিতেছ? এখানে আইস, আমরা তোমাকে রসগোল্লা খাইতে দিব" তবে সে বক্তৃতায় কি কোনও ফল হয়?

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই নিজের নিজের ভাবনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তাহাদিগকে নিজ

* The most controlled of us cannot conceal the movements of the facial muscles under the *influence of strong* emotions Thus we read what is passing in a man's mind, and tell his character by the lines of his face.—Leonard Hill's Manual of Physiology, Chap. XXX.

নিজ সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনজন্য গুণসমূহকে ভাবনা করিতে হইবে। গুণ ভাবনার নিয়ম এই :—ভাবিতে হইবে "আমি নির্ভীক আমি ন্যায়পর, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সদ্‌গুণের একটী তালিকা গীতায় দেওয়া আছে; সেটী অতি সুন্দর :—*

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* This eloquent epitome of virtue is alone sufficient to show how little the East has to learn from the West in regard to the essential ideas of religion. We know of no other passage in the sacred books of any religion which more beautifully expresses the union of man's finer qualities.—The Ethics of the great Religion, R. P. A. Extra series, p 30

৺জগদীশনাথ রায়

বঙ্কিম বাবু এবং জগদীশ বাবু এক দিন সিমুলিয়ার বাটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন গরিব ভদ্রলোক আসিয়া রায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি কত দিনে চাকুরিটি পাইতে পারি?" রায় মহাশয় উত্তর করিলেন '৩।৪ দিন পরে আসিলে, তুমি নিয়োগপত্রখানি পাইবে এবং তোমাকে কর্ম্মস্থলে যাইতে হইবে। রেলের পুলিস সাহেব তোমাকে বর্দ্ধমানে কর্ম্ম দিয়াছেন। দেখ, ধর্ম্মপথে থেকে কাজ করো, তুমি আমার লোক, আমায় কোন কথা না শুনিতে হয়।" লোকটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমার বড় অন্যায়, এই মূর্খ লোকগুলাকে কেন চাকুরি দেও।" জগদীশ বলিলেন "লোকটা মূর্খ আমি স্বীকার করি, যদি ওর বিদ্যার জোর থাকিত, তা হলে আমার উপাসনা করিত না, আপনার বিদ্যাবলে চাকুরি পাইত, মূর্খ বলিয়াই আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, এমন লোককে বিদায় করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কত মূর্খ লোক ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পাইবার জন্য বড় বড় সাহেবদের নিয়ত পূজা করিতেছে?" বঙ্কিম নিরুত্তর রহিলেন। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র জগদীশ বাবুর বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া অনেক গরিব লোকের সমাগম দেখিলেন, তখন জগদীশ বাবুকে বলিলেন, "দেখ তুমি যার তার সঙ্গে মিলিত হও, এ ভাল নহে! বাজে লোককে তফাতে রাখিতে হয়।" জগদীশ উত্তর করিলেন ঈশ্বর, তুমি এই রকম পরামর্শ দিতে সাহসী হইলে! ছি, ছি, আপনাকে কি ভাব, এই মনুষ্যগুলির মধ্যে এমন গুণ আছে যে তোমার আমার নাই, ওরা মনুষ্য পশু নহে; তোমার এ রকম দম্ভ থাকা বড়ই দুঃখের কথা। তুমি যা, তারাও তাই; বিভিন্নতা এই, ওরা তোমার মতন ইংরাজি শিক্ষা করে নাই, আর ধরাকে সরা বলিয়া ভাবে না।" ঈশ্বর বাবু বড়ই লজ্জিত হইলেন।

জগদীশ বাবু উচ্চদরের শিকারী ছিলেন। অনেক কুম্ভীর, বন্য মহিষ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি তিনি শিকার করিয়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহার নানা গুণ দেখিয়া তাঁহাকে বড সম্মান করিতেন। এক জন সাহেবের কথা বলি, ইঁহার নাম এ-ডি, ল্যারিমোর, ইনি জেলের ইন্‌স্পেকটাব জেনারেল ছিলেন, ইনি বলিতেন, "ইংবাজ বাঙ্গালী বন্ধুদের ভিতর আমি জগদীশকেই বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতাম, he was nature's nobleman" একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, যে কোন বিষয় হউক না কেন, জগদীশ বাবুকে প্রশ্ন করিলে সদুত্তর পাওয়া যাইত। এই সম্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যখন স্যার রিচার্ড টেমপেল শিল্পপ্রদর্শনী (Art Exhibition) প্রদর্শন করেন, জগদীশ বাবু তাঁহার পুত্র দুইটিকে লইয়া প্রদর্শনী দেখিতে যান, প্রত্যেক ছবি ছেলেদের বুঝাইয়া দিতেছেন, এমন সময় চিফ্ জষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র এবং সরকারী উকিল অন্নদা বাবু প্রদর্শনী দেখিয়া ফিরিতেছিলেন। জগদীশ বাবুকে তাঁহাবা অভিবাদন করিয়া তাঁহার পার্শে দাঁড়াইলেন, জগদীশ বাবু বলিলেন 'অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, ছেলেদের এই ছবিটা বুঝাইয়া দিয়া আপনাদের সঙ্গে কথা কহিব।" ছেলেদের বলিলেন, "দেখ, এ ছবিটা বাইবেল ঘটিত, এডিথ হলো ফারনেসের মুণ্ড ছেদন করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা র‍্যাফেল কর্তৃক অঙ্কিত। দেখ কি সুন্দর প্রাতঃকালীন আলোক এই মুণ্ডের উপর পড়িয়াছে।" তার পর বলিলেন, "এ ছবিখানা স্যালভেটার রোশার ইটি টিসিয়ানের"। এমন করিয়া ছবিগুলি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। রমেশ বাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন "মহাশয়, আমরা অন্ধ হইয়া সব দেখিয়াছি, আপনার সঙ্গে পুনরায় ঘুরিব এবং সকল ব্যাখ্যা শুনিব; কথা কি, আপনাব সংগ্রহকে ধন্য, এ সব বিষয় কেমন কবিয়া জানিলেন?" রমেশ বাবু ও অন্নদা বাবু পুনবায় জগদীশ বাবুব সঙ্গে প্রত্যেক ছবি দেখিলেন ও তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিলেন। জগদীশ বাবু "কলেজ রি-উনিয়ানের" সৃষ্টিকর্তা, রি-উনিয়ান সমগ্র শিক্ষিত লোকের হৃদয়াকর্ষণ কবিয়াছিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানে এবং পরে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার বাগানে রি-উনিয়ান হয় এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায় সকলে যোগদান করেন। একদিন কেশবচন্দ্র সেনকে বলিলেন, 'বাবাজি, টাউনহল্ ব্যতীত এমন একটা স্থান নাই যে আমরা সকলে কোন কার্য্যের জন্য সমবেত হইতে পারি, বাঙ্গালীটোলায় আমাদের একটা স্থান হওয়া আবশ্যক, যেখানে আমরা ইচ্ছামত একত্রিত হইতে পারি। এই কথোপকথনের ফল লাভ হইয়াছিল, কেশব বাবু আলবার্টহল্ করিলেন এবং একটা অত্যাবশ্যকীয় অভাব দূর করিলেন। আর একটা কথা শুনিয়াছিলাম, যাহার ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। জগদীশ বাবু কেশব বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিতেন "বাবাজি, সে বিষয়টা কি করিলে?" কি বিষয়, তাহা জানা নাই, তবে কেশব বাবু উত্তর করিলেন "দেখুন, ওটা হইবার উপায় নাই। তা হইলে কুকাদের মতন আমাকে পা পূজা করিতে দিতে হয়।"

বঙ্কিম বাবুর "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ

করিবার, ইনি একজন প্রধান পরামর্শদাতা এবং বঙ্গদর্শন বাহির হইলে জগদীশ বাবু "সঙ্গীত"-শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন. বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাহলে বঙ্কিম বাবু ইহাঁর নিকট, মাসিকপত্রিকা বাহির করিবার জন্য যে বিশেষ ঋণী, তাহা বলিয়াছেন। মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরকে রাগরাগিণীর এবং নবরসের "ট্যাব্লো-ভিভাণ্ট" দেখাইতে জগদীশবাবু অনুরোধ করেন মহারাজ বাহাদুর তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার রাজভবনে এই সমস্ত ট্যাব্লো দেখান।

আর একটি গল্প বলিয়া তাঁহার বালেশ্বর যাইবার কথা লিখিব। যখন জগদীশ বাবু ২৪ পরগণার স্পেসিয়াল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তখন মেজার পারসনস্ নামধেয় একজন কর্ম্মচারী ঐ জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, পারসনস্ এবং জগদীশ বাবু উভয়ে পুলিশ বোট্ করিয়া বসিরহাট অঞ্চলে তদারকে যান। বোটে একটিমাত্র গোসলখানা ছিল, জগদীশবাবুর স্নান করিতে অধিক বিলম্ব হয় বলিয়া মেজার সাহেব উহাঁকে অগ্রে স্নান সম্পন্ন করিয়া লইতে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। একদিন জগদীশ বাবু মাথায় সাবান মাখিয়া নিজের ভৃত্য নারায়ণকে মস্তকে জল ঢালিয়া দিবার জন্য ডাকিতেছিলেন, দুইবার ডাকার পর উত্তর না পাইয়া উনি বিরক্ত হইয়া "নারাণে, নারাণে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সাহেব তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, জোর করিয়া মেঝেতে পদাঘাতের শব্দ করিলেন। পায়ে বুট ছিল এবং তাহার কাষ্ঠের উপর জোর আঘাতের খুব শব্দ হইল। সাহেব অমনি বলিয়া উঠিলেন "তোমার চাকরকে ডাকিবার প্রয়োজন নাই,আমি কার্য্য সমাধা করিয়াছি।" তখন জগদীশ বাবু চক্ষু দুটি জলে ধুইয়া দেখিলেন, সাহেব একটা বড় গোখ্‌রো সর্পকে পদদলিত করিতেছেন, তখন জানিলেন সাপটি জগদীশ বাবুর পার্শ্বে দুলিতেছিল, তাঁহার হস্ত ঘুরিতেছিল, সর্পটিও দুলিতেছিল, হস্ত চাপ না থামিলেই আঘাত করিত। সর্প খেলাইবার সময় যতক্ষণ হাঁটু নাড়ে ততক্ষণ দোলে, হাঁটু চালান থামিলেই আঘাত করে, এও তাই হইয়াছিল. সাহেবের হাঁটুপর্য্যন্ত পরা বুট ছিল, সুতরাং গোসল ঘরে আসিয়াই উহার মস্তকে বুটের আঘাত করিয়া উহাকে পদদলিত করিতেছিলেন, হাসিয়া বলিলেন "এই জন্য ত চাকরকে ডাকিতেছিলে?" উনি উত্তর করিলেন—"না, আমার মস্তকে জল ঢালিবার জন্য ডাকিতেছিলাম।" যদি সাহেব না যাইয়া, চাকরটা যাইত এবং কোন ভয়সূচকধ্বনি করিত, তাহা হইলে সর্পটা নিশ্চয়ই জগদীশ বাবুকে আঘাত করিত। ভগবান্ যখন রক্ষা করেন, কি সুন্দর উপায়ে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করেন! ধন্য তাঁহার নাম, ধন্য তাঁহার দয়া!

ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার জগদীশ বাবু একজন সদস্য ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল ইঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অনেক কার্য্য করিতেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিমহাত্মারা ইঁহাকে বহু সম্মানের

চক্ষে দেখিতেন এবং অনেক বিষয়েই ইঁহার পরামর্শ লইতেন। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল; রামগোপাল বাবু এবং তাঁহার হাউসের অংশীদার উমেশচন্দ্র মিত্র এবং মাধব মিত্র সিমুলিয়ার বাটীতে সর্ব্বদা আসিতেন। গবর্ণমেণ্টও অনেক বিষয়ে ইঁহার পরামর্শ লইতেন। বিখ্যাত সিভিলিয়ান মন্‌বো সাহেব ইঁহার পরামর্শমত পুলিশবিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্যার সিসিল বিডন ইঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন "দেখ জগদীশ, তোমরা কেন কার্ডে বাবু লিখ না? তোমরাই প্রকৃত বাবু? কারণ গবর্ণমেণ্ট ও উপাধি গ্রাহ্য করেন, সুতরাং তোমরা এখন কার্ডে বাবু লিখিবে। জগদীশবাবু হাস্য করিয়া বলিলেন "সাহেব, এইবার হইতে আমাদের একটি ল্যাজ করিতে বল, সেটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" বিডন্‌সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন "দেখ, আমার রহস্য তুমি ভেদ করিয়াছ, কিন্তু একজন বড় ঘরের ছেলে, ইনি ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, ইনি আমার বাক্যের ভাবার্থ না বুঝিয়া অতঃপর কার্ডে বাবু লিখিবেন স্বীকার করিয়া গেলেন সকল লেফ্‌টনাণ্ট গবরণর ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু বিডন্, গ্রে ও ইডেন ইহাঁকে বড়ই মান্য করিতেন, ইডেন সাহেবের সময় জগদীশবাবু পেন্‌সান লইয়া অবসর গ্রহণ করেন, ইডেন সাহেব উঁহাকে সারভিসে রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করেন। বলিয়াছিলেন "তোমাকে আমি হাবড়া জেলায় দিব, পরে কলিকাতাতেও আনিতে পারি, তুমি অবসর লইও না।" জগদীশ বাবু বলেন "আপনাদের কৃপাতেই এই ৩০ বৎসর চাকুরি করিলাম, আর সাজ পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয় না।" ইডেন সাহেবের আমলে কিছুদিনের জন্য ইনি ত্রিপুরা জেলার পুলিশের ভার পান। ত্রিপুরা থাকিবার কালীন এক ঘটনা হইল, ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত নদীতে প্রত্যহই ডাকাতি হইতে লাগিল, স্থানীয় পুলিশের কর্ত্তারা বদ্‌মায়েসদের আটকাইয়া রাখিলেন, কিন্তু ডাকাতি কোন-মতে বন্ধ হইল না, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব বাগান্বিত হইয়া মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলই হয় না। একদিন ত্রিপুরা জেলার জজ গেভিস্ সাহেবকে জগদীশ বাবু বলিলেন "দেখুন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—কাহারা ডাকাতি করিতেছে, শীঘ্র তাহাদের গ্রেপ্তার করিব।" গেভিস্ সাহেব বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন, জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "তুমি জজ, তোমার নিকট বিচার হইবে, তোমাকে অধিক কিছু বলিব না।" এই কথোপকথনের পর জনৈক ইনস্‌পেক্টারকে ডাকাইয়া জগদীশবাবু বলিলেন 'তোমার নৌকায় চারিটি দাঁড় আছে, তুমি আর চারিটি বসাইয়া লও, তৎপরে ঢাকায় গিয়া যখন সরকারী মেল-বোট ছাড়িবে, তুমি তাহার পিছন নিবে, আমার বিশ্বাস ইহারাই ডাকাতি করে এবং আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুমি ইহাদের ডাকাতি করিতে দেখিয়া হাতে নাতে ধরিতে পারিবে। এখন যাও, যাহা বলিলাম তাহা কর।" বড় দারোগাবাবু হাসিয়া আমাদের বাহিরে আসিয়া বলিলেন "পুলিশ সাহেব ভুল বুঝিয়া-ছেন, সরকারী লোকে কি ডাকাতি করিতে পারে। যাহা হউক, আমায় হুকুম তামিল করিতে হইবে, আমি চলিলাম।" সত্য সত্যই

দিনকয়েক পরে যেন বোটওয়ালারা একখানা কাপড়ের নৌকা লুট করিতেছে, এমন সময়, বড় দারোগা সেখানে পৌঁছিয়া উহাদের গ্রেপ্তার করিলেন। সব সাজা পাইল, হৈ চৈ পড়িয়া গেল, ইডেন সাহেব জগদীশবাবুকে *ধন্যবাদ-লিপি পাঠাইলেন* বালেশ্বর পুলিশের ভার যখন জগদীশ বাবু লয়েন তখন সাল-তমামি রিপোর্ট লিখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছিল, ইনি কোর্ট ইন্‌স্পেক্টারকে সমস্ত আঞ্জাম করিতে বলিলেন। কোর্টবাবু বলিলেন, কলেক্টার বীমস সাহেব, বাৎসরিক পুলিশ রিপোর্ট লিখিবেন বলিয়াছেন। জগদীশবাবু বলিলেন "তিনি দশখানা লিখুন তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমার কর্ত্তব্য আমি *সাধন করিব। সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া* আমার হুকুম তামিল কর।" কোর্টবাবু সমস্ত কাগজ দাখিল করিলেন, জগদীশবাবু রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইবার হুকুম দিলেন। এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে জগদীশ বাবু ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবার পূর্ব্বে ৫২টা জিলা হইতে ৫২ রকম বাৎসরিক রিপোর্ট আসিত, ইনি ১৮৬৮ সালে যেমত রিপোর্ট পাঠাইলেন, সেই মত আদর্শ হইয়া রিপোর্ট লিখিবার সারকুলার জারি হইল। বীমস্ সাহেব মফঃস্বলে ছিলেন, বালেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কোর্টবাবুর নিকট কাগজপত্র চাহিলেন। কোর্টবাবু বলিলেন পুলিশ সাহেব রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আগ্রহের সহিত রিপোর্ট দেখিতে চাহিলেন, রিপোর্ট ২।৩ বার পড়িলেন, তখন বলিয়া উঠিলেন "আমি কি ভুলই করিতে বসিয়াছিলাম! ইনি এমন সুলেখক, তাহা আমি জানি না। আমি এখনই গিয়া আলাপ করিব এবং নিজের ভুল বুঝাইয়া দিয়া মাপ চাহিব।" যেমত বলা, সেইমত করা; তখনই জগদীশবাবুর আফিস কামড়ায় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমাকে মার্জ্জনা করুন, আপনি যে একজন উচ্চদরের স্কলার তাহা আমি জানিতাম না, ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট দল যেমন হন, আমি আপনাকে সেইমত শিক্ষা প্রাপ্ত ভাবিয়াছিলাম, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; আপনার বাৎসরিক রিপোর্ট অদ্যই মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়া দিব।" সেই পর্য্যন্ত বীমস সাহেব জগদীশবাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু করিতেন না এমন কি লেখাপড়ার *সম্বন্ধে ইহাঁর সহায়তা গ্রহণ করিতেন।* বোম্বায়ের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী মাসিকপত্রে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ফুট নোটে লিখিয়া দিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে তত্ত্ব, তাহার জন্য তিনি জগদীশবাবুর নিকট ঋণী। তিনি যে কম্পারেটিভ গ্রামার লেখেন, তাহাতেও জগদীশবাবুর নিকট সহায়তা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যা সম্বন্ধে কোন পুস্তক, কোন সাহেব *কৃত বলিয়া সমাজে প্রকাশ, কিন্তু জগদীশ* বাবুর ইহাতেও হাত ছিল। গল্পচ্ছলে বালেশ্বরের পোষ্টমাষ্টার প্রফুল্লবাবু (যিনি পরে ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারল হন) বাবুকে রামায়ণের কথা বলেন, তিনি তাহা প্রত্যহ শুনিয়া এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বাল্মীকি এবং তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত Valmiki and his times বলিয়া বাঙ্গালায় এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থখানি জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তমলুকের ইতিহাস একজন অধিকারিবংশীয় যুবক লেখেন, তিনিও পুস্তকখানি জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। "তারাসুন্দরী" নামক একটি গল্পের পুস্তক তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন এবং পুস্তকখানি জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থ "বিষবৃক্ষ" জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন—

কাব্যপ্রিয়

পুণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায়

সুহৃদ্‌বরকে

…হ বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।

বঙ্গদর্শন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

অবতরণিকা

বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বলেন। বিশাল বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া মানুষের অন্তরে যে সকল গভীর ও জটিল জিজ্ঞাসার উদয় হয়,—যে সত্যে বা সিদ্ধান্তে তাহার চরম মীমাংসা ও নিবৃত্তি হয়, তাহারই নাম তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুভূতিগ্রাহ্য, জ্ঞানগম্য—জ্ঞানবস্তু,—কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এ বস্তুকে ধরিতে পারা যায় না। যে সত্যেতে বিশ্বজিজ্ঞাসার এবং বিশ্ববাসনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি ও শান্তি হয়, তাহাই পরম-তত্ত্ব। বৈষ্ণবেরা বলেন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমতত্ত্ব।

ভাগবত অদ্বয়-জ্ঞানকে তত্ত্বনামে অভিহিত করিয়াছেন।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং

ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে।

উপনিষদ্ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, যোগিজনেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন, ভাগবতেরা যাঁহাকে ভগবান্ বলেন, সেই অদ্বয়জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্বজ্ঞানিগণ তত্ত্ব-নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই ভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ।

আমরা সচরাচর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন নামেতেই জগতের ইষ্টদেবতাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই তিন শব্দের মধ্যে যে বিশাল বিভেদ আছে, ইহা তলাইয়া দেখি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম শব্দে তত্ত্ববস্তুর একদিক্‌মাত্র ব্যক্ত করে। পরমাত্মা শব্দে তার আর একদিক্‌মাত্র নির্দ্দেশ করে। আর বৈষ্ণবেরা বলেন যে ভগবান্ই কেবল এই সমগ্র তত্ত্ব-বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবান্ই পূর্ণতত্ত্ব। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা সেই পূর্ণতত্ত্বের অংশকলা মাত্র।

আধুনিক বাংলাভাষাতে, ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের প্রভাবে, ব্রহ্মশব্দ একটা ব্যাপক ও অভিনব অর্থ লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মকে ভগবান্ বলিয়াও ডাকেন, পরমাত্মাও বলিয়া থাকেন। আর মূলে বস্তু যখন এক ও অদ্বয়, তখন তার ভিন্ন ভিন্ন নাম সমভাবে এবং যুগপৎই সে অদ্বয়বস্তুতে প্রযুক্তও হইতে পারে। বৈষ্ণবেরাও এরূপ করিয়াছেন। যিনি সকল নামরূপের অতীত, তাঁহাকে যে কোনও নামেই ডাকি না কেন, মনের ভাব ও অন্তরের রসটা যদি খাঁটি থাকে, তাহাতে বড় বেশী কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু তথাপি এই সকল নামের উৎপত্তির ও ইতি-

হাসের আলোচনা করিলে, পরস্পরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ প্রত্যক্ষ করা যায়।

ব্রহ্ম শব্দ উপনিষদের; আর উপনিষদে তার একটা বিশেষ অর্থও আছে। সে অর্থের সঙ্গে ভগবানের অর্থের আকাশপাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। পরমাত্মা সম্বন্ধেও সেই কথা। যে আন্তরিক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ব্রহ্মভাব বা পরমাত্মভাব বা ভগবদ্ভাব প্রথমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই অর্থে, ব্রহ্ম বলিতে যাহা বোঝায়, পরমাত্মা বলিতে তাহা বোঝায় না; পরমাত্মা বলিতে যাহা বোঝায়, ভগবান্ বলিতে তার চাইতে বিস্তর বেশী বুঝাইয়া থাকে।

উপনিষদের সার নিষ্কাশিত করিয়া, বেদান্তসূত্র জগতের জন্ম-আদি যাহা হইতে হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। উপনিষদ্ ভৃগুবারুণী-সংবাদে ব্রহ্ম-শব্দের এই সংজ্ঞাই দিয়াছেন। বরুণপুত্র ভৃগু সর্ব্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া, সর্ব্বশেষে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য, আপনার পিতার নিকটে যাইয়া বলিলেন—হে ভগবন! আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করুন। বরুণ বলিলেন—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে চেষ্টা কর। তপস্যা অর্থে ধ্যান, গভীরভাবে মনন ও নিদিধ্যাসন। কিন্তু শূন্যকে ধ্যান করিয়া বস্তু-লাভ করা যায় না। ধ্যানেরও মন্ত্র বা সূত্রের প্রয়োজন হয়। বরুণ ভৃগুকে ব্রহ্মধ্যানের এই মন্ত্র দান করিলেন:—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব,
তদ্ব্রহ্ম।

যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা ভূত সকল স্থিতি করে, যাহার প্রতি ভূত সকল গমন করে এবং যাহাতে অন্তিমে প্রবেশ করে, তাহাই ব্রহ্ম। তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর।

উপনিষদ্ এখানে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহা হইতে হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আর উপনিষদ্ এখানে পরমতত্ত্বকে বাহির হইতেই দেখিয়াছেন। কার্য্য দেখিয়া, সেই কার্য্যের যে একটা অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে, সেই কারণকে, তার নিজের স্বরূপে নয়, কিন্তু শুদ্ধ এই কার্য্যের কর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ফলতঃ আধুনিক অজ্ঞেয়তা-বাদ বা agnosticism যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে এবং যাহাকে অজ্ঞাত (unknown) এবং জ্ঞানাতীত (unknowable) বলে, উপনিষদ্ ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সেই তত্ত্বকেই এখানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই তত্ত্ব শুদ্ধ সত্তামাত্রজ্ঞেয়; "আছেন" এইমাত্র বলা যায়; কিন্তু স্বরূপতঃ ইহা বস্তু যে কি, তাহা বলা যায় না। এই ব্রহ্ম-বস্তুকে ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না। সূর্য্যের তেজমাত্র যেমন আমরা চর্ম্মচক্ষু দিয়া দেখি, কিন্তু স্বরূপতঃ সূর্য্য-বস্তু যে কি, ইহা দেখিতে পাই না ও পারি না; সেইরূপ ব্রহ্ম বলিয়া উপনিষদ্ যে তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, আমরা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা তাহার বাহিরের আভামাত্রই অতি দূর হইতে প্রত্যক্ষ করি, স্বরূপতঃ সে তত্ত্ববস্তু যে কি, তাহা ধরিতে পারি না। এ বস্তুর অনুমান করিতে পারা যায়। ক্রিয়া দেখিয়া কর্ত্তার স্বরূপ ও প্রকৃতির কতকটা অনুমান করা যেমন সম্ভব, সেইরূপ এই ব্রহ্মবস্তুরও প্রকৃতির এবং স্বরূপের

কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া লইতে পারি, কিন্তু তার ধারণা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। এমন কি, এই তত্ত্ব সৎ কি অসৎ, ইহাও দৃঢ় করিয়া বলা যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া, জগৎরূপ কার্য্যের যে কারণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহাই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব। এই তত্ত্ব নির্গুণ ও নিরাকার।

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের বিচার মনের ধর্ম্ম। মন ভেদ-বিচারেই পটু, অভেদ প্রতিষ্ঠা করা তার অধিকারের বাহিরের কথা। "হাঁ" ও "না" এই দুই সংজ্ঞার ভিতরে মন সর্ব্বদা চলাফেরা করে। সমতা ও বৈষম্য—identity এবং difference—এই দুইটীই মনের মুখ্য তত্ত্ব। যাহা কার্য্য তাহা কারণ নয়, যাহা কারণ তাহা কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্,—মন এই কথাই কেবল ধারণা করিতে পারে। কার্য্য দৃষ্ট, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, সাকার সবিশেষ। সুতরাং কারণ অদৃষ্ট, ইন্দ্রিয়াতীত, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। মন এইটুকু পর্য্যন্ত বুঝিতে ও ধরিতে পারে। সৃষ্টি—কার্য্য; সৃষ্টি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণ সৃষ্টিকার্য্যে পরিব্যক্ত ও পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্রষ্টা—এই কার্য্যের কারণ, এই সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন, পৃথক্; সুতরাং তিনি নির্গুণ ও নিরাকার। মন এই সিদ্ধান্ত পর্য্যন্তই পৌঁছিতে পারে। এর উপরে উঠিবার তার শক্তি নাই। ব্রহ্ম-বস্তুকে এইজন্য মন কেবল "নেতি" "নেতি" বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত করে। তত্ত্ববস্তু "ইহা নহে" "উহা নহে"—মন এই মাত্রই বলিতে পারে, সে বস্তুটা স্বরূপতঃ যে কি, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। নিরাকারবাদ ও নির্গুণবাদ প্রকৃতপক্ষে কেবল মনোময় কোষেরই কথা। যতক্ষণ না মনোময় কোষ ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ মানুষ নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা মনকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন;—"মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ।" এই ব্রহ্ম মনোময় ব্রহ্ম, মানস-সৃষ্ট। আর আমাদের মন বস্তুর অংশ মাত্র গ্রহণ করে। এবং এইজন্যই বৈষ্ণবেরা এই মানস-ব্রহ্মবস্তুকে পরমতত্ত্বের "অঙ্গ-আভা মাত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু উপনিষদ্ই এই সাধারণী ব্রহ্মতত্ত্বের আরো অনেক উপরে উঠিয়াছেন। যিনি জগৎকারণ, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় যাঁহা হইতে হয়, সেই বস্তুই আবার "আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং"—জীবের আত্মা, তার অন্তরস্থিত নিভৃত গুহাতে বাস করেন। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-মুখে আমরা ব্রহ্মকে কারণ-রূপেই দেখি। কিন্তু আমাদের নিজেদের অন্তরে, আমাদের জীবনের বিবিধ অবস্থার ও অশেষ পরিবর্ত্তনের অন্তরালে, সেই তত্ত্বকেই আমরা সাক্ষিচৈতন্যরূপে প্রত্যক্ষ করি। পরিবর্ত্তন জগতের নিত্য ধর্ম্ম সত্য; কিন্তু বহির্জগতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তার একত্ব কোথায়, ইহা আমরা মানসচক্ষে ধরিয়া উঠিতে পারি না। ফলতঃ জগৎটা আমাদের মানসচক্ষে এক নয়, কিন্তু অসংখ্য। আমরা ইহাকে স্থির করিয়া ধরিতে পারি না বলিয়াই ইহার জগৎ নাম দিয়াছি। যাহা কেবলি চলিতেছে, যাহা নিয়তই চঞ্চল, যার গতির বিরাম নাই, তাহাই জগৎ। আর এই যে

প্রবাহ অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, ইহার সূত্র কি ও কোথায়? কে ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, পূর্ব্বের সঙ্গে পরের যোগ কে সাধন বা রক্ষা করিতেছে,—বহির্জগতে তার সন্ধান পাই না। সে সন্ধান পাই আমাদের নিজেদের ভিতরে, আমাদের চৈতন্যের মাঝে। জগৎ যেমন চঞ্চল, জীবনও সেইরূপ চঞ্চল। ইন্দ্রিয় সকল বিষয়প্রবাহে পড়িয়া নিয়ত কাঁপিতেছে। চক্ষের তারকার উপরে একটার পর আর একটা করিয়া ক্রমাগত দৃশ্য বস্তুর ছায়া পড়িতেছে আর সরিয়া যাইতেছে। কর্ণ-পটহে সেইরূপ একের পর আর একটা করিয়া ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি আহত হইয়া অমনি আবার আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রত্যেকটী ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে কাণের পটহে যাইয়া আঘাত করে, আর আঘাত করিয়া অমনি যেন সরিয়া যাইতেছে, এবং তার পশ্চাতে আর একটা ধ্বনি আসিয়া সেই পটহে আঘাত করে। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়ের উপরেই তাহাদের নিজ নিজ বিষয়গুলি নদীতরঙ্গের ন্যায় আসিয়া পড়িতেছে আবার অমনি সরিয়া যাইতেছে। অথচ এই খণ্ড খণ্ড দৃশ্য, ধ্বনি, রস ও গন্ধকে কে যেন ধরিয়া রাখিয়া, বিশিষ্ট বস্তুর রূপ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও রসের সম্পূর্ণ ও গোটা জ্ঞানটা ফুটাইয়া তুলিতেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞানের উদয় হয়—আস্তিক নাস্তিক সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আর এই যে সংস্পর্শ ইহা অতি চঞ্চল, কেবলই আসে আর যায়—"মাত্রাস্পর্শ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যে বিষয়ের সংস্পর্শ, তাহা—সর্ব্বদাই "আগমাপায়িনো" আসে আর যায়। অথচ পূর্ব্বে যা এসেছিল, আর তার পরে যা আসে, এই সকলের সঙ্গে যদি যোগরক্ষা না হয়, যা এসেছিল তার অনুভূতিটুকু যদি কেউ ধরিয়া রাখিয়া, পরবর্ত্তী বিষয়সংস্পর্শের অনুভূতির সঙ্গে জুড়িয়া না দেয়, তবে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি কোনও ইন্দ্রিয়ানুভূতিই পূর্ণ হইয়া, বিষয়-জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। আমাদের ভিতরের যে বস্তু বা যে তত্ত্ব এই চলন্ত মাত্রাস্পর্শের ক্ষণিক অনুভূতিগুলিকে ধরিয়া রাখিয়া বিষয়জ্ঞান সম্ভব করিতেছে, তাহাকেই সাক্ষিচৈতন্য বলে। তাহাই পরমাত্মা। ইহাকেই উপনিষদ্

আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং

বলিয়াছেন। ভাগবত এই সাক্ষিচৈতন্যকেই—

পরমাত্মেতি শব্দ্যতে

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর উপনিষদের শুদ্ধ-সত্তামাত্র জ্ঞেয়, অজ্ঞাত ও জ্ঞানাতীত মনোময়কোষস্থ ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন পূর্ণতত্ত্ব নহে, তার এক দিক্ মাত্র; সেইরূপ এই বিজ্ঞানময়-কোষস্থিত পরমাত্মা-তত্ত্বও পূর্ণতত্ত্ব নহে। ইহা সেই পরমতত্ত্বের এক দিক্ মাত্র।

কেবল ভগবত্তত্ত্বই সেই পূর্ণ তত্ত্ব সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমগ্র যোগ-বৈরাগ্য, সমগ্র রস ও সমগ্র কর্ম্ম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ভগবান্। আর বৈষ্ণবেরা বলেন—

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সে ব্রহ্ম গোবিন্দের প্রভা হয় অঙ্গকান্তি॥
আত্মা অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

এইজন্যই বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণবস্তুকে সকল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

আত্ম-কথা

এ সকল নিগূঢ় কথা কেউ কাউকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। কোনও তত্ত্বই কথায় বোঝান যায় না। তত্ত্বমাত্রেই সাক্ষাৎ অনুভূতিগ্রাহ্য। তর্কযুক্তি দ্বারা কোনও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে। তর্কযুক্তির দ্বারা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিতে পারা যায়; কিন্তু আপনা হইতে যার শ্রদ্ধালাভ হয় নাই, তার অন্তরে অনুকূল বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না। এইজন্যই সাধুভক্তেরা বলেন, কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন, বহুপুণ্যফলে বহুভাগ্যবলে, সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত হইয়া, কেবল সেই ব্যক্তিই কৃষ্ণবিষয়িণী শ্রদ্ধা ও মতি লাভ করিতে পারেন। এইরূপ কৃপাসিদ্ধ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির চিত্তেই কেবল এই পরমতত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিবার কোনও অধিকার জন্মিয়াছে, এমন কল্পনা করি না। কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিয়াছি, এমন বলিতে পারি না। কৃষ্ণতত্ত্ব একেবারেই জানি নাই, এমনও বলিতে পারি না। তবে কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝি বা না বুঝি, বহুদিন হইতে কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে আনন্দ পাইয়া থাকি, ইহা অস্বীকার করিলে কৃপাপরাধ হয় বলিয়া মনে করি। আর কৃষ্ণ কথার আলোচনা মিষ্টি লাগে বলিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বহুদিন পরে এদেশে কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনার সময় ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়াও মনে হয়। প্রথম প্রথম ইংরাজি শিখিয়া য়ুরোপীয় জড়বাদ ও সন্দিগ্ধবাদের ধোঁপায় পড়িয়া, আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। এ দেশের নব্যশিক্ষিতসমাজেও যে কারণেই এবং যে দিক্ দিয়াই হউক না কেন, কৃষ্ণতত্ত্বের ও কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় যেন একটু লোভ জন্মাইতেছে। বৈষ্ণব ভাবের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলতঃ বিশ্বময় যেন একটা রসের বান ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এই বানের মুখে, আধুনিক সভ্যতার সামাজিক ও নৈতিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-সম্বন্ধিনী জটিল সমস্যা সকলে মিলিয়া অজ্ঞাতসারে যেন বৈষ্ণব মীমাংসার দিকেই ছুটিতেছে। মানুষ বহুদিন স্বভাবকে উপেক্ষা ও উৎপীড়িত করিয়া, একটা অতিমানুষিক কল্পিত সাধনার ও আদর্শের সন্ধানে ছুটোছুটি করিয়াছে। বিষয়কে ছাড়িয়া বিষয়ীকে, ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া রসকে, সংসারকে ছাড়িয়া ধর্ম্মকে, মানুষকে ছাড়িয়া মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। এইজন্য তার সভ্যতা ও সাধনা, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সর্ব্ব প্রকারের উন্নততর আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা

বিমানচারিণী হইয়া, শূন্যগর্ভা নিষ্ফলতা মাত্র আহরণ করিয়াছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ফল প্রয়াসের প্রতিকূলে অভিনব প্রতিক্রিয়ার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে, মানবমন ক্রমে বিপরীত পথ ধরিয়া, বিষয়ীকে ছাড়িয়া বিষয়কে, রসকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সংসারকে, মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করিয়া মানুষকে, আদর্শকে বর্জ্জন করিয়া কেবল নিরেট বাস্তবকে আঁকড়াইয়া ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ফলে জড়বাদ, সুখবাদ, ইহসর্ব্বস্বভোগলিপ্সা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বিভ্রান্ত আত্মম্ভরিতা, এ সকলে আধুনিক সভ্য সমাজের চিন্তা ও ভাব, উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা, সর্ব্ববিধ সংকল্প ও কর্ম্মচেষ্টাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল এই বিষম ও জটিল যুগসমস্যার মীমাংসা যে কোথায়, এ পর্য্যন্ত লোকে তাহার সন্ধান পায় নাই। যাঁরা ইঙ্গিতেও এ সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁরা বুঝিয়াছেন যে, এক ভারতের বৈষ্ণব-তত্ত্বে ও বৈষ্ণব-সাধনাতে, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে মহাপ্রভু এবং তাঁহার অনুচর ও পার্ষদগণ যে তত্ত্বের প্রচার ও যে সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, কেবল সেখানেই এই কঠিন বিশ্বসমস্যার সম্যক্ মীমাংসার পথ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় বা মোহম্মদীয়, জগতের আর কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধনাতে এ পথের সন্ধান পাওয়া যায় নাই ও পাওয়া যাইবে না। অতএব যুগ-প্রয়োজনেই আমাদের মধ্যে বৈষ্ণবী সাধনার প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ভাবের গতিবেগ ক্রমে বাড়িবে বই আর কমিবে না। আর এই ভাবকে সতেজ ও বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা ও কৃষ্ণকথার আন্দোলন যত হয়, ততই মঙ্গল।

একদিন ছিল, যখন কৃষ্ণতত্ত্ব কাহাকে বলে, তার কোনও কিছুই জানিতাম না। কৃষ্ণ নামে খ্যাত এক অবতারের ভজনা বৈষ্ণবেরা করেন, তাঁর দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীবিগ্রহ আছে, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় সে বিগ্রহের ভোগরাগাদি হয়, এ সকল জানা ছিল বটে। কিন্তু এই কৃষ্ণ যে তত্ত্ববস্তু, অধিকাংশ বৈষ্ণবেরাই এ কথা জানিতেন কি না সন্দেহ, অন্যে পরে কা কথা! বৈষ্ণব সাহিত্যে,—ভাগবতে ও বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে, এ সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সত্য। কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গতানুগতিক বৈষ্ণবসমাজেই এ সকল কথার সংবাদ কে রাখিত? সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বের কথা অল্প লোকেই জানিত। এই কৃষ্ণতত্ত্বই যে পরম তত্ত্ব, এই তত্ত্বেই যে বিশ্বজিজ্ঞাসার চরম নিবৃত্তি ও বিশ্ববাসনার পরম তৃপ্তি, ইহা লাখে না জানিত এক। যাত্রায়, কীর্ত্তনে, পুরাণে, কথায়, কৃষ্ণাবতারের আখ্যায়িকা মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়াছিল বটে। কিন্তু প্রখর যুক্তিবাদের মুখে এই কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণাবতার যে নব্যশিক্ষিতসমাজে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কিন্তু কৃষ্ণাবতারের কথাটা মন হইতে উড়াইয়া দেওয়া যত সহজ, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া, কৃষ্ণলীলার রসের আস্বাদনটুকুকে রসনা হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলা তত সহজ নহে। এ রস বাঙ্গালীর সাধনার সঙ্গে, বাঙ্গালীর চিন্তার, ভাবের, ভজনার,

সংসারের, সম্ভোগের—সকলের সঙ্গে শিরায় শিরায় জড়াইয়া গিয়াছে। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও অবতারত্বকে তত্ত্ববিরোধী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের ভজনাকে যাঁরা নীতিবিগর্হিত বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারাও এই বাংলার মাটিতে জন্মিয়া, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সাহায্যে সাধন ভজন করিতে যাইয়া, বৈষ্ণবী ভাষা ও বৈষ্ণবী সাধনার রসটুকুকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। নিরাকারবাদী, কৃষ্ণবৈমুখী ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ভজনসঙ্গীতগুলি অতীর্ণ বৈষ্ণব-রসেতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ফলতঃ কৃষ্ণাবতারকে অসত্য, কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াও, কৃষ্ণপ্রেমের অলৌকিক মিষ্টত্বটুকু নষ্ট করা যায় না। অবতার একটা আকস্মিক ঘটনা, সত্য হইলেও, যুগে যুগেই অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যবধানেই কেবল এ ঘটনা ঘটে; কিন্তু এই কৃষ্ণপ্রেম যে নিত্য-বস্তু। যদিই বা কৃষ্ণাবতার একটা অবতার অতি-প্রাকৃত তত্ত্বই হয়; তথাপি এই অদ্ভুত, অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমকাহিনীতে অতিপ্রাকৃত বা অতিমানুষিক তো কিছুই নাই। মাধুর্য্যাদি রস বিশ্বজনীন, সার্ব্বজনীন। তাই বলার মতন করিয়া বলিতে পারিলে, এ সকল রসের কথায় জগৎ চকিত, বিস্মিত, পুলকিত, স্তব্ধ, মুগ্ধ হইয়া যায়। আর কৃষ্ণলীলার মতন জগতের আর আর কোন্ লীলাতে এ সকল রস এমন করিয়া উথলিয়া উঠিয়াছে? এই কৃষ্ণলীলা-কাহিনীতে চৌষট্টি রস যেমন করিয়া উদ্বর্ত্তিত হইয়া, ঘন হইয়া, সুমিষ্ট সার ক্ষীরখণ্ডে পরিণত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। সর্ব্বেন্দ্রিয়কে জাগাইয়া, নাচাইয়া, মুগ্ধ স্তব্ধ করিয়া, দেহ হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে পরমবস্তু আত্মবস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া, এ সকল রস যেরূপ ভাবে কৃষ্ণ-লীলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন জগতের আর কোনও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। রসিকশেখর নাগর-বর শ্রীকৃষ্ণ; নায়িকার শিরোমণি রসবতী শ্রীরাধিকা—ইচ্ছা হয়, ইহাকে না হয় কেবল কবি-কল্পনাই বল, কিন্তু এমন কল্পনাই বা জগতের আর কোন্ কাব্যে আছে? এমন নায়ক-নায়িকা আর কি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়? আর যদি, ইহাকে তত্ত্ব বল,—এমন তত্ত্বের সাক্ষাৎকারই বা জগতের কোন্ জ্ঞানী কোথায় পাইয়াছেন, জানি না। সাধনের দিক্ দিয়া যদি দেখিতে হয়, সেদিকেই ইহার বিচার কর,—ভগবদারাধনার নিগূঢ় রহস্য আর কোন্ কাব্যে এমন করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে? ভক্তির অভিব্যক্তি বল,—এমন বিচিত্র ভাবলহরীময়ী ভক্তিই বা জগতে আর কোথায় পাইবে? যার যেমন অধিকার, যে যে দিক্ দিয়া পার, সেইরূপ, সেই দিক্ দিয়াই পরখ করিয়া দেখ, রাধাকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলারসের তুলনা জগতে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না।

কৃষ্ণতত্ত্বের যখন কোনও কিছুই সন্ধান পাই নাই, তখনও কৃষ্ণলীলার কাব্যরস চাকিয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলাম। তাই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, রাধাকৃষ্ণের লীলাকে শুদ্ধ নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিনয়রূপে দেখিয়া—"প্রচারে" যখন কৃষ্ণচরিত্র ও "নবজীবনে" যখন আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছিল, তখন "আলোচনা" নামক মাসিক পত্রে

"রাধিকার প্রেম" লিখিয়াছিলাম, প্রথম যৌবনে শ্রীরাধিকার প্রেমমাহাত্ম্য যথাবুদ্ধি একটু কীর্ত্তন করিয়াছিলাম বলিয়াই, বুঝি বা আজ এই শেষ বয়সে,—বুঝিতে পারি আর না পারি, কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে এমন মিষ্টি লাগিতেছে। সেই লোভেই কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বিজ্ঞানে সূক্ষ্মগণনা

সূর্য্যের অতি নিকটে যে বুধ নামক গ্রহটি রহিয়াছে, তাহার তুলনায় সূর্য্যের গুরুত্ব একাত্তর লক্ষ গুণ অধিক কি বাহাত্তর লক্ষ গুণ অধিক, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের কিছুই যায় আসে না, এই প্রকার অভিযোগ 'অবৈজ্ঞানিক' বন্ধুগণের নিকট হইতে অনেক সময়ে শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞানে এত চুলচেরা হিসাব কেন? পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি আটাশ লক্ষ আশী হাজার মাইল, এই কথাটা শুনিলে তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলেন "হাঁ, সূর্য্যটা খুব দূরে আছে বটে।" কিন্তু যখন বলা যায়, আধুনিক গবেষণায় সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তখন এই কথাটা তাঁদের মনে একটুও বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। তাঁহারা হয় ত বলিয়া ফেলেন, এই এক লক্ষ কুড়ি হাজার মাইলের ন্যূনাধিক্যে আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি হইল কোথায়! এই *চুলচেরা হিসাবের ত কোন প্রয়োজনই দেখা* যায় না।

বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম গণনার প্রয়োজন এই অভিযোগকারীদিগকে এক কথায় বুঝান কঠিন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি উদাহরণ দিয়া ঐ প্রয়োজনের বিষয় পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের কথাই আলোচনা করা যাউক; প্রাচীনত্বে বিজ্ঞানের কোন শাখাই ইহার সমকক্ষ নয়। অতি প্রাচীন যুগের সভ্য মানবগণ চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ও উদয়াস্তের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিয়া যে কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। কিন্তু প্রাচীন জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ ও গ্রহগণের উদয়াস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতেন, তাহাই বোধ হয় 'অবৈজ্ঞানিক' জনসাধারণকে বিস্মিত করিত। আজও ইংরাজি নৌপঞ্জিকা (Nautical Almanac) এবং আমাদের দেশীয় পঞ্জিকায় গ্রহণাদি সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা মিলিয়া গেলে, জনসাধারণকে কম বিস্মিত করে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের *এই মোহিনী শক্তিটির উৎপত্তি কোথায়?* বিজ্ঞ পাঠককে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জ্যোতিষিক ব্যাপারগুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের সামর্থ্য মানব কখনই একদিনে পায় নাই। বৎসরের

পর বৎসর বহু অনুসন্ধিৎসুকে রাত্রি জাগিয়া জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে, কত গণনায় সময় ক্ষেপ করিতে হইয়াছে, কত পরিমাপ করিতে হইয়াছে, তবে তাঁহারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন, কিছু কাল ভাল করিয়া জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণে আমরা তাহাদের গতিবিধির মধ্যে যে নিয়ম দেখিতে পাই, ভবিষ্যতে গ্রহ নক্ষত্রেরা বুঝি সেই নিয়মেই চলে, কাজেই জ্যোতিঃশাস্ত্রটা চরমে জ্যোতিষীদের হাত হইতে গণিতবিশারদদিগের হাতে পড়াই উচিত। এই অবস্থায় গণিতজ্ঞেরাই কেবল কাগজ-কলমের হিসাবে জ্যোতিষিক ঘটনার কথা বলিয়া দিতে পারিবেন। যাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ জ্যোতিষিক আবিষ্কারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অবশ্যই এই প্রকার উক্তি আশা করা যায় না। দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণের উপরেই ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জ্যোতিষিক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যতই সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক না কেন, যন্ত্রের দোষে বা পর্য্যবেক্ষণের অসতর্কতায় একটু আধটু ভ্রম হিসাবের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রারম্ভের এই অবশ্যম্ভাবী ক্ষুদ্র ভ্রম কালক্রমে জমিতে জমিতে এত বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায় যে, পূর্ব্বেকার গণনায় যে ফল পাওয়া যাইত, তখন আর তাহা পাওয়া যায় না। গ্রহণের বা অপর কোন ঘটনার কালনিরূপণের জন্ম হিসাবে বসিয়া জ্যোতিষিগণ যে ফল লাভ করেন, তখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্যোতিষিক ব্যাপারের সহিত তাহার মিল দেখা যায় না। ভুল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করার পরে, নিয়মের এই প্রকার স্খলন প্রাচীন জ্যোতিষিগণ পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহা হইতে জ্যোতিষিক গণনায় চুলচেরা হিসাবের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। গণনার সহিত প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার মিল দেখানোর উপরেই জ্যোতিঃশাস্ত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠিত। প্রথম পর্য্যবেক্ষণে ভুল হইলে, এই মিল রক্ষা করিয়া গণনা করা একেবারে অসম্ভব। কাজেই মোটামুটি পর্য্যবেক্ষণের ফলে কোন নিয়মের সন্ধান পাইয়াও জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; বংশের পর বংশ, বৎসরের পর বৎসর এবং রাত্রির পর রাত্রি ইঁহাদিগকে বার বার জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষণ ও বড় বড় হিসাবের খাতা লিখিয়া জীবন কাটাইতে হয়; আমাদের ন্যায় 'অবৈজ্ঞানিক'দিগের নিকটে এই প্রকার চুল-চেরা হিসাবপত্র বাড়াবাড়ি ঠেকিতে পারে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের মহিমাটুকু এই বাড়াবাড়ি এবং চুল-চেরা হিসাবের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

একটা উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্যটা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। পাঠক অবশ্যই কেপ্‌লার সাহেবের আবিষ্কৃত জ্যোতিষিক নিয়মাবলীর কথা শুনিয়াছেন; সাধারণতঃ এগুলি কেপ্‌লারের নিয়ম (Kepler's Laws) নামে সুপরিচিত। যখন নিয়মগুলির প্রথম প্রচার হইয়াছিল, তখন সেগুলিকে অভ্রান্ত বলিয়াই পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, কেপ্‌লারের নিয়মে অনেক গলদ বর্ত্তমান। তাঁহার স্থূল-পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ নিয়মাবলী অনু-

সারে কয়েক বৎসর গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ঠিকই দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাঁহার প্রথম পর্য্যবেক্ষণের ভ্রম যখন বৎসরে বৎসরে পুঞ্জীভূত হইয়া বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন আর গ্রহ-নক্ষত্র কেপ্‌লারের নিয়ম মানিয়া চলে নাই। কাজেই নিয়মের সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত নিউটন্ সাহেব তাঁহার মহাকর্ষণের নিয়মাবলী দ্বারা কেপ্‌লারের নিয়মের সংশোধনে লাগিয়া গেলেন, খুব সূক্ষ্ম হিসাবপত্র চলিতে লাগিল এবং শেষে জানা গেল, কেপ্‌লার যে সকল নিয়ম কেবল *পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন*, তাহাদের মূল মহাকর্ষণের নিয়মাবলীতেই প্রোথিত। পৃথিবী যে নিয়মের অনুগত হইয়া আতা-ফলকে মাটিতে ফেলে, সৌরজগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কই যে, সেই নিয়মেরই অধীন হইয়া মহাকাশে পরিভ্রমণ করে, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল। এই সকল ছাড়া, চন্দ্রের গতির উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জোয়ারভাটা প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা জ্যোতিষীদিগের নিকটে মহা প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একে একে সেগুলিরও কারণ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। ধূমকেতু যখন সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করে, এবং অতি দূর প্রদেশে যুগ্মতারকাগণ যখন পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে, তখনও যে তলে তলে জ্যোতিষ্কগণ মহাকর্ষণেরই নিয়মাধীন থাকে, তাহাও সকলে জানিতে পারিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিউটন্ সাহেব খাতাপত্র লইয়া ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবে নিযুক্ত থাকিয়া যে সময়টা ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার অপব্যবহার হয় নাই। তাঁহার সূক্ষ্ম হিসাবই এখন গ্রহ-নক্ষত্রের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গতিবিধি আমাদিগকে সূক্ষ্মরূপে জানাইতেছে, এবং সৌরজগৎ ছাড়িয়া অতিদূর নক্ষত্রলোকের সংবাদও আমাদিগের নিকটে বহিয়া আনিতেছে। আমরা যে পৃথিবীখানির উপরে বাস করিতেছি, তাহার জন্মতত্ত্ব এবং শৈশবের ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা কাহার না হয়? নিউটন্ সাহেবের সূক্ষ্ম গণনাই এখন আমাদের সেই সকল ইচ্ছারও পূরণ করিতেছে। নিউটনের হিসাবপত্র খুব সূক্ষ্ম হইলেও ইহা একেবারে অভ্রান্ত নয়। *হয় ত বহু শতাব্দী ধরিয়া এই নিয়মে হিসাব* করিলে আমরা ভুল পাইব না, কিন্তু অতিদূর ভবিষ্যতে ঠিক্ এই নিয়মে গ্রহ-নক্ষত্রেরা চলা ফেরা করিবে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। বরং এ প্রকার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে বহু যুগ পরে কেপ্‌লারের নিয়মের ন্যায় নিউটনের নিয়মেরও সংশোধন প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়। দুই হাজার বৎসর পরে যে দিন নিউটনের নিয়ম না মানিয়া জ্যোতিষ্কদিগকে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইবে, সেই দিনই কোন সূক্ষ্মতর গণনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। সুতরাং এখন হইতেই যদি পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি লইয়া খুব সূক্ষ্ম গণনায় কালক্ষেপ করেন, তবে তাহাকে সময়ের অপব্যবহার বলা যায় না।

আমরা এ পর্য্যন্ত সৌরজগতের কথা লইয়াই আলোচনা করিলাম, যে অনন্ত নক্ষত্রলোক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে, এখন তাহার কথা স্মরণ করা

যাউক। হার্সেল সাহেবের পর বহু জ্যোতিষী বহু অনিদ্র রজনী নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণে কাটাইতেছেন; ইহাতে যে,কত সূক্ষ্ম হিসাবপত্র এবং তর্ককোলাহলের উৎপত্তি করিতেছে, আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকটে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এগুলিও নিষ্কর্ম্মার সময় ক্ষেপণের উপায় নয়। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহগণের উদয়াস্ত এবং তাহাদের চলাফেরা-সংক্রান্ত যে সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা দেখিয়া অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ অবাক্ হইয়া যান, তাহাদের মূলও উক্ত হিসাবপত্রের মধ্যে প্রোথিত। পাঠকের বোধ হয় অজ্ঞাত নাই, আমরা যখন জমি-জমা জরিপ করিতে আরম্ভ করি তখন প্রাচীন বৃক্ষ বা অপর কোন স্থায়ী বস্তুকে কেন্দ্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই স্থায়ী চিহ্ন হইতে পার্শ্বস্থ জমির দূরত্ব কত, তাহাই জরিপি চিঠাপত্রে লেখা থাকে। সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির চলাফেরা লিপিবদ্ধ রাখিতে হইলেও, ঐ প্রকার এক একটা স্থায়ী চিহ্নের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনন্ত আকাশে সে প্রকার চিহ্ন কোথায়! জ্যোতিষীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্থির নক্ষত্রগণকে চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিয়া হিসাব করেন। চিহ্নের (station) গোলযোগ হইলে জমিদারকে জমিজমার হিসাবপত্র লইয়া ভবিষ্যতে অশেষ হাঙ্গামায় পড়িতে হয়। যে সকল নক্ষত্রকে স্থায়ী চিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়া জ্যোতিষীরা হিসাবপত্র করেন, তাহাতেও এক চুল নড়চড় হইলে, গণনায় মহা বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই চিহ্নস্বরূপে গৃহীত নক্ষত্রগুলির উপরে জ্যোতিষীদের নিয়তই খরদৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। প্রাচীন জ্যোতিষীরা নক্ষত্রগুলিকে নিশ্চল বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন আর কোন নক্ষত্রকেই নিশ্চল বলা যায় না। এক একটি নক্ষত্র এক একটি মহাসূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ; কত গ্রহ-উপগ্রহ ধূমকেতু নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং ইহারা প্রত্যেকেই এই পকার জ্যোতিষ্ক-পরিবারে পরিবৃত হইয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আধুনিক জ্যোতিষীদিগকে নক্ষত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই একবাক্যে এই কথাই বলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, যে সকল নক্ষত্র নিশ্চল বলিয়া স্থির ছিল, সেই গুলিরও স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত হওয়ায় জ্যোতিষীদের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। নিয়তই ইঁহাদিগকে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, এবং তাহাদের অধিকৃত স্থানের একটু নড়চড় দেখিলে, তাহা লিপিবদ্ধ রাখিয়া ভবিষ্যৎ গণনার পথ সুগম করিতে হয়। সুতরাং নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণের জন্য জ্যোতিষিগণ যে শ্রম করেন এবং যে সূক্ষ্ম হিসাবপত্র খাড়া করেন, তাহারও মধ্যে একটুও বাহুল্য নাই বলিয়াই মানিতে হয়।

আঠারো কোটি ষাইট্ লক্ষ মাইল ব্যাস-বিশিষ্ট এক মহাবৃত্তাকার-পথে পৃথিবী সূর্য্যকে এক বৎসরকালে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। অর্থাৎ বলিতে হয়, পৃথিবী আজ আকাশের যে অংশে আছে, ছয় মাস পরে তাহা আঠারো কোটি ষাইট্ লক্ষ মাইল দূরে গিয়া দাঁড়াইবে। আমরা যখন গাড়ীতে বা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে থাকি তখন পথের পার্শ্বের বৃক্ষগুলিকেও

স্থানচ্যুত হইতে দেখি। যে গাছটি একটু পূর্ব্বে আমাদের সম্মুখে ছিল, গাড়ি অগ্রসর হইলে তাহা পিছাইয়া পড়ে। সুতরাং এই পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র বুকে লইয়া আমাদের এই পৃথিবী যখন ছয়মাসে আঠারো কোটি ষাইট্ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে, তখন পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ন্যায় আকাশের নক্ষত্র-গুলিকেও একটু আগাইতে বা পিছাইতে দেখারই সম্ভাবনা। নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর গতিতে প্রকৃতই এই প্রকার নড়াচড়া করে কি না; জ্যোতিষিগণ বহু দিন হইতে ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন এবং কতকগুলি স্থির নক্ষত্রের এই পকার স্থানচ্যুতিও লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন এই শ্রেণীর নিকট নক্ষত্রের সংখ্যা বহু জ্যোতির্বিদের চেষ্টায় প্রায় চারি শত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে কেবল চারি শতটিই সৌরজগতের নিকটবর্ত্তী এবং তাহাদেরই কেবল দূরত্ব পরিমাপের উপায় আছে; তদ্ব্যতীত সকল নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত যে, আমরা সাড়ে আঠারো কোটি মাইল পরিভ্রমণ করিয়াও তাহাদের একটুও বিচলন লক্ষ্য করিতে পারি না। সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতিষিগণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এই যে একটু আভাস প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা জনসাধারণকে কম লাভবান করে নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রদিগের সংবাদ জানিতে না পারিয়া জ্যোতিষিগণ হতাশ হন নাই। উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া আরো সূক্ষ্মতর হিসাবের সাহায্যে দূর নক্ষত্রের সংবাদ জানিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক নক্ষত্রই এক একটি মহাসূর্য্য, এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি স্বকীয় গতি আছে। যেগুলি অতি দূরে অবস্থিত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে তাহাদের গতি দুই চারি শত বৎসরেও ধরা পড়ে না; কেবল নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রেরাই একটু দীর্ঘকালে একটুমাত্র বিচলন দেখাইয়া স্বকীয় গতির পরিচয় প্রদান করে। নক্ষত্রদিগের এই গতির পরিচয় পাইয়া হার্সেল্ সাহেবের মনে হইয়াছিল, আমাদের সূর্য্যটি যখন নক্ষত্রজাতীয় জ্যোতিষ্ক, তখন ইহারও একটা গতি থাকার সম্ভাবনা। হার্সেল দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিষয়টি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং শেষে দেখাইয়াছিলেন বুধ বৃহস্পতি শনি এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহে পরিবৃত হইয়া আমাদের সূর্য্যটি সতাই হারকিউলিস্ রাশির দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ হার্সেল সাহেবের প্রদর্শিত পন্থায় নানাপ্রকার উন্নত যন্ত্রাদি সাহায্যে সৌরজগতের গতির পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন এবং এই গতির পরিমাণ বৎসরে অন্ততঃ চল্লিশ কোটি মাইল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজেই পৃথিবীর ষাণ্মাসিক সাড়ে আঠারো কোটি মাইল পরিভ্রমণেও যে সকল নক্ষত্র বিচলন দেখাইয়া আত্মপরিচয় দেয় নাই, সৌরজগতে বার্ষিক চল্লিশ কোটি মাইল ভ্রমণে তাহাদেরই পরিচয়-গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দূর নক্ষত্রদিগের পরিচয়-সংগ্রহের জন্য জ্যোতিষিগণের এই যে অক্লান্ত শ্রম, ইহার কি সার্থকতা নাই? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য বুঝিয়া মানবজাতি কি ইহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না?

যাঁহারা আধুনিক জ্যোতিষিক আবিষ্কারের সংবাদ রাখেন তাঁহাদের নিকটে গ্রনিন্‌জেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ক্যাপ্টেন্‌ (Kaptyen) সাহেবের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইনি সম্প্রতি নাক্ষত্রিক জগৎ-সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা প্রচার করিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে প্রকৃতই বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ক্যাপ্টেন্‌ সাহেব বলিতেছেন মহাকাশে এই যে অসংখ্য তারকাগুলি কোটি কোটি মাইল বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মিটি মিটি জ্বলিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অতি গূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। ইঁহার মতে সমগ্র বিশ্বের নক্ষত্রগুলির মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাগ রহিয়াছে; বিশৃঙ্খলভাবে আকাশে সজ্জিত থাকিয়াও ইহাদের প্রত্যেকটি ঐ দুই দলের মধ্যে কোন একটির অন্তর্ভূক্ত হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। একটা উদাহরণ দিলে ক্যাপ্টেন্‌ সাহেবের এই আবিষ্কারটি সহজে বুঝিবার সুবিধা হইবে। মনে করা যাউক, যেন আকাশে দুই ঝাঁক পাখী উড়িয়া চলিয়াছে; এক ঝাঁক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ছুটিতেছে, আর এক ঝাঁক যেন দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলিয়াছে। দুই ঝাঁকের কোন পাখীরই বিশ্রাম নাই, সকলেই উড়িয়া চলিয়াছে। আকাশের নক্ষত্রগণ এই পাখীর ঝাঁকের মতই দুই দলে বিভক্ত হইয়া ছুটিতেছে বলিয়া ক্যাপ্টেন্‌ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। তাহারা কোন্‌ দিক্‌ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। যে সকল নক্ষত্রকে প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ চিরস্থির বলিয়া অনুমান করিতেন, তাহাদেরই এই প্রকার সুশৃঙ্খলিত গতি আবিষ্কার করা আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের কম গৌরবের কথা নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের এই বৃহৎ আবিষ্কারটির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতদিগের চুলচেরা সূক্ষ্ম গণনাই ইহাকে পূর্ণতা প্রদান করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতির্বিদ্‌ ব্রাড্‌লে (Bradley) সাহেব প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীনুইচ্‌ মানমন্দিরে বসিয়া যখন আকাশের নক্ষত্রদের মানচিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এই নক্ষত্রগণনাকে নদীতীরে বসিয়া জলস্রোতের গণনার ন্যায় একটা অনাবশ্যক কার্য্য বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন। কিন্তু আজ ক্যাপ্টেন্‌ সাহেব এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নক্ষত্র-জগতের যে সকল সংবাদ প্রচার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেছেন, তাহা সেই ব্রাড্‌লি সাহেবেরই নক্ষত্র-পরিচয়ের সহিত বর্ত্তমান-কালে নক্ষত্রদিগের অবস্থানাদি মিলাইয়াই জানা যাইতেছে।

সূক্ষ্ম গণনায় জ্যোতিঃশাস্ত্র কত উন্নত হইয়াছে এবং মানবের জ্ঞানও ইহাতে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার অতি অল্পই পরিচয় প্রদান করা হইল। দূর জ্যোতিষ্কদিগের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া আজকাল নক্ষত্র-লোকের যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সেগুলির কথাও আলোচনা করিলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিকদিগের সূক্ষ্ম গণনাই এখানে জয়যুক্ত হইয়াছে। কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রে নয়, রসায়নীবিদ্যা,

পদার্থবিদ্যা, ভূ-তত্ব প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের চুলচেরা সূক্ষ্ম গণনাকেই সেগুলির উন্নতির মূলকারণস্বরূপ দেখা গিয়া থাকে।

শ্রীজগদানন্দ রায়

নিমাই-চরিত্র

বিংশ অধ্যায়

সার্ব্বভৌম মিলন

বাসুদেব সার্ব্বভৌম উৎকলরাজের সভা-পণ্ডিত। তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। গৌর-ভক্ত গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহার ভগিনীপতি। দৈবযোগে গোপীনাথ আচার্য্য এই সময়ে পুরী ধামে উপনীত হইলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথের নিকট গৌরের সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া গৌরকে কহিলেন—"নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতার সহাধ্যায়ী ছিলেন; মিশ্র-পুরন্দরও আমার পরম পূজনীয়। আপনি সম্পর্কে আমার পূজনীয়, তাহার উপর সন্ন্যাসী, আমাকে আপনি ভৃত্যের মত জ্ঞান করিবেন।" গৌর কহিলেন—"আপনি বেদান্তের অধ্যাপক, আমি বালক সন্ন্যাসী, গুরু বলিয়া আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, আপনার জন্যই আমি পুরী আসিয়াছি, আপনাকে আমায় সর্ব্বথা পালন করিতে হইবে।" সার্ব্বভৌম নিজের মাতৃস্বসার গৃহ গৌরের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈত-বাদী ছিলেন। একদিন গোপীনাথের নিকট শুনিলেন গৌর ভারতীসম্প্রদায়ভুক্ত কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়া কহিলেন "ভারতীরাও সর্ব্বোচ্চ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নহে।" গোপীনাথ কহিলেন "ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই বলিয়াই বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন।" তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন "এই তরুণ বয়সে ইনি সন্ন্যাস রক্ষা করিতে পারিবেন ত! ভাল, আমি ইঁহাকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইয়া সত্বরই অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইয়া দিব। যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উত্তম সম্প্রদায়ভুক্ত মহা-পুরুষের নিকট পুনঃসংস্কৃত হইয়া মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিতেও পারিবেন।"

গোপীনাথ দুঃখিত হইয়া কহিলেন "সার্ব্ব ভৌম, তুমি এখনও ইঁহাকে চিনিতে পার নাই, যদি ঈশ্বরের কৃপা হয়—তাহা হইলে জানিতে পারিবে, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অব-তার।" সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তোমার চৈতন্য মহাভাগবত, সন্দেহ নাই; কিন্তু কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথা শাস্ত্রে নাই।" গোপী-নাথ কহিলেন "কৃষ্ণ প্রতিযুগেই অবতার গ্রহণ করেন, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে (১০।৮০)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গঋষি নন্দকে বলিয়াছিলেন "তোমার

পুত্র প্রতিযুগেই তনু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অন্য তিন যুগে ইঁহার শুক্ল, লোহিত ও পীত, এই ত্রিবিধ বর্ণ; অধুনা কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তী জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গ স্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

১১।৫।২৮

হে রাজন্, এই প্রকারে দ্বাপর যুগে জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। সম্প্রতি নানা-তন্ত্র বিধান দ্বারা কলিকালের পূজাবিধি অবধান কর। যাঁহার মুখে কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ নিরন্তর ধ্বনিত হয়, যাঁহার কান্তি গৌর এবং যিনি অঙ্গ,উপাঙ্গ ও অস্ত্রপার্ষদ সমন্বিত, সুমেধাগণ নামকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

মহাভারতে ভগবানের এই সমস্ত নামের উল্লেখ আছে :—

সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ॥

কিন্তু তোমার সহিত এ সমস্ত আলোচনায় লাভ নাই। ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। তোমার উপর যখন ঈশ্বর-কৃপা হইবে তখন আপনা হইতেই তুমি এ সমস্ত বুঝিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদ সংবাদ ভুবো ভবন্তি॥
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং।
তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূম্নে॥" ৬।৪।২৬

যাঁহার মায়াশক্তি বাদী ও প্রতিবাদিগণের বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তির হেতু এবং তাহাদিগের আত্মবিষয়ে মোহযুক্ত করে—আমি সেই অনন্তগুণের আধার ভূমাকে নমস্কার করি।

গৌর গোপীনাথের নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্যের আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, তিনি তাহার বিধান করিতে চাহেন—ইহাতে আর দোষ কি?"

একদিন সার্ব্বভৌম শিষ্যগণকে বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেছেন—গৌর পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌম গৌরকে কহিলেন "বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তুমি নিরন্তর আমার বেদান্ত শ্রবণ করিও।"

গৌর কহিলেন "আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব।" সাতদিন ধরিয়া গৌর সার্ব্বভৌমের বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন, কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম কহিলেন "তুমি ত মৌন হইয়াই আছ, বুঝিতে পারিতেছ কি না আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" গৌর কহিলেন "আপনার আদেশমত কেবল শুনিয়া যাইতেছি—কিন্তু আপনার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। সূত্রের অর্থ আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার কৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সূত্রের অর্থ প্রকাশ করাই ভাষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনার ভাষ্যে সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে—সূত্রের মুখ্যার্থ না করিয়া আপনি কল্পিত অর্থ করিতেছেন। উপনিষদের অর্থ ব্যাসসূত্রে প্রকাশিত। আপনি ব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছেন, শব্দের অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। লক্ষণার্থ করিলে

বৈদিক বচনের স্বতঃপ্রামাণ্যহানি হয়। ব্রহ্মনিরূপণ বেদ ও পুরাণের লক্ষ্য। 'ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ।" যে ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যের আধার, তাঁহাকে আপনি নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেকগুলি শ্রুতিতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সত্য। কিন্তু সেই সমস্ত শ্রুতিতেই আবার ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে। যে শ্রুতিতে ব্রহ্ম অপাণি ও অপাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহাতেই আবার তাঁহাকে জবন ও গৃহীতা বলা হইয়াছে। যিনি শীঘ্র চলেন, যিনি সর্ব্ব গ্রহণ করেন, তাঁহাকে সবিশেষ বলিতেই হইবে। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উদ্ভূত, এবং ব্রহ্মেই লীন হয়। ব্রহ্ম জগতের অপাদান, করণ ও অধিকরণ— এই তিন কারক। ব্রহ্ম অর্থে স্বয়ং ভগবান। শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সৎ চিৎ আনন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ। একই চিৎ-শক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত। আনন্দরূপে তাঁহাকে হ্লাদিনী বলে, সৎরূপে সন্ধিনী ও চিৎরূপে সংবিৎ বলে। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াবশ। এহেন ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ নাই বলা অসম সাহসের পরিচায়ক। ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। বিগ্রহ যে মানে না, সে পাষণ্ড। পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের অভিমত। স্পর্শমণি অবিকৃত থাকিয়াও যেমন তাহা হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি হয়, ঈশ্বরও নিজে অবিকৃত থাকিয়া জগৎরূপে পরিণত হয়েন। বিবর্ত্তবাদ কখনও ব্যাসের অভিমত ছিল না। জীবের দেহাত্ম-বুদ্ধিই মিথ্যা, জগৎ কখনও মিথ্যা নহে। প্রণব-বাক্যই মহাবাক্য; "তত্ত্বমসি" প্রাদেশিক বাক্য মাত্র।

গৌরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মুখ হইতে আর বচন নিসৃত হইল না। গৌর পুনরায় বলিতে লাগিলেন "ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। শ্রীহরির এমনি অনির্ব্বচনীয় গুণ যে আত্মারাম মুনিগণ বিধিনিষেধের অতীত হইয়াও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।"

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
ভাগবত ।১।৭।১০

সার্ব্বভৌম গৌরকে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। গৌর শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বোপচিত বাৎসল্যভাব স্মরণ করতঃ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অতি বিনীতভাবে গৌরের নিকট সার্ব্বভৌম নিজের হীনতা স্বীকার করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া প্রথমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন, তৎপরে বংশীবাদন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সার্ব্বভৌমের মনঃপ্রাণ হরণ করিলেন।

কতিপয় দিবস গত হইল অরুণোদয়কালে গৌর হঠাৎ সার্ব্বভৌমগৃহে উপনীত হইলেন — সার্ব্বভৌম ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। গৌর সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রসাদ দান করিলেন। তখন

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যবিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

বলিয়াই অধৌতমুখ অস্নাত অকৃতসন্ধ্যা-

বন্দনাদি সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সার্ব্বভৌম একদিন নিম্নলিখিত বন্দনা-শ্লোক দুইটি জগদানন্দ দ্বারা গৌরসমীপে প্রেরণ করিলেন।

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ১

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুম্ কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥২

মুকুন্দদত্ত গৌরের নিকট পত্রী পৌঁছিবার পূর্ব্বে ভিত্তি-গাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই শ্লোক দুইটি আজিও ভক্তের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতেছে। গৌর শ্লোক দুইটি পাইয়াই ছিড়িয়া ফেলিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

নক্ষত্র-পূজা

অতি প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় কি আর্য্য কি তুরুক কি হিন্দু কি চীনম্যান মানবমাত্রেই নক্ষত্র* পূজা করিত। ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

নিশার ঘোর অন্ধকারে ভয়াকুল, হিংস্র জন্তুর গর্জ্জনে কম্পবান বনবাসী আদিপুরুষ-গণের ভয়ত্রাতা পিতা সূর্য্য ভিন্ন আর কে ছিল? শীতে কাতর বনবাসীর দেহে তাপ-সঞ্চার করিতে "প্রাচীন নক্ষত্র" ব্যতীত কে সক্ষম ছিল? চন্দ্র ও তারাগণের বিমল জ্যোতি মানবের শ্রান্তচিত্ত দিনান্তে যেমন স্নিগ্ধ করিতে পারে, তেমন স্নিগ্ধকর মোহিনীশক্তি আর কাহারও নাই। "সবিতা সত্যধর্ম্মা" উদিত হইলেই বনবাসীর ভয় দূর হইত, দেহে তাপের সঞ্চার হইত। বনবাসী আহার-সংগ্রহে সাহসী হইতেন। দৈনিক পর্য্যটন অন্তে নৈশ নভোমণ্ডলের সুবিমল জ্যোৎস্নায় বনবাসী শ্রান্ত চিত্ত, ক্লান্ত দেহ সুস্নিগ্ধ করিতেন।

কাজেই তিনি কৃতজ্ঞতার বশে ভক্তির চক্ষে নক্ষত্র দর্শন করিতেন। ক্রমে নক্ষত্র তাহার ভয়হর্ত্তা পিতা ও শান্তিদাত্রী মাতা হইলেন।

প্রাণ ও রয়ি আদি বনবাসীর পিতা মাতা হইলেন। সবিতা জগতের প্রাণ, চন্দ্রমা জগতের রয়ি। উভয়ে কৃতজ্ঞ বনবাসীর চিত্ত-পুত্তলিকা হইলেন। সবিতা ঈগল পক্ষী, শকুনি, রক্তবর্ণ চক্রবাক, হংসাদির ন্যায় বিমানে উড্ডীন হয় বলিয়া গরুত্মান্, শকুনি, লোহিত পক্ষী ও হংস উপাধি পাইলেন। সবিতা প্রকাণ্ড মহিষের বীরদর্পে বরাহের অটলবিক্রমে অগাধ পারাবার-বারি হইতে উত্থিত হয়। সবিতা ঘনঘটা-গর্জ্জন সহ সিংহের লম্ফে লম্ফে উদয়-গিরি আরোহণ করে। সিংহের চক্ষুর মত সবিতা মুহূর্ত্তের জন্যও মুদিত হয় না। তাই

* চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্র।

সবিতা 'মহিষ' 'বরাহ' 'সিংহ' ও 'হরি' নাম উপহার পাইলেন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ—চন্দ্রের এই দুই পক্ষ। আবার চন্দ্র মিনিটে ৪০ মাইল চলে। বনবাসী চন্দ্রকে দ্বিজরাজ খেতাব দিলেন। বনবাসী দেখিলেন শুভ্র শশকের ন্যায়, শুভ্র বিড়ালের ন্যায় লক্ষ্মময় চন্দ্রমা বিমানে বিচরণ করেন। চন্দ্রমা 'শশ', বিড়াল, ও লক্ষ্মী নাম উপহার পাইলেন।

সবিতা ও চন্দ্রমার উদয়ে ভক্তিরসে ডুবিয়া আনন্দে মগ্ন আদিমানব মূর্ত্তিমান্ 'বাউরা আদ্মী'র তানে বাউলের সুরে গীত ধরিলেন—

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ
তোমার সনে
তুমি হবে কেউ আমার
আপনা হতে আপনার
আপনা হতে নইলে
মন কি টানে
তোমার পানে—
আপনা হতে নইলে
প্রাণ কি টানে
ওহে জনক কি জননী
ভাই কি ভগিনী
প্রণয়িনী স্ত্রী কি
পুত্র কন্যে
এ নয় তোমাতে সম্ভব
এ কি অসম্ভব
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।"

আদি বাউলের সংজ্ঞালাভ হইল, বাউল বিস্মিত লজ্জিত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন এবং তিনি দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন। অগ্নিময় হইলেও সবিতা জড়বস্তু, জ্যোৎস্নাময় হইলেও "লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মিঃ" জড়বস্তু। বনবাসী বাউলের মনে ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন জড়বস্তু ত আমার ভক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, আমার দেবতা "সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" চিন্ময় বিষ্ণু, কাজেই সিদ্ধান্ত হইল "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি"। বনবাসী বাউলের নক্ষত্র-পূজা বহাল রহিল এবং তিনি সত্যের পথে অগ্রসর হইয়া 'সবিতা সত্য-ধর্ম্মার' উপাসনায় ব্রতী হইলেন।

সুমেরুস্থিত বনবাসী দেখিলেন ছয়মাস কাল জলময় পাতালে অলক্ষিত বাসের অব-সানে সবিতা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণে তারাবৃষের ককুদ আরোহণে রৌদ্রবিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রুদ্রদেবের বাহন বৃষরাশি হইল। ককুৎস্থ সূর্য্য নারায়ণের বাহন মহান্ উক্ষা হইল। তাই সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রকে "কাকুৎস্থং করুণাময়ং" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়।

তিনি দেখিলেন—আদিম কালের আদিত্য-পথ (ছায়া-পথ) ভেদ করিয়া উদিত সূর্য্য নারায়ণ নিশার অন্ধকার বিনাশ করিলেন। ছায়া-পথ স্ফটিক শুভ্র আকৃতি। ইতিহাসে নারায়ণ নৃসিংহ আদিত্য-পথ স্ফটিকস্তম্ভ এবং নিশা হিরণ্যকশিপু (নক্ষত্র যাহার বস্ত্র) নাম ধারণ করিলেন।

বনবাসী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে দেখিলেন—অমৃতস্রাবী চান্দ্র বিড়ালের পৃষ্ঠে ষট্‌কৃত্তিকা নক্ষত্র "শিশূনাম্ পালয়িত্রী" ষষ্ঠী (ষট্‌মাতৃকা) রূপে আসীন আছেন। বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন হইল। প্রাতঃসূর্য্য ব্রহ্মা নামে সৌর হংসে আসীন থাকেন। হংস

ব্রহ্মার বাহন হইল। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য জগৎব্যাপী বিষ্ণু। সূর্য্য-নারায়ণ মধ্যাহ্নে সৌর গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন থাকেন। গরুড় নারায়ণের বাহন হইল। সায়াহ্ন-সূর্য্য তেজ সঙ্কোচ করিয়া "যম" নাম গ্রহণ করেন।

সুমেরুস্থ বনবাসী দেখিলেন; 'যম' দেব ছয় মাসের পর তারা বৃশ্চিকের কবলে পতিত হইলে অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইতে থাকেন, কালান্তক বৃশ্চিক সর্প—'যম' 'মহাকাল' রুদ্রদেবের অঙ্গভূষণ হইল। এবং সৌর মহিষ 'যম' দেবের বাহন হইল। এই রূপে সৌর হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত, সৌর গরুড় পৃষ্ঠে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত, সৌর মহিষ পৃষ্ঠে রুদ্র যম প্রতিষ্ঠিত হইলেন। একে তিন, তিনে এক। এই হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি—সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে ভূষিত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা। পাশ্চাত্যের ত্রিনীতি—ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্রভূত (যম) এই হইল ত্রিনীতি (Trinity)। কাজের বেলা মিল নেই। ময়না পড়ে বেশ কিন্তু বুঝে না। মহাকাল রুদ্রদেব নারীবেশে মহাকালী হইলেন। জংঘায় বৃশ্চিক ভূষণ হইলেন। এবার মূর্ত্তিমান্ রুদ্রদেব বাহন। পদ-দলনে মৃত্যুঞ্জয় মরিবার নহে। "কালীর চেলা" (গ্রীক-চেলাই) হিন্দুর অবধ্য। সন্ন্যাসীর চেলা কি বস্তু!

বনবাসী জানিতেন যে বৃশ্চিক সর্পের কবলে পড়িলে সূর্য্যের তেজ অপহৃত হয়। তিনি এক দিন দেখেন দিনে দুপুরে অন্ধকার উপস্থিত, সূর্য্য অদৃশ্য। তিনি তখনই স্থির করিলেন বৃশ্চিক সর্প অলক্ষিত ভাবে আসিয়া সূর্য্য গ্রাস করিয়াছে। বৃশ্চিক সর্প লুক্কায়িত (রহসি-স্থিত) বলিয়া "রাহু" নাম পাইল, আবার গ্রহণকালে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় ছটা (Corona) বাহির হয়। বনবাসী মনে করিলেন বিমানস্থ কোন ভানুর ছটা হইবে। জ্যোতির্ম্ময় ভানু সূর্য্যের তেজ হরণ করিল। যথা—সূর্য্যের উদয়ে গগনের তারা অদৃশ্যভাবে থাকে। তাই অমর সিংহ বলেন—"তমস্তু রাহুঃ 'স্বর্ভানুঃ'।" চিন্তাশীল পাঠক বুঝিবেন—পদার্থ তিনটী পৃথক্, কিন্তু তাহাদের ব্যবসা এক। তাই অভিধানে তুল্যমূল্য হইয়াছে। একটী শব্দ অপর শব্দদ্বয়ের প্রতিশব্দ হইতে পারে না। তমঃ = স্বর্ভানু? বনবাসীর হৃদয় নিশার সহচর হুতুমের স্বরে কম্পিত হইত। ফলিত জ্যোতিষের আশীর্ব্বাদে হিন্দুর হৃদয় ফের বনবাসে গিয়াছে। টিকটিকার ডাকে রক্ষা নেই। তা ত হুতুম। তার নাম শুনিলেই "অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়ে থাকিয়ে।" এ সব অপূর্ব্ব মনুষ্যত্বের পরিচয়। কিন্তু হিন্দু মনে করেন না যে মূষিক ভক্ষণের গুণে ঐ হুতুম মা লক্ষ্মীর বাহন হইয়াছে। গৃহে আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করা হিন্দুর হিতজনক। মূষিক ঝড় গুণা-পড়া করিতে বেশ দৈবজ্ঞ। ভাবী ঝড়ের পূর্ব্বে জাহাজের নৌ-নিগড় তুলিলে মূষিক-দল জাহাজ হইতে লাফাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের জলে পড়ে এবং সাঁতার দিয়া কিনারা লয়। জাহাজের বিলাতী কাণ্ডারী ঠেকে শিখিয়াছেন যে, মূষিক চম্পট দিলে জাহাজ ভাসাইতে নাই। সেই মূষিক মনোজব বৃহস্পতির বাহন। বেদে "ত্বং গণানাং গণপতিঃ" বলায় দেবগুরু বৃহস্পতি গণেশ নামে সকলের আগে পূজা লইতেছেন। আবার

দিক্‌হস্তিগণ পৃথিবীতে জল ঢালে। আবার "বারিপূর্ণাং মহীং কৃত্বা পশ্চাৎ সঞ্চরতে গুরুঃ।" সঙ্কেত-তত্ত্বে হাতী বৃহস্পতির প্রতিকৃতি। তাই বলে "গণেশং পেটডগরং হাতীশুড়ং" নমোহস্তু তে।

পুরাণের আকাশগঙ্গা বেদের (আকাশ) সরস্বতী ছিলেন, কারণ উভয়েই ছায়াপথে অধিষ্ঠিত।

ছায়াপথ-তলে মকর রাশি অধিষ্ঠিত আছে এবং তাহার উত্তরে তারাহংস ও পার্শ্বে বীণা-মণ্ডল (Lyra) অবস্থিত আছে। তাই আকাশ গঙ্গাকে ধ্যান করি :—

"সিতমকরনিষণ্ণাং"

আর সরস্বতীকে নমস্কার করি—"বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে।" তারা হংস আকাশ গঙ্গার দূত। ভীষ্মদেবের নিকটে সংবাদ লইয়া গিয়াছিলেন। আবার তারাহংস সরস্বতীর বাহন।

দেবরাজ ইন্দ্র "বৃহৎ রথে" আরোহণ করেন।

"যত্র রথস্য বৃহতঃ বিধানম" (ঋক্) সর্প নহুষরাজ শচীলাভের দুরাশায় ব্রহ্মর্ষিগণ-বাহিত "শিবিকা" আরোহণ করিলেন। এই "বৃহৎ রথ" বা "শিবিকা" সপ্তর্ষিগণ গঠন করেন। বেবিলন নগরে এই বৃহৎ রথ "মার্গিড্ডা" নাম পাইয়াছিল। তর্জ্জমা রাজ য়ুরোপে সপ্তর্ষি-মণ্ডল Long Chariot নাম পাইয়াছে। কেহই মার্গিড্ডা বা Long Chariot কাহার সে খবর রাখেন না। ইন্দ্রের বৃহৎরথ বা শিবিকা সামান্য বস্তু নহে। দু'দিনের জন্য স্বর্গ-সিংহাসনে বসিয়া, ইন্দ্রের বৃহৎরথে নহুষরাজ উঠিলেন। অগস্ত্যের শাপে পরমব্যোম হইতে নহুষ "পপাত ধরণী-তলে"। তবে মণিপুরের রাজবংশ অদ্যাপি এই সর্পরাজকে নিত্য দুধকলা দিয়া পূজা করিতেছেন। এবং চীনসম্রাট এই সর্প-রাজকে রাজপতাকায় উড়াইতেছেন।

ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋষিরেখা কন্যা রাশিতে ছিল। তখন তারা কন্যা রাশি চক্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করিত। সিংহ রাশি কন্যার তলদেশে ছিল। প্রকাণ্ড জল-সর্প (Hydra) তারা কন্যার কর (হস্তা-নক্ষত্র) শোভিত করে।

সিংহবাহিনী তারা কন্যা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ও সৌম্যমূর্ত্তি এই উভয় মূর্ত্তিতে পূজিত। তারা সর্প একের করে এবং অন্যের স্কন্ধে বিরাজিত। পাঠক বুঝিয়া লইবেন। তারা কন্যার মাথার উপর ভূতেশ মণ্ডলে (Bootes) বলদেব বসিয়া আছেন।

বনবাসী দেখিতেন যে সর্প ও ব্যাঘ্র জীব বিনাশক। তাই তিনি মহাকাল রুদ্রদেবের দেহ "ব্যাঘ্রকৃত্তিবসানং" এবং সর্পশোভিত করিলেন। তারা ব্যাঘ্র (Lupus) বৃশ্চিক সর্পের তলে বসিয়া আছে। "সেই বুড় বলদ আছে পুঁজি" বুড় বলদ ছাড়িবে না। কাজেই ব্যাঘ্র বাহন হইতে পারিল না। ব্যাঘ্রচর্ম্ম বসন হইল। সুমেরুস্থিত বনবাসী দেখিলেন যে ছয়মাস স্থায়ী নিশার অবসানে রৌদ্রহীন বাল সূর্য্য বলির (Orion the Giant) শিরোদেশে উদিত হইতেছেন। ঘটনাটী দুই হাজার বর্ষের পূর্ব্বেকার। বাল সূর্য্য উঠিয়াও উঠে না। আপন খেয়ালে বসিয়া থাকিল। বনবাসী Parallanএর অধ্যায় ত পড়েন নাই, কাজেই অবাক্ হইলেন। তিনি দেখিলেন

বলির দ্বারে (Equinox) হরি বদ্ধ হইলেন। ক্রমে হরি-সূর্য্য বলির মস্তকোপরে উঠিয়া সৌম্য ধ্রুব হইতে যাম্য ধ্রুব পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করিয়া বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বনবাসী "নমস্তে বামন!" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে বাল-সূর্য্যকে প্রণিপাত করিলেন। বলি বামনের বাহন হইলেন এবং "বলির দ্বারে বামন বদ্ধ" প্রবাদ রটিল।

ভক্তিশূন্য সফোক্লিস্ দেখিলেন স্কন্ধ বলি বামন স্কন্ধে লইয়া পথ দেখিতে পাইলেন। গ্রীসদেশ হইতে ইয়ুরোপে "Dwarf on the Giant" প্রবাদ ভাসিল। বনবাসী দেখিলেন যে কালপুরুষ-মণ্ডলে (Orion) সুন্দর ময়ূর-পৃষ্ঠে স্কন্দদেব বসিয়া আছেন স্কন্দদেবের শিরোদেশে তারা কুক্কুট অবস্থিত রহিয়াছে। ময়ূর ও কুক্কুট উভয়েই রণদুর্ম্মদ, উভয়েই পরম রূপবান্। স্কন্দদেব চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত রণবীর কুমার খ্যাতি পাইলেন; যোদ্ধৃ-তারা (Bellatrix) তাহার সাক্ষী। গ্রীসদেশে কুমার Kanda-on [=the Prince] খ্যাতি পাইলেন। Scandinavia তাহার রাজ্য হইল। আবার নারীবেশে কুমারী ময়ূর-পৃষ্ঠে উঠিতে রাজি কি না সন্দেহ। তাই পড়ি—

"ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থে চ নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥"
(চণ্ডী)

গ্রীসদেশে কুমার (Orion) "Cock's fort উপাধিমাত্র পাইয়াছিলেন। ময়ূর বুঝি গ্রীসদেশে নাই?

তারাস্তবক মধুচক্র (Bee-hive) মাত্রাজে পুষ্যা নক্ষত্র। পুষ্যারথে হরি উঠিলেই বর্ষা আরম্ভ হইত এবং নববর্ষের আগমন হইত। রথযাত্রার দিনে হরির বাহন পুষ্যা রথ, গরুড় নহে। অয়নাংশের গতির ফলে উত্তর-অয়নান্ত বিন্দু (Summer Solstice) কর্কট-রাশিস্থ পুষ্যা-নক্ষত্র ছাড়িয়া মিথুনরাশিস্থ আর্দ্রা নক্ষত্রে আসিয়াছে। রথযাত্রার দিনে গোল বাধিল। সুচতুর মন্ত্রজীবী ঠকিবার নহে। "আষাঢস্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যা-সংযুতা', বচনের বলে হরির রথ আরোহণ চলিত হইল। "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" বচনের নজীরে মিথুন-রাশিস্থ হরি রথে উঠিলেন এবং রাশিচক্র পরিভ্রমণ উল্‌টা রথে দেখাইলেন। দুঃখ এইমাত্র যে দক্ষিণ-অয়নগামী হরির রথ দক্ষিণে যাইবে। উত্তর অয়ন-গামী হরির রথ উত্তর-অভিমুখে চলিবে। মূল অভিনয় কেহ দেখেও না—বুঝেও না। যিনি উপদেশ দিবেন তিনি দক্ষিণা গাঁটে বাঁধিয়া প্রস্থান করেন। হাটুরেরা যে দিকে রাস্তা পায় সেই দিকে রথ টানে আর রথে গোল বাধায়। হরির কি বিড়ম্বনা দেখ।

বর্ষারম্ভে রুদ্র সূর্য্য মহান্ শ্বা নক্ষত্রে (Dog Star) উপনীত হইয়া থাকেন। তখন য়ুরোপে "কুক্কুর দিন" (Dog days) উপস্থিত হয়। ভারতে রুদ্রদেব বলদ ছাড়িয়া কুকুরের পৃষ্ঠে চড়েন। তাহার নাম হইল "শ্বাশ্ব"। সেকালে হরি-সূর্য্য পুষ্যানক্ষত্রে উঠিলে তৎপরদিন তিনি তারা-জলসর্পের (Hydra) পৃষ্ঠে ভর করিতেন। হরির শয়ন আরম্ভ হইত। জলসর্প কর্কট হইতে বৃশ্চিক পর্য্যন্ত লম্ববান রহিয়াছে। তারা চিত্র দেখ, সত্য কি মিথ্যা।

জলসর্প অনন্তসর্প নাম ধারণ করিয়া সূর্য্য-হরিকে বৃশ্চিক রাশিতে লইয়া হাজির করিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে উত্থান একাদশীর

দিনে হরির দক্ষিণ অয়নজাত নিদ্রার অবসান হইল। সম্মুখে গরুড় (Aquila) উপস্থিত। অনন্ত সর্পকে বিদায় দিয়া হরি তাবা গরুড়-পৃষ্ঠে উঠিলেন। সমুদ্র-শয্যা পরিত্যক্ত হইল। য়ুরোপের কুকুব দিন ভারতের অম্বু-বাচি (বর্ষাবক্তা)। অম্বুবাচি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত হরি সূর্য্যের নিদ্রাকালে সূর্য্য-অগ্নিকে সচেতন করিতে নাই। তাই সূর্য্য-পক্ক অন্ন ও ফলমূল আহারে মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ দক্ষিণ অয়ন অতি-বাহিত করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মাছের ঝোল ব্যবস্থা। তবে হিন্দু বিধবা অম্বু-বাচি পালনে ও চাতুর্মাস্য ব্রত ধারণে দক্ষিণ অয়ন যাপন করেন বলিয়া বাঙ্গালায় হিন্দুয়ানী চলিতেছে।

কামাগ্নি ছাগে প্রবল। তাই অগ্নিব্রহ্মের বাহন ছাগ এবং ব্রহ্মমণ্ডলের (Auriga) প্রধান তারার নাম অজ (Capella)। অজ (গ্রীক Aiz) ইত্যাদি। য়ুরোপ বলেন অজ তারা এখানে কেন? রুদ্রদেব পবন-মূর্ত্তিতে ভূতেশমণ্ডলস্থ স্বাতি (সু-অতি) নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত।

"রোহিত" তারায় স্বাতি নক্ষত্র গঠিত হইয়াছে। বেদমতে রোহিত (মৃগবিশেষ), মরুৎগণের 'পৃষতী" রথ বহন করে। * রোহিত (Arcturus) মৃগ পবনের বাহন হইল। তাই দেখি মনোজব হরিণ মনোজব পবনের বাহন হইয়াছে। পবন দেব রক্তবর্ণ, রোহিত তারাও রক্ত বর্ণ।

তাই বলি

রূপে গুণে তুল্য যেই।
দেবের বাহন ভূষণ সেই॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং
তথা ভূষণ বাহনম্।

এ বচন কাণা করিব?

তাবাদর্শক।

* ... পৃষতীরথে
পার্ষিঃ বহতি রোহিতঃ।
(ঋক্)

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভ্যাগতের পূজা

পথে চলিতে চলিতে সঙ্গীয় ভৃত্যটিকে প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"তোমাকে কি আর কোন দিন দেখিয়াছি ?"

"আর এক দিন দেখিয়াছিলেন।"

"তোমার নাম বাহুক ?"

"হাঁ। একদিন সন্ধ্যা বেলায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন।"

"তোমার কর্ত্রী কেমন আছেন? সেদিন নিরাপদে ঘরে পৌছিয়াছিলেন?"

"আমাদের আর কোন বিপদ হয় নাই। কর্ত্রী ভালই আছেন।"

"তোমরা সেদিন কোথা হইতে আসিতেছিলে?"

'ঠাকুরাণী কোন প্রয়োজনে পাটলী গ্রামে গিয়াছিলেন।''

প্রমীত দেখিলেন বাহুক অধিক কথা কহিতে চায় না। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার কর্ত্রীর কোন পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। বাহুক নীরবে পথ দেখাইয়া চলিল।

নগরের যে অংশ দিয়া প্রমীত যাইতেছিলেন, তাহাতে অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরই বাস। পথের উভয়পার্শ্বে সুশোভন অট্টালিকার সারি। মধ্যে মধ্যে ফলের বাগান, ফুলের বাগান। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। গৃহে গৃহে গৃহ-বিগ্রহের আরতি, সান্ধ্যস্তুতি আরম্ভ হইল। শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে পল্লী মুখরিত হইল। ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল-গন্ধে সন্ধ্যার সুখদ মৃদুবায়ু সুরভিত হইয়া উঠিল। রাজপথে আলো ছিল না, কিন্তু উভয় পার্শ্বের পুরীপ্রবেশ-পথে এবং মুক্তবাতায়ন-পথে গৃহমধ্যস্থ দীপরশ্মি রাজপথে পড়িয়াছিল, সুতরাং পথ নিতান্ত অন্ধকারময় ছিল না।

বসন্তকাল; শীত নাই, গ্রীষ্মের আতিশয্যও হয় নাই। রাজ-পথে লোকচলাচলের অভাব নাই। পুষ্পমালাধারী, চন্দনচর্চ্চিত-দেহ সৌখীন যুবক, ব্যস্তসমস্ত ব্যবসায়ী, ভিক্ষার্থী খঞ্জ অন্ধ আতুর, দ্যূতকারী, সভিক, নট, বৈনিক, বৈণবিক, চঞ্চলা নগর-শোভিনী, চকিতনেত্রা অভিসারিকা, ভারিক, মালিক, বার্ত্তাবহ—রাজপথে অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল। অনেকে প্রমীত-সেনকে দেখিয়া নমস্কার অভিবাদন করিল, কিন্তু প্রমীত দ্রুতপদে চলিলেন। পরিচিত কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। পথের এক পার্শ্বে একটুকু জনতা হইয়াছিল। একজন মালী নানাবিধ সুগন্ধি ফুল, ফুলের মালা, মুকুট, বলয়, কুণ্ডল ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছিল। কয়েক জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য নির্ব্বাচন করিতেছিল। প্রমীতসেন পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সোমদত্ত সেখানে ছিলেন, তিনি প্রমীত এবং তৎসহচর বাহুককে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রমীত জানিতে পারিলেন না। কিন্তু সোমদত্ত মালা-ক্রয় পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

বাহুক অবশেষে প্রমীতসেনের অপরিচিত এক পল্লীতে একটী বৃহৎ বাটীর নিকট উপস্থিত হইল। দ্বারবান দ্বার খুলিয়া দিল। প্রহরীরা নমস্কার-অভিবাদন করিল। আলোকিত প্রবেশ-পথ অতিক্রম করিয়াই ফুলের উদ্যান অদূরেই উচ্চ দ্বিতল গৃহ, গৃহের কক্ষে কক্ষে দীপালোক। প্রমীত সিঁড়ির নিকট পৌঁছিতেই দুই তিন জন পরিচারিকা প্রণাম করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেল। প্রথম কক্ষেই একটী প্রৌঢ়বয়স্কা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি প্রমীতসেনকে অভিবাদন করিলেন, প্রমীতসেনও প্রৌঢ়াকে নমস্কার করিলেন। প্রৌঢ়া বলিলেন;—

"আমাদের আজ কত সৌভাগ্য! আপনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমা-

দিগকে চরিতার্থ করিলেন। আমার কন্যাকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আপনি আমাদিগকে চির-অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার কন্যা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চঞ্চলা, ইঁহাকে লইয়া যা।”

চঞ্চলা প্রমীতসেনকে লইয়া এক সুসজ্জিত দীর্ঘ বারান্দা দিয়া চলিল। বাম পার্শ্বে কক্ষের পর কক্ষ, দক্ষিণ পার্শ্বে মর্ম্মরে আচ্ছাদিত প্রশস্ত অঙ্গন, তাহার অপর তিন দিকে দ্বিতল পর্য্যন্ত সারি সারি আলোকিত কক্ষ। এই ‘উপকৃতা’ কে, কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী?—প্রমীত কিছুই জানেন না। কিন্তু সেই পুরীর বিশালত্ব এবং সজ্জিত মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, ‘উপকৃতা’ যিনিই হউন, তিনি প্রভূত-সম্পত্তিশালিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই দুর্দ্দিন অন্ধকারে অস্পষ্ট-আলোকদৃষ্টা, বাক্‌চতুরা, আলুলায়িতকুন্তলা অপূর্ব্বসুন্দরী তরুণীর মূর্ত্তি বারবার তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। আজ তাঁহারই গৃহে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে। প্রমীতসেনের চিত্ত কৌতূহলে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

চঞ্চলা পরিশেষে একটী কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রমীতসেনকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল :—

“আমার কর্ত্রী এই কক্ষে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

প্রমীত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহাসুগন্ধি তৈলপূর্ণ প্রদীপে প্রদীপে সমগ্র কক্ষ আলোকিত। একটী সুন্দরী যুবতী মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি বিনীত নমস্কার করিল। সমীপস্থা অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর প্রতি স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিক্ষেপ অসম্ভব। নিমেষমাত্র প্রথম দৃষ্টিতে প্রমীত যাহা দেখিলেন তাহাতেই তিনি অতি বিস্মিত হইলেন, ক্ষণকাল নীরব স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ইনি সেই নগর প্রবেশ-পথের আকুল-কুন্তলা ‘উপকৃতা’ই বটেন! কিন্তু আরও কোথায় যেন ইঁহাকে দেখিয়াছি! কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই, তাঁহাকেই প্রথমে কথা কহিতে হইল।

‘আপনি আমাকে পত্র পাঠাইয়াছিলেন?”

মস্তক নত করিয়া রমণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন ;—

“অধিনীই এই দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে।”

রমণীর বিনীত নির্দ্দেশে কক্ষ মধ্যে অনতি-উচ্চ বিস্তৃত পালঙ্কে সুকোমল আসনে প্রমীত উপবেশন করিলেন। আসনের চারিপার্শ্বে, কক্ষের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিপদার উপর থালে থালে সুগন্ধি ফুল, ফুলদানে ফুলের স্তবক। শ্বেতরক্তনীলপীত নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তরে গ্রথিত চিত্রিতবৎ অতি সুন্দর ফুল-ফল-তরুলতার ছবিতে কক্ষের দেয়াল ও মেঝে সুশোভিত। একপার্শ্বে অতিপুরু সুখ-স্পর্শ কম্বলাসন, তাহার উপর ধৌত পট্টবস্ত্রের আচ্ছাদন। কক্ষের সমস্ত তৈজসপত্র মূল্যবান এবং সুদৃশ্য। গৃহের বৈভব-শ্রী দেখিয়া প্রমীত অতি বিস্মিত হইলেন।

রমণী নিকটেই দেয়ালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—

“আমার প্রার্থনা, আমাকে ‘আপনি’ বলিবেন না।”

"আমাকে 'আপনি' বলিতেছেন, আমি কেন বলিব না ?"

"আমি তদুপযুক্ত লোক নহি। আপনি আমার কোন পরিচয় পান নাই। আমি—"

"আপনাকে কি কাল বসন্তোৎসবে দেখিয়াছি ?"

"অসম্ভব নহে; উৎসবে আমি গীত গাহিয়াছিলাম।"

ইনিই সেই মঞ্জুলা। বেশভূষার সে উৎসবোচিত পারিপাট্য নাই, মণি-মাণিক্য-খচিত সে অলঙ্কার-সমাবেশ নাই। কিন্তু গৌরদেহের কি অপূর্ব্ব লাবণ্য-ছটা। শ্বেতকুসুম-মাল্যবিজড়িত দীর্ঘ কেশরাশির কি তরঙ্গায়িত লীলা। বিদ্যুদ্গর্ভ স্থির আরক্ত চক্ষুর কি বিনম্র মধুর দৃষ্টি! প্রমীলেন আর সময় পাইলেন না, বলিলেন,—

"আপনি—আপনার—"

"আমি অতি সামান্য স্ত্রীলোক।"

"আপনার—"

মঞ্জুলা অতি বিনীত স্বরে বলিল;—

"আমাকে 'আপনি' বলিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

"আমার বন্ধু অসঙ্গ সেন মহাশয় আপনার পরিচয়—"

"আমার প্রার্থনা!"

"তাহাই হউক।—তোমার পরিচয়, গুণ-কাহিনী আমাকে বলিয়াছেন। আপনি প্রসিদ্ধ বিদুষী এবং গুণবতী। আমার দুর্ভাগ্য, আমি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন আপনার—তোমার গৃহে আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার সুখের অধিকারী হই নাই। সে দিন মানুষের অবশ্যকর্ত্তব্য অতি সামান্য কাজ করিয়া যদি তোমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া থাকি, তবে আমি বড়ই ভাগ্যবান।"

"সে দিন আপনি উপস্থিত না হইলে আমার যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা মনে করিতে ভয় হয়, আপনি চিরকালের জন্য আমাকে ঋণী করিয়াছেন। সে দিন আমি নিজ পরিচয় দিতে সাহস পাই নাই, আমার সে অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।"

"অপরিচিত পথিকের নিকট আত্মপ্রকাশ না করিলে কি কোন রমণীর অপরাধ হয় ?"

"আমাকে হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। এতদিন আমি কোন সুযোগ পাই নাই। তাহার পর রাজাধিরাজের মৃগয়া-যাত্রার দিন ভিক্ষু উপগুপ্তের কৃত অপরাধের জন্য নগরপাল আপনাকেও বন্দী করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত নগরবাসী আপনার বিপদে অতি দুঃখিত হইয়াছিল। আপনার সুকৃতি বলে আপনি রক্ষা পাইয়াছেন।"

"আমি যে কেমন করিয়া কাহার অনু-রোধে অব্যাহতি পাইয়াছি, তাহা এখনো জানিতে পারি নাই। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়, তিনি আমাকে সর্ব্বদা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক অনুনয়ে, অনেকের অনুরোধেও প্রথম দিন তিনি আমাকে মুক্তি দেন নাই। তৃতীয় দিন কেন যে হঠাৎ আমার মুক্তিলাভ হইল, আমি তাহা এখনো জানিতে পারি নাই।"

"আপনি নিরপরাধী, ধর্ম্মপাল মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় শেষে আপনাকে মুক্তি দিয়াছেন। আপনার মুক্তিতে আমরা কত আনন্দিত হইয়াছি!—অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শেষে আজ অতি সাহসে

পত্র পাঠাইয়াছিলাম। আমার সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।"

"ধৃষ্টতা!—তোমার মত গুণবতীর সদয় অনুগ্রহ। আমারও এক প্রার্থনা আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমি যে পরমসুখে বঞ্চিত ছিলাম, আজ হইতে যেন তাহার অধিকারী হইতে পারি। তোমার গৃহে অনেক জ্ঞানী এবং সুধী লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আমার মত অকিঞ্চিৎকর লোককেও তুমি তোমার গৃহে সময় সময় আসিবার অনুমতি দিয়া আমাকে আনন্দিত করিবে?"

"আপনি আমার পরিচয় পাইয়াছেন, আমার সকল কথা শুনিয়াছেন?"

"শুনিয়াছি।"

"কেহ কেহ এখানে আসিয়া থাকেন, আপনিও কি ভবিষ্যতে আসিবেন?"

"আসিবার অনুমতি পাইলে পরম সুখী হইব।"

"এ গৃহের দ্বার আপনার নিকট সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, যখন আপনার ইচ্ছা হইবে, আসিলে আমি নিজেকে অতি সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিব।"

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন ;—

"দেখিতেছি, সে দিনের সেই ঝড়বৃষ্টি-দুর্য্যোগেই আমার এই সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল।"

"সৌভাগ্য ত আমার!"

"উৎসবে তোমাকে দেখিয়া তুমিই যে সেই দুর্য্যোগ-রাত্রির বিপন্ন রমণী, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মঞ্জুলার মুখও স্মিত প্রভাসিত হইয়া উঠিল। চিত্রা এবং চঞ্চলা কক্ষের একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চঞ্চলা পাশের ঘর হইতে একখানি থালা লইয়া আসিল। থালাখানি ফল, ফুলের মালা, অগুরু-চন্দন এবং গন্ধচূর্ণে পরিপূর্ণ। মঞ্জুলা সেই থালা প্রমীতের পদপ্রান্তে রাখিয়া যুক্ত করে বলিল :—

"আমার এই সামান্য পূজা গ্রহণ করুন।"

প্রমীতসেন তরুণীর বাক্‌পটুতায় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন — "আপনি—তুমি এই অকিঞ্চিতের সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছ।"

প্রমীতসেন সেই থালা হইতে চন্দন গ্রহণ করিলেন এবং একটী সুরভি মালা লইয়া তাহা মস্তক বেষ্টন করিয়া পরিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রি হইল। প্রমীতের গৃহে ফিরিবার সময় হইয়াছে। মঞ্জুলার ইঙ্গিতে চঞ্চলা আর একখানি থালা আনিল। থালার উপর সূক্ষ্ম ধৌত বস্ত্রের আচ্ছাদন, তাহার উপর অতি সুগন্ধি ফুল ফুলের মালা ও চন্দন প্রক্ষেপ। চঞ্চলার হাত হইতে সেই থালা লইয়া মঞ্জুলা বলিল ;—

"সে রাত্রিতে আপনার গায়ের যে ওড়নি আমাকে দিয়া আমার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সেই খানি।"

আবরণ উন্মুক্ত করিয়া পুষ্পচন্দনসুরভি সেই ওড়নিসহ থালাখানি মঞ্জুলা প্রমীতের সম্মুখে স্থাপন করিল।

"একদিন ব্যবহার করিয়া আমি এই মহার্ঘ ওড়নির অবমাননা করিয়াছি, আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বাহক আজ ইহা আপনার গৃহে দিয়া আসিবে।"

"এই সামান্য বস্ত্র আপনার—তোমার

গাত্রস্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছে, আমি আর এ ওঢ়নি ব্যবহার করিবার অধিকারী নই। এখানি আপনার গৃহেই থাকুক।”

“আমার গৃহে থাকিবে অনুমতি করিতেছেন!—আমার গৃহে ইহা চিরদিন পূজিত হইবে।”

মঞ্জুলা তখন অতিনমিত মস্তকে প্রমীতকে নমস্কার করিল। তখন প্রমীত উঠিলেন। অপরকক্ষে মঞ্জুলার মাতাকে নমস্কার অভিবাদন করিয়া প্রমীতসেন বিদায় হইলেন। বাহক আলো জ্বালিয়া তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিল।

প্রমীতসেন চলিয়া গেলে মঞ্জুলা পুনরায় সেই দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিল। গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া গ্রহচন্দ্রতারকাখচিত আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন কেমন উন্মনা, মুখ যেন কেমন উচ্ছ্বসিত। মঞ্জুলা তারপর গৃহস্থ উজ্জ্বল দীপের নিকট দাঁড়াইয়া মুকুরে নিজের মুখচ্ছবি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। মুকুর রাখিয়া দিয়া পুষ্পদামে শ্লথ জড়িত সেই দীর্ঘ কৃষ্ণকুঞ্চিত কুন্তলরাশি অংসের উপর দিয়া বক্ষের দিকে আনিয়া হস্তদ্বারা যেন তাহার মসৃণ কোমলত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কেশরাশি পৃষ্ঠে সরাইয়া দিয়া আপনার অঙ্গুলিদাম, প্রকোষ্ঠ, বাহু, অংস—সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিল। শেষে নিঃসহ শরীরে শয্যায় শুইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিল, “অত কথা বলিয়াছি, তিনি আমাকে মুখরা মনে করিবেন।”

চঞ্চলা নীরবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, বিস্মিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল,—

“শুইয়া পড়িয়াছ! কেন, তোমার কোন অসুখ হইয়াছে?”

মঞ্জুলা চমকিত হইল, বলিল,—

“না, কিছুই হয় নাই!”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রক্ষা-কবচ

এই স্থানে আমরা পূর্ব্ব কথা কিছু বলিব। পাঠক মঞ্জুলা অথবা অলোকার বিশেষ পরিচয় এতক কিছুই পান নাই।

অলোকা এক ধনাঢ্য ভদ্র পরিবারের কন্যা। প্রথম বয়সেই তিনি বিধবা হন। তাঁহার চরিত্রও মন্দ হইয়া যায়। শ্বশুরকুল পরিত্যাগ করিয়া অলোকা তৎকাল-প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ধনী রাজকুটুম্ব বিশাখদত্তের গৃহে আসিয়া বাস করেন। এইখানেই তাঁহার কন্যা মঞ্জুলার জন্ম হয়। বিশাখদত্ত বিপত্নীক ছিলেন, মঞ্জুলাকে তিনি কন্যানির্ব্বিশেষে লালন পালন করেন। বিশাখদত্তের মৃত্যু হইলে অলোকা ও মঞ্জুলা অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু তাঁহাদের অভিভাবক কেহ ছিল না। বিশাখদত্তের পিতৃব্য-পুত্রী রাজ্ঞী কারুবকী বালিকাকে কাছে আনিয়া তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হন এবং প্রচ্ছন্ন রক্তসম্বন্ধে স্নেহার্দ্র হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। মঞ্জুলা জনকের গৃহে মাতার নিকটেই রহিল, কিন্তু মহারাজ্ঞীর স্নেহ এবং অনুগ্রহের পাত্রী বলিয়া সংসারে তাহার কোন অভাব রহিল না। উপযুক্ত গুরুর নিকট বালিকা লেখাপড়া, নৃত্যগীত এবং নানাবিধ ললিতকলায় সুশিক্ষিতা হইতে

লাগিল। রাজ্ঞী সময় সময় মঞ্জুলাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া লইয়া তাহার শিক্ষা এবং ব্যবহারের পরীক্ষা করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলোকার চরিত্রও সংশোধিত হইয়াছিল। সেকালে আর একালে অনেক প্রভেদ। একালের রূপজীবিনীরা সমাজে যেরূপ হীন, সেকালে সর্ব্বথা সেরূপ ছিল না। সেকালের কোন কোন নগর-শোভিনী উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া অটুট মানসম্ভ্রমের সহিত দিন কাটাইতে পারিত। শিক্ষিতা এবং গুণসম্পন্না হইলে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়েও তাহার মর্য্যাদা স্বীকৃত হইত। তাহার আমন্ত্রণে সমাজের অগ্রণীরাও তাহার গৃহে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এরূপ নগরশোভিনীরা গীতবাদ্য, নানাবিধ সুকুমার কলাবিদ্যা এবং বাক্‌চাতুর্য্যে ধনী মানী শিক্ষিত সমাজের চিত্ত বিনোদন করিত। অনেক সময় ইহাদের পুত্রকন্যা ভদ্রসমাজে বিবাহিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজভুক্ত হইত। অলোকাও কালে সমাজে এইরূপ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

যৌবনোদ্গমে মঞ্জুলা অসামান্য রূপবতী হইয়া উঠিল। তাহার পাণিগ্রহণার্থীর অভাব ছিল না। তাহার শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার, রূপলাবণ্য, ধনসম্পত্তি অনেকের চিত্ত প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অভিভাবিকা রাজ্ঞী তাহার বিবাহে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনায় স্নেহ-পালিতা, রূপসী, ধনশালিনী মঞ্জুলার অনুরূপ বর মিলিয়া উঠিল না।

প্রমীতসেন বন্ধু অসঙ্গের মুখে অলোকা এবং মঞ্জুলার অনেক কথা শুনিয়াছিলেন।

সে দিন বাড়ীতে পৌছিতে প্রমীতসেনের অনেক রাত্রি হইল। এদিকে উৎপলা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কি আশঙ্কা, কেন আশঙ্কা, উৎপলা তাহা বিচার করেন নাই, তথাপি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। রাত্রিকালে একা একা নগরপথে চলা যদিও সকল সময় নিরাপদ নহে, তথাপি চোর-দস্যু প্রভৃতি দ্বারা যে স্বামীর কোন বিপদ ঘটিতে পারে, উৎপলার সে বিশ্বাস ছিল না। নগরে তিনি সুপরিচিত, বিশেষতঃ তিনি অপরিমিত শারীরিক বলশালী, হঠাৎ কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সাহস পাইবে না। সঙ্গে প্রলোভনের বস্তু কিছুই নাই, সুতরাং চোর-দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও কম। পথ-ঘাটও তাঁহার অপরিচিত নহে। কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, সঙ্গী প্রহরী অথবা বাহক কি অশ্ব সংগ্রহ তাহার পক্ষে অতি সহজ। তবে এই জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী রজনীতে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর আমন্ত্রণ, একাকী গমন, স্বচ্ছন্দ আলাপের অবসর— মনে করিতে উৎপলার মুখ লজ্জা-অভিমানে রক্তিমাভ হইল। না; সেরূপ কোন আশঙ্কা আসিতেই পারে না। স্বামীর প্রতি উৎপলার ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অসীম এবং অচল। কিন্তু মহার্ঘ মণিরত্ন অরক্ষিত অবস্থায় পথে ঘাটে ছড়াইয়া চোরদস্যুকে প্রলোভিত করা কি উচিত? অথবা প্রাণপ্রিয় আত্মীয় অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর— ডাকিনী কি মায়াবিনীর!—আহ্বানে একক পাঠাইয়া গভীর বিশ্বাস এবং অচলা শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে যাওয়াই কি সঙ্গত?—কি আশঙ্কা, কেনই বা আশঙ্কা, উৎপলা তাহার

বিচার করেন নাই, তথাপি তিনি বিষম উদ্বিগ্না হইলেন। এত বিলম্ব কেন ?

বাড়ীতে পৌঁছিতে সে রাত্রিতে প্রমোদ-সেনের অনেক বিলম্ব হইল। প্রমোদ অন্তঃপুরে পৌঁছিলে উৎপলা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কিগো, ঘর বাড়ী ভুলিয়া গিয়াছিলে না কি ?"

"তাই ত! ঘর বাড়ী ভুলিয়া, কোন্ পথে, কোথায়, কাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম ?"

"বটে ?"—স্বামীর হাত ধরিয়া উৎপলা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

" 'উপকৃতা'র সঙ্গে দেখা হইল ?"

"হইয়াছে।"

"কেমন লোক ?"

"অপূর্ব্ব সুন্দরী।"

"তাহা ত অনেক দিন হইতেই জানি। কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী ?"

"শুনিবে ?"

উৎপলা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"উপকৃতা—মঞ্জুলা !"

মঞ্জুলা! উৎপলা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

"মঞ্জুলা !—কেমন করিয়া জানিলে ?"

"দেখিয়াই চিনিলাম। বৃষ্টি-দুর্য্যোগের দিন ইঁহাকেই দেখি, গতকল্য উৎসবে ইঁহাকেই দেখিয়াছি। ইনিই সেখানে গীত গাহিয়াছিলেন।"

উৎপলা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন;—

"তুমি কি জানিতে যে, মঞ্জুলাই 'উপকৃতা' ?"

"আগে আর কেমন করিয়া জানিব ?—মঞ্জুলাকে উৎসবে দেখিয়াছি, মঞ্জুলাই যে সে দিনের সেই উপকৃতা, তাহা ত আজ এই মাত্র জানিয়া আসিলাম।"

"মঞ্জুলা কে, কাহার কন্যা—তাহা শুনিয়াছ ?"

"শুনিয়াছি।"

"কাহার নিকট শুনিলে ?"

"অসঙ্গের নিকট শুনিয়াছি।"

"কি শুনিয়াছ ?"

প্রমোদ তখন অসঙ্গের নিকট শ্রুত মঞ্জুলার পরিচয়-সূচক অনেক কথা উৎপলাকে বলিলেন। শুনিয়া উৎপলার বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল।

প্রমোদ নিজ মস্তকে জড়ান সেই ফুলের মালা খুলিয়া তাহার লহর বিস্তার করিয়া অতি আদরে উৎপলার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। মহাসুরভি ফুলের মালা, কৌশলময় তাহার গাথনি। স্বামীর প্রণয়োপহারে উৎপলার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কোথায় পাইলে ?"

"মঞ্জুলার পূজোপহার।"

উৎপলার শরীর শিহরিয়া উঠিল। নগর-শোভিনীর ছদ্ম প্রেমোপহার! অথবা মন্ত্রসিদ্ধ গুপ্ত মোহনাস্ত্র ? কিন্তু তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে সন্দেহ স্থান পাইল না। উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—

"অমন সুন্দরী, অমন মিষ্ট গায়িকার পূজায় ত চিত্ত হারাইয়া এস নাই ?"

"এ চিত্ত হারাইবার ভয় নাই।—দিবা রাত্রি সুরক্ষিত!"

"এমন নিত্যজাগ্রত রক্ষাকবচ তোমার কি আছে?"

"তোমার পবিত্র মুখ!"

প্রমীত স্ত্রীর হর্ষ-প্রফুল্ল মুখ চুম্বন করিলেন।

"—তোমার স্ফুরদুজ্জ্বল চক্ষু!"

প্রমীত স্ত্রীর সত্বনিমীলিত মৃদু কম্পিত চক্ষু চুম্বিত করিলেন।

"—এ হৃদয়ে স্থির প্রতিষ্ঠিত প্রেমোজ্জ্বল তোমার মধুর মূর্ত্তি!"

উৎপলা উচ্ছ্বসিত গাত্রে স্বামীর বাহু বেষ্টন হইতে ছুটিয়া পলাইয়া কক্ষদ্বারের নিকট গিয়া বলিলেন;—

"মাধবী, মাধবী, আজ কি আমাদের আহারাদি হইবে না?"

সেদিন গভীর রাত্রিতে কি যেন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রমীত হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন;—

"অপূর্ব্ব সুন্দরী!"

পার্শ্বে শয়ানা উৎপলা সে শব্দে অর্দ্ধ-জাগরিত হইয়া নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কি বলিতেছ?"

প্রমীত নিদ্রিত।

উৎপলাও পুনরায় সুষুপ্তি লাভ করিলেন।

(ক্রমশঃ।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বৈদিক সাধনার আভাস

ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্য্য

১। তৎকালে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, রজঃ অর্থাৎ পাতালাদি পৃথিব্যন্ত লোক সকল ছিল না, ব্যোমোপরি বিস্তৃত যাহা (অর্থাৎ দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত) তাহাও ছিল না। কি আবরণ করিবে? কোথায়? কাহার সুখদুঃখহেতু? গহন, গভীর অম্বুই কি ছিল?

তাৎপর্য্য :—তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে অসৎ ছিল না, কারণ জগতের মূলকারণ ছিল। প্রলয়কালে জগতের মূলকারণ না থাকিলে, পরে জগতের উৎপত্তি সম্ভবে না। সৎও ছিল না, কারণ সদ্রূপে অর্থাৎ পৃথক্‌সত্তাভাবে জগতের অস্তিত্ব ছিল না। এইরূপে জগতের সত্তা ও অসত্তা উভয়ই অস্বীকৃত হইল। সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, ইহারা বিপরীত পদার্থ, ভেদমূলক। ইহাদের একত্র অবস্থান পর্য্যন্ত সম্ভবে, যেমন—যেখানে একের সত্তা, সেখানে অন্যের অসত্তা। কিন্তু ইহাদের একত্ব কিরূপে সম্ভবে? একই পদার্থের নির্ব্যূঢ় সত্তা ও অসত্তা কিরূপে হইতে পারে? প্রলয়কালে হইতে পারে; কারণ, সদসদাত্মক ভেদ তখন ছিল না; ভেদ না থাকায় সত্তা বা অসত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। "অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না" বলিবার

ইহাই তাৎপর্য্য। সৎ ছিল না এই কথায় আশঙ্কা হইতে পারে যে,পারমার্থিকসত্তা ব্রহ্মও ছিল না। দ্বিতীয় ঋকের "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং," এই বাক্যদ্বারা এই আশঙ্কা নিরাকৃত হইতেছে। মায়ার পরিশেষ অর্থাৎ লয় হেতু তাহারই অনস্তিত্ব "সৎ ছিল না" এই বাক্যদ্বারা সূচিত হইয়াছে। বলিতে পার যে, ব্যবহারদশাতেও পরমার্থতঃ মায়ার অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তা নাই সুতরাং 'তৎকালে" এই বিশেষণ অনর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্যবহারদশায় পৃথিব্যাদি ব্যবহারিক সৎ পদার্থের অস্তিত্ব আছে। অতএব "সৎ ছিল না" এই নিষেধ পৃথিব্যাদির বর্ত্তমানকালে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্য ঋষি পুনর্বার বলিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবনও ছিল না। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় মায়ার পারমার্থিকসত্তা না থাকিলেও, পৃথিব্যাদিরূপে ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু তৎকালে প্রলয়কালে, মায়ার পারমার্থিকসত্তা ব্যবহারিক সত্তা উভয় সত্তাই ছিল না। ভাল. ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ডের আবরক আকাশাদি কি ছিল? না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডকে আবরণ করিয়া থাকে (বিষ্ণুপুরাণ, ১,২,৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য)। ঋষি প্রশ্নচ্ছলে এই সকল আবরকেরও অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছেন। কি আবরণ করিবে? আবার্য্য পদার্থ থাকিলে, তবেই ত তাহার আবরক থাকিতে পারে? যেখানে আবার্য্য ব্রহ্মাণ্ডই নাই, সেখানে আবরক বিয়দাদি থাকিবে কিসের জন্য? আবার, কোথায় আবরণ করিবে? কোন্ প্রদেশে অবস্থান করিয়া আবরক আবরণ করিবে? প্রলয়কালে আধারভূত এরূপ কোন দেশও ছিল না। আবার, কাহার সুখদুঃখ হেতু আবরণ করিবে? জীবগণের উপভোগার্থই সৃষ্টি। সৃষ্টি থাকিলেই ব্রহ্মাণ্ডের আবরক থাকে। সৃষ্টি না থাকিলে ভোক্তা জীবসকল লয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কোন পদার্থের কেহ ভোক্তা থাকে না। এইরূপে আবরণের প্রয়োজনীয়তা লোপ পাইলে, আবরক থাকে না। সংক্ষেপতঃ, ঋষি বলিলেন যে প্রলয়কালে ভোগ্যপ্রপঞ্চ ও ভোক্তৃপ্রপঞ্চ—উভয়ই ছিল না। পুনশ্চ, আবরণসহ ব্রহ্মাণ্ডের অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে, অম্ভ অর্থাৎ জলেরও অনস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তথাপি ঋষি পুনর্বার প্রশ্ন করিতেছেন, অম্ভই কি ছিল? ইহার কারণ কি? যে প্রলয়ের কথা বলা হইতেছে, ইহা ছাড়া অপর আর একরূপ প্রলয় আছে। প্রতি কল্পান্তে ব্রহ্মা নিদ্রিত হইয়া, এক কল্প পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন। ব্রহ্মার এই নিদ্রাকালে ভূ, ভুব, স্ব এই তিনলোক দগ্ধ হইয়া একার্ণব হইয়া যায়। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।৫।১; বিষ্ণুপুরাণ ১।৩।২০-২৩ দ্রষ্টব্য।) এই প্রলয়কে নিষিদ্ধ করিবার জন্যই উক্ত প্রশ্ন। বর্ত্তমান সূত্রে ঋষি নির্দ্দিষ্ট প্রলয় এরূপ আংশিক একার্ণবী প্রলয় নহে। ইহাতে জলের অস্তিত্ব নাই।

২। সেই সময়ে মৃত্যু ছিল না, অমৃত অর্থাৎ অমরণও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রজ্ঞান ছিল না। স্বধার অর্থাৎ মায়ার সহিত এক সেই (ব্রহ্মতত্ত্ব) অবাত-প্রাণিত ছিল, তাহা হইতে অন্য পরকালীন কিছুই ছিল না।

তাৎপর্য্য :—প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া যে তাহার বিনাশক মৃত্যু ছিল, তাহা নহে; আর মৃত্যু ছিল না বলিয়া যে অমরণ ছিল, তাহাও নহে। অর্থাৎ সেই ভেদরহিত অবস্থায় মৃত্যু ও অমৃত্যু—ভেদমূলক এই দুই বস্তুই ছিল না। সর্ব্বজীবের পরিপক্ক কর্ম্মসকলের যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেই সময়ে পরমেশ্বরের মনে জগৎ-সংহারের ইচ্ছা হয়। অনন্তর তিনিই মৃত্যুরূপে জগৎ সংহার করেন। অতএব প্রলয়কালে মৃত্যুরই বা স্থান কোথায় এবং তদভাবভূক্ত অমৃত্যুরই বা স্থান কোথায়? জীবের ভোগের জন্যই মৃত্যু ও অমরণরূপ পরিবর্ত্তনের লীলা। ভোগ ফুরাইলে এই লীলাও ফুরায়। তখন রাত্রিও থাকে না, দিনও থাকে না, অর্থাৎ, অহোরাত্র, মাস, দিন, সংবৎসর প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কাল থাকে না। কালের কোলে জীব ক্রীড়া করে। কালে সে সুখী হয়, কালে দুঃখী হয়, কালে জন্মে, কালে মরে। এইরূপে জীবের সুখদুঃখহেতু কালের প্রয়োজন ও অস্তিত্ব। পুনশ্চ, সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়ই কালের হেতু। প্রলয়ে এই সকল হেতুর অভাবে কালের অভাব হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি কাল ছিল না, তাহা হইলে "তৎকালে সৎ ছিল না" এই কাল নির্দ্দেশ কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, উপচারহেতু অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা মায়াহেতু এই কালের নির্দ্দেশ। মানুষ যখন কোন বিষয়ের নিষেধ করে, তখন কাল সেই নিষেধের অবচ্ছেদক হইলেও মায়া ঐ অবচ্ছেদের হেতু। মায়ার অধীন জীব মায়ারহিত অবস্থার যথাযথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, এবং জৈব ভাষাও মায়াজনিত কালকে বাদ দিয়া ঐ অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্য অবচ্ছেদকত্ব-রহিত অকাল-অবস্থাকেও কালবাচক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হয়। এইরূপে প্রলয়কালে আবরণসহ ব্রহ্মাণ্ড, মৃত্যু, অমৃত্যু ও কাল অর্থাৎ ভেদমূলক ও ভেদরূপী সমস্ত পদার্থই নিষিদ্ধ হইল। তাহা হইলে তৎকালে কি ছিল? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—সেই সকল বেদান্তপ্রসিদ্ধ এক ব্রহ্মতত্ত্ব ছিল। জীবের নিকট প্রাণই অস্তিত্বের নিদর্শন এবং প্রাণ বায়ুমূলক। ব্রহ্ম কি এইরূপ বায়ুমূলক প্রাণদ্বারা প্রাণিত ছিলেন? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—ব্রহ্মের অস্তিত্ব বায়ুর উপর নির্ভর করে না, তাঁহার প্রাণ অবাত অর্থাৎ বায়ুর অপেক্ষা রহিত। যদি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই ছিল, তবে জগৎকারণ সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা মায়া কোথায় গেল? (স্বধা=মায়া। স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্ততে ইতি স্বধা। নিজেতে ধারণ বা আশ্রয় করিয়া যে থাকে সেই স্বধা বা মায়া বা প্রকৃতি।) মায়া সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত এক হইয়া অবিভক্তরূপে ছিল। ঋষির এই বাক্য দ্বারা মায়া বা প্রকৃতির সদ্রূপত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক নির্ব্যূঢ় সত্তা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। বলিতে পার, মায়া যদি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াছিল, তাহা হইলে ব্রহ্মসত্তাকে অবাতপ্রাণিত বলিলে কিরূপে, এবং ব্রহ্মসত্তায় যখন মায়াসত্তা ছিল, তখন "সৎ ছিল না" এ কথাই বা বলিলে কিরূপে? এরূপ আশঙ্কা অমূলক; কারণ, ব্রহ্ম ও মায়াকে ভিন্নরূপে দর্শন-হেতুই

তাহাদের ঐক্যাবভাস হয়, একরূপে দর্শন করিলে মায়াংশের বিভিন্ন সত্তা থাকে না এবং ব্রহ্মেরই সত্তা প্রতিপাদিত হয়।

৩। তমঃ ছিল, এই সব্ব (জগৎ) অগ্রে, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্‌কালে প্রলয়াবস্থায়, তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অনির্দ্দেশ্যরূপে লীন হইয়াছিল। তুচ্ছ তমঃ দ্বারা যাহা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত ও তাহার সহিত একীভূত ছিল, তাহা তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য্য :—যদি প্রলয়কালে জগৎ না ছিল, তাহা হইলে পরে তাহা আসিল কিরূপে? কারক না থাকিলে ক্রিয়া হয় না, সুতরাং জায়মান জগতের জন্মক্রিয়ার কারক অবশ্যই ছিল। পুনশ্চ, কারক কারণের রূপান্তর মাত্র। অতএব জগৎসৃষ্টির প্রাক্‌কালে জগতের কারক বা কারণ থাকা অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ঋষি বলিতেছেন যে, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তমঃ ছিল এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ ঐ তমঃদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অপ্রকেত বা অনির্দ্দেশ্য বা অনির্বাচ্যরূপে তাহাতে লীন হইয়া ছিল। তমঃ অর্থে ভাবরূপ, অর্থাৎ সংস্কাররূপ, অজ্ঞান, আত্মতত্ত্বের আবরক অপর মায়া বা অবিদ্যা। ইহাই জগতের মূল কারণ, ইহার দ্বারাই জগৎ গঠিত এবং ইহাই জগৎ। প্রলয়কালে জগৎ নামরূপের দ্বারা বিস্পষ্ট ছিল না। পরন্তু তৎকারণ যে অজ্ঞান, তাহাতে তদ্রূপে লীন হইয়া ছিল। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক। দ্বিতীয় ঋকে বলা হইয়াছে যে প্রলয় কালে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব ছিল, মায়া সেই ব্রহ্ম-শক্তির সহিত অভিন্নরূপে ছিল, এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ ছিল না। এতদ্দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, মায়া ও ব্রহ্মে ভেদ উৎপন্ন হইলে, পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হয়। মায়া ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি। এই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখন সৃষ্টি থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান্‌ পরমার্থতঃ এক হইলেও, শক্তি যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন উহাদের মধ্যে ব্যবহারতঃ ভেদ জন্মে। এইরূপে মায়া বা সৃষ্টিশক্তি বা প্রকৃতি যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া উহা ব্যবহারতঃ প্রতীয়মান হয়। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন শক্তিমান্‌ হইতে তাহার ব্যবহারিক ভেদও থাকে না, কিন্তু সক্রিয় হইলে শক্তিমানের দেহে ব্যবহারিক ভেদ উৎপন্ন করে এইরূপে শক্তিমানের দেহে যে সকল ভেদমূলক ভাব জন্মে, তাহা শক্তিমান্‌ হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন না হইলেও, ব্যবহারতঃ ভিন্ন বোধ হয়; যেমন—সমুদ্র ও বীচি। এইরূপে ভেদমূলক পদার্থের দুইটি সত্তা থাকে—একটি পারমার্থিক, অপরটি ব্যবহারিক। পারমার্থিক সত্তার উপাদান সেই শক্তিমান্‌, আর ব্যবহারিক সত্তার উপাদান শক্তি। পরিদৃশ্যমান জগতের পারমার্থিক সত্তার উপাদান ব্রহ্ম ও ব্যবহারিক সত্তার উপাদান মায়া বা প্রকৃতি। নামরূপাত্মক ভেদ উৎপন্ন করিয়া মায়া বা প্রকৃতি জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখায়। পঞ্চভূতাত্মক জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু ব্রহ্মপদার্থে এই যে পঞ্চভূতরূপ ভেদাত্মক উপলব্ধি ইহার উপাদান মায়া বা প্রকৃতি। এই ভেদাত্মক উপলব্ধি আবার প্রকৃতপক্ষে রূপের উপলব্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং রূপ আবরণ মাত্র। অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী এক

ব্রহ্মসত্ত্বই রূপরূপ আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়া জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মায়াই আবরণরূপে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভূত ব্যবহারিক জগতের উপাদান। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন যে, প্রলয়কালে তমঃ অর্থাৎ আবরণতত্ত্ব ছিল এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহাতে লীন হইয়া ছিল। পুনশ্চ, ব্রহ্মকে জগদ্রূপে দেখা, সৎপদার্থকে অসৎ বলিয়া ধারণা করা, অবিদ্যা বা অজ্ঞানজন্য হয়। সুতরাং এই অবিদ্যাই জগতের মূলকারণ ও উপরোক্ত আবরণতত্ত্ব। মায়াশক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া তাহার ভাবরূপ অবিদ্যাংশ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থের আবরক হয় ও জগদ্রূপ প্রকাশিত করে। মায়া বা প্রকৃতির এই যে অবিদ্যারূপ, ইহাকে অপরা মায়া বা অপরা প্রকৃতি বলে। মায়া বা প্রকৃতির অন্য রূপের নাম পরা মায়া বা পরা প্রকৃতি। ইহা বিদ্যা বা জ্ঞান। ইহার দ্বারা জীবের জগদ্রূপ ভ্রমের নাশ হয়, অবিদ্যা দগ্ধ হয় ও তৎফলে জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। অবিদ্যা যেমন তমঃ বা আবরণতত্ত্ব, বিদ্যা তেমনি সত্ত্ব বা প্রকাশতত্ত্ব। এই বিদ্যা ও অবিদ্যার লীলাই জগৎ-লীলা। পরস্পর বিবদমান হইয়া এই দুই তত্ত্ব লীলা করে। অবিদ্যা বিদ্যাকে পরাভূত করিলে ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রতীয়মান হয় ও বিদ্যা অবিদ্যাকে পরাভূত করিলে, জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মকে জগদ্রূপে উপলব্ধির নাম বন্ধন ও জগৎকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধির নাম মুক্তি। এইরূপে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে তমঃ বা অবিদ্যা বা আবরণতত্ত্ব জগতের ব্যবহারিক উপাদান ও জীবের বন্ধনস্বরূপ। ঋষি ইহাকে তুচ্ছ বলিয়াছেন; কারণ, ইহা ভ্রম উৎপাদন করে। যাহা ভ্রম উৎপাদন করে, তাহা কখনও মহৎ হইতে পারে না; কারণ, ভ্রমের নাশ অবশ্যম্ভাবী। অবিদ্যার তুলনায় বিদ্যা মহৎ; কারণ, পরিণামে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার পরাভব অনিবার্য্য। কিন্তু অবিদ্যা তুচ্ছ হইলেও উহা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড এইরূপে তমঃ দ্বারা আবরিত হইয়া তাহার সহিত একীভূত অবস্থায় থাকে। এ কথা অগ্রেই বুঝাইয়াছি। অতঃপর ঋষি বলিতেছেন যে, এই কারণের সহিত একীভূত জগৎ-কার্য্য সৃষ্টিকালে তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। মায়াশক্তি ক্রিয়াশীল হইলে, জগৎ সৃষ্ট হয়। তমোরূপ কারণাকারে পরিণত, তমঃ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত জগৎ সত্ত্ব দ্বারা প্রকাশিত হইলে, তবে কার্য্যরূপে আবির্ভূত হয়। সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ করা—তমকে দগ্ধ করা; এইজন্য ঋষি ইহাকে 'তপঃ' আখ্যা দিয়াছেন। জ্বলনার্থক তপ্‌ ধাতুর উত্তর অস্‌ প্রত্যয় করিয়া তপস্‌ শব্দ হইয়াছে। যাহার দ্বারা অবিদ্যা বা তমঃ দগ্ধ হয়, তাহাই তপঃ। ভৌতিক অন্ধকার নাশ করে বলিয়া সূর্য্যের নাম তপন। মানসিক অন্ধকার বা অজ্ঞান নাশ করে বলিয়া সত্ত্বপ্রধান মানসিক ক্রিয়া বা পর্য্যালোচনার নাম তপঃ। তপঃ জ্ঞানময় (মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।৯), প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বই জ্ঞান। অতএব তপঃ দ্বারা এখানে ক্রিয়াশীল সত্ত্বই উপলক্ষিত হইয়াছে, যাহা আবরিত জগৎকে প্রকাশ করে। অতএব সত্ত্বকে এখানে 'তপঃ' আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টিকার্য্য ক্রিয়া পর্য্যা-

লোচনারূপ ক্রিয়াশীল সত্ত্ব দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই কথাই মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে; যথা,—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" (১।১।৮) অর্থাৎ ব্রহ্ম তপঃ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টিসমুন্মুখ হন। তুচ্ছ তমের তুলনায় ঋষি সক্রিয় সত্ত্ব বা তপকে মহৎ বলিয়াছেন। এই মহত্ত্ব-হেতু দর্শনশাস্ত্রে সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিতত্ত্বকে মহৎ নামে অভিহিত করা হয়।

৪। যেহেতু মনের সম্বন্ধী রেতঃ, অর্থাৎ ভাবী প্রপঞ্চের বীজ, প্রথমে ছিল, সেই হেতু অগ্রে, অর্থাৎ বিকারজাত সৃষ্টির প্রাগবস্থায়, (পরমেশ্বরের মনে) কাম, অর্থাৎ সিসৃক্ষা, সঞ্জাত হইয়াছিল। সতের, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের, বন্ধুকে অর্থাৎ হেতুভূত কর্ম্মসকলকে, কবিগণ, অর্থাৎ ক্রান্তদর্শন অতীতানাগতবর্ত্তমানাভিজ্ঞ যোগিগণ, হৃদয়ে বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া অসতে, অর্থাৎ সদ্বিলক্ষণ অব্যাকৃত কারণে, নিরূপণ করিয়া, অর্থাৎ পৃথগ্‌রূপে, জানেন।

তাৎপর্য্যঃ—বুঝিলাম—তপ অর্থাৎ স্রষ্টব্য-পর্য্যালোচনা-রূপ সক্রিয় সত্ত্বদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়, কিন্তু সত্ত্ব জগৎসৃষ্ট্যর্থ কি জন্য সক্রিয় হয়? প্রলয়কালীন নিষ্ক্রিয় সত্ত্বকে সৃষ্টির প্রারম্ভে কে সক্রিয় করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন,—সৃষ্টির প্রারম্ভে কাম সঞ্জাত হইয়াছিল। কাম অর্থে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি রজোগুণের ক্রিয়া। এইরূপে মায়াশক্তিতে তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ ভিন্ন রজোগুণ অঙ্গীকৃত হইল। ফলতঃ দ্বিতীয় ঋকে ঋষি প্রলয়কালে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন মায়াশক্তির অঙ্গীকার করিলেন; তৃতীয় ঋকে পরিদৃশ্যমান জগতের কারণভূত আবরণতত্ত্ব তমোগুণের ও তমঃপরিপন্থী, প্রকাশধর্ম্মী, সৃষ্টিমুক্তির হেতুভূত সত্ত্বগুণের অঙ্গীকার করিলেন; এবং চতুর্থ ঋকে এই দুই গুণের প্রবর্ত্তক রজোগুণের অঙ্গীকার করিলেন। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃতিতত্ত্ব। অতঃপর পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে—কাম সঞ্জাত হইল কেন? প্রলয়কালে রজোগুণ সুপ্ত ছিল, তমোগুণদ্বারা গূঢ় জগৎ তদ্রূপে লীন হইয়াছিল, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে রজোগুণ কেন জাগরিত হইল, কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া সত্ত্বকে ক্রিয়াশীল করিতে প্রবৃত্ত করিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—প্রলয়ের পূর্ব্বকালীন সৃষ্টিবীজ প্রথমে প্রলয়কালেও ছিল বলিয়া প্রলয়ান্তে উহা রজোগুণকে জাগ্রত করে। দ্বিতীয় ঋকের তাৎপর্য্যে বলিয়াছি, সর্ব্বজীবের পরিপক্ক কর্ম্মসকল যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে না বলিয়া প্রলয় হয়। আলোচ্য ঋকে উক্ত হইতেছে যে, প্রলয়কালে জগতের বীজ থাকে। এই বীজ জীবের সঞ্চিত অপরিপক্ক কর্ম্ম। এই অপরিপক্ক কর্ম্ম পরিপক্ক হইলে, তাহার ভোগার্থ জগতের প্রয়োজন হয়, সুতরাং প্রলয়ান্তে সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে—এই বীজ কাহার এবং কোথায় অবস্থান করে? উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, ইহা মনের, এবং মনে অবস্থান করে। প্রলয়কালে মানস সংস্কাররূপে পরিণত এই বীজ বাসনা-শেষহেতু মায়ায় বিলীন সর্ব্বজীবান্তঃকরণে অবস্থান করে। তৎকালে জীবের ভোগ না থাকায় কাম বা বাসনা থাকে না, সুতরাং কর্ম্মসংস্কার সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকে; কর্ম্মসংস্কার নিষ্ক্রিয় থাকায় মনের করণীয় কিছু

থাকে না, সুতরাং মন পরকালীন সৃষ্টির বীজস্বরূপ কর্ম্মসংস্কারসকলকে সংগ্রহ করিয়া মায়ায় লীন হয়। পরে যখন কর্ম্ম পরিপক্ক হওয়ায় সংস্কার জাগরিত হয়, মনে তখন বাসনা বা কামের উদ্রেক হয়—অর্থাৎ রজোগুণের ক্রিয়া হয়। অতঃপর রজোগুণ সক্রিয় হইয়া সত্ত্বকে ক্রিয়াশীল করে। সত্ত্ব ক্রিয়াশীল হইয়া স্রষ্টব্যপর্য্যালোচনাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করে। এইরূপে আত্মার গুণাধারত্ব প্রত্যাখ্যাত ও নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইল। জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম পরিপক্ক হইলে, ব্রহ্ম তত্ত্বের মায়াশক্তি তাঁহারই বিধানানুসারে স্পন্দিত বা ক্রিয়াশীল হয়, প্রবুদ্ধ কর্ম্মসংস্কার সকল মনস্তত্ত্বকে ক্ষোভিত করিয়া বাসনা বা কামের উদ্রেক করে এবং কাম উদ্রিক্ত হইলে অর্থাৎ ভোগের প্রয়োজন হইলে ভোগ্য জগৎ সৃষ্ট হয়। এই যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া ইহার বিধাতা সেই সকলবেদান্তবেদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব পরমাত্মা যিনি এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ। পরমেশ্বর-রূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যময় পরমাত্মা জীবের কর্ম্মফল প্রদান করেন এবং তদ্ধেতু জগৎ সৃষ্টি করেন। সাধারণ দেহী যেমন ইচ্ছামত নিজের দেহগত শক্তিসকলকে চালনা করে, সেইরূপ পরমেশ্বর মায়াকে পরিচালন করিয়া জীবের ভুক্তি-মুক্তি বিধান করেন। জগৎ কর্ম্মানুসারে মায়ার অধীন সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম। মায়া পরমেশ্বরের অধীন, সুতরাং পরমেশ্বর সৃষ্টি কার্য্যে অক্ষম। প্রলয়ান্তে যখন সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন এই সর্ব্বসাক্ষী চৈতন্যময় পরমাত্মা নিজেকে স্রষ্টারূপে কল্পনা করিয়া, মায়াকে আত্মদেহে প্রবুদ্ধ করিয়া, ভোগ্যপ্রপঞ্চ ও ভোক্তৃপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বর দেহে পরমেশ্বরের অধীনে এই যে মায়ার প্রবোধন, ইহাকেই বলে পরমেশ্বরের সিসৃক্ষা। সাধারণ বদ্ধজীবের ইচ্ছা যেমন তাহার নিজের কর্ম্মানুগত, পরমেশ্বরের এই ইচ্ছা তেমন তাঁহার নিজের কর্ম্মানুগত নহে; কারণ, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন নাই। পরন্তু এই ইচ্ছা নিখিল জীবের কর্ম্মানুগত, নিখিল জীবের কর্ম্ম তাঁহার বিধানানুসারে ক্রিয়াশীল হইয়া মায়াশক্তিতে মনস্তত্ত্বে যে ক্ষোভ উৎপন্ন করে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। নিখিল জীবের মনের সমষ্টিই তাঁহার মন এবং নিখিল জীবের মনে যে সকল কামের উদয় হয়, তাহার সমষ্টিই তাঁহার কাম। প্রভেদ এই যে, জীব মনের ও কামের অধীন, তিনি মনের ও কামের ঈশ্বর। জীব স্বীয় কর্ম্মদ্বারা সৃষ্টি করিলেও তাহার স্বরূপ অবগত নহে, পরমেশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন এবং একমাত্র তিনিই ইহার স্বরূপ অবগত আছেন। সূক্তের শেষ ঋকে ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

সৃষ্টিব্যাপারে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া ঋষি দেখাইলেন যে কর্ম্মই সৃষ্টির মূল কারণ। অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, কর্ম্মের মূল কি? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, কর্ম্মের মূল অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয়, বুদ্ধির—তথা বিচারের—অনধিগম্য। কিন্তু এই জগৎকারণের কারণান্তর বুদ্ধির অগোচর হওয়ার দরুণ যে উহা শশবিষাণবৎ অসত্য, তাহা নহে। কর্ম্মের জগৎকারণত্ব অর্থাৎ কর্ম্ম যে সৃষ্টির বীজরূপে মায়াতে অবস্থান করে, ইহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। এই শ্রুতিপ্রমাণ যথেষ্ট হইলেও ঋষি তদতিরিক্ত

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন, পাছে কোন নাস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রুতিপ্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্মের জগৎকারণত্বে অবিশ্বাসী হয়। যথা,—ত্রিকালদর্শী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিগ্রহপূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি সম্যক্ জাগরিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে অব্যাকৃত কারণে, অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতির বিকৃতিস্বরূপ দৃশ্যমান জগতের হেতুভূত কর্ম্মসকলকে বিশুদ্ধ সত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। উপনিষদে এই মূলপ্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অব্যক্তের লক্ষণ করিয়াছেন, "সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতং অব্যাকৃতনামরূপং সতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তিসমাহাররূপং অব্যক্তং" (কঠ ৩।১১ ভাষ্য), অর্থাৎ সমস্ত জগতের বীজভূত সমস্তত্ত্বময় অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তির সমষ্টিস্বরূপ পদার্থ অব্যক্ত। ঔপনিষদিক এই অব্যক্ত শব্দটি আকৃতিতে ও অর্থে ঋকের অসৎ শব্দেরই অনুরূপ। সৎ শব্দে নামরূপাত্মক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক পদার্থ বুঝায়, সুতরাং অসৎ শব্দে অব্যাকৃত মূলপ্রকৃতি বুঝায়। সত্ত্বা ও ব্যক্ততা সমানার্থবাচক, সুতরাং অসৎ ও অব্যক্তও একার্থবাচক।

৫। এই সকলের, অর্থাৎ সৃষ্টির অবিদ্যা-কামকর্ম্মরূপ হেতুসকলের, রশ্মি কি (প্রথমে) তির্য্যগ্‌ভাবে, অর্থাৎ মধ্যে, বিস্তৃত হইয়াছিল, অথবা অধোদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, অথবা উপরে বিস্তৃত হইয়াছিল? রেতোধাসকল, অর্থাৎ বীজভূত কর্ম্মের বিধাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব সকল, হইয়াছিল এবং মহৎ সকল, বিয়দাদি ভোগ্যসকল হইয়াছিল। স্বধা, অর্থাৎ ভোগ্যপ্রপঞ্চ, নিকৃষ্ট এবং প্রয়তিতা, অর্থাৎ ভোক্তা, উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ ভোগ্যপ্রপঞ্চ ভোক্তৃপ্রপঞ্চের পরে সৃষ্ট হইয়াছিল।

তাৎপর্য্য :—"অসৎ ছিল না" এতদ্দ্বারা প্রলয়কালে অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, "অগ্রে কাম সঞ্জাত হইয়াছিল," এতদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে কামের উদ্ভব উক্ত হইয়াছে; এবং 'মনের সম্বন্ধি রেত প্রথমে ছিল", এতদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বিয়দাদি ভূত সকল এই অবিদ্যাকামকর্ম্মরূপ হেতুসকল হইতে সৃষ্টি-কালে উদ্ভূত হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে ইহারা কিরূপ পর্য্যায়ে, কত সময়ে, কোন দেশের পর কোন্ দেশ অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়? ইহার উত্তরে ঋষি প্রশ্নচ্ছলে বলিতে-ছেন—বিয়দাদি ভূতসকল সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অতি শীঘ্র নিমিষের মধ্যে একেবারে সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত করিয়া উৎপন্ন হয়। গুণানুসারে ভূতসকল পর পর পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভূত হয়; যথা,—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। কিন্তু এই ক্রমানুযায়ী উৎপত্তি বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হওয়ায়, প্রথমে কোন্ ভূত কোন্ দেশে উৎপন্ন হইল, তাহার নির্দ্দেশ হয় না। এইরূপে অতিশীঘ্র সর্ব্বদিকে ভূতসৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়। এখন দেখা যাউক, এ পর্য্যন্ত সৃষ্টিকার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল। প্রলয়কালে মূলপ্রকৃতি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অবস্থায় ছিল। অতঃপর সৃষ্টির প্রাক্‌কালে "তপের মাহাত্ম্যদ্বারা জগৎ উৎপন্ন হয়" এই

বাক্যদ্বারা প্রকৃতির ব্রহ্ম হইতে দ্বৈতভাবে সত্ত্বরজস্তমের ক্রিয়াশীল অসাম্য অবস্থার উৎপত্তি সূচিত হইয়াছে। তৎকালে মূল প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপত্ব ছাড়িয়া জগতের আদিকারণ অসৎ বা অব্যক্তরূপে আবির্ভূতা হন। এইরূপে অব্যক্তের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়া ঋষি ব্যক্ত বিয়দাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। অতঃপর ঋষি বলিতেছেন—ভোক্তা জীবসকল ও ভোগ্য বিয়দাদি সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ভোগ্যের অগ্রে ভোক্তার সৃজন হইয়াছিল। সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আত্মাই কর্ম্মের বিধাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব। এই সূক্ষ্মদেহ মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বদ্বারা গঠিত। অতএব সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সৃষ্টি হইতে পারে না, এবং জীবের সৃষ্টি না হইলে ভোগ্য স্থূল পঞ্চভূতের অপ্রয়োজন বিধায় সৃষ্টি হইতে পারে না। আলোচ্য ঋকে ঋষি সৃষ্টির এই পর্য্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—অগ্রে সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি, তৎপরে জীবের সৃষ্টি, তৎপরে স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি। সূক্ষ্মভূতসকলকে ঋষি রশ্মি বলিয়া তাহাদের সূক্ষ্মত্ব সূচিত করিয়াছেন এবং স্থূলভূতসকলকে মহৎ বলিয়া তাহাদের স্থূলত্ব সূচিত করিয়াছেন। স্বধা প্রকৃতির নাম। প্রকৃতি জীবের ভোগ্যরূপে আবির্ভূত হন বলিয়া স্বধা শব্দে ভোগ্য প্রপঞ্চ বুঝায়।

৬। এই পরিদৃশ্যমান বহুপ্রকারের সৃষ্টি কি উপাদানকারণ হইতে ও কি নিমিত্তকারণ হইতে জাত, তাহা কে যথাযথভাবে জানে এবং এখানে, অর্থাৎ এই জগতে, কেই বা তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিতে পারে? দেবগণ এই জগতের বিবিধ সৃষ্টির পশ্চাজ্জাত। অতএব যাহা হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা কে জানে?

তাৎপর্য্য—উপরে ঋষি ভোক্তৃভোগ্যরূপে নিখিল সৃষ্টির ক্রম সংক্ষেপে দেখাইলেন। অতঃপর ঋষি প্রশ্নচ্ছলে বলিতেছেন যে, এই বিশাল ও বিচিত্র জগতের সৃষ্টির কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কেহই জানে না ও জানিতে পারে না। ভূত-ভৌতিক-ভোক্তৃ-ভোগ্যাদিরূপে এই বহুপ্রকার সৃষ্টির উপাদান-কারণ ও নিমিত্তকারণ যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমন কি, দেবতারাও এই কার্য্যকারণসম্বন্ধবিষয়ে অনভিজ্ঞ; কারণ, তাঁহারা সৃষ্টির আদিতে ছিলেন না; পরন্তু ভূতসৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছেন। বেদ-সংহিতায় দেবগণকে দ্যাবাপৃথিবীর অর্থাৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীর সন্তান বলা হইয়াছে। ["যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হব॰।" (১০৬৩-২)। অর্থাৎ যে সকল দেবতা দ্যুলোকে অপ্‌সকল অর্থাৎ অন্তরীক্ষ হইতে জন্মিয়াছেন, এবং যাঁহারা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।] সুতরাং দ্যাবাপৃথিবীর যাঁহারা সন্তান, তাঁহারা দ্যাবাপৃথিবীর—তথা সমগ্র বিচিত্র সৃষ্টির—বিস্তারিত কারণ কিরূপে যথাযথভাবে অবগত হইবেন? আর দেবগণই যদি অবগত না হইলেন তাহা হইলে আর কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? কেহই পারে না।

৭। যাঁহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি জন্মিয়াছে, তিনিই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন অথবা যদি না করিয়া থাকেন। [illegible]

অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত তিনিই যদি জানেন অথবা যদি না জানেন।

পূর্ব্ব প্রশ্নের অনুবর্ত্তন করিয়া ঋষি বলিতেছেন,—সৃষ্টির কারণ জীব যে কিছুতেই যথাযথভাবে জানিতে পারে না, তাহার হেতু এই যে, যে পরমাত্মা হইতে জগৎ জন্মিয়াছে অর্থাৎ যে পরমাত্মা জগতের উপাদানকারণ, এবং যে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ যে পরমাত্মা জগতের নিমিত্তকারণ, সেই পরমাত্মাকে কেহই জানিতে পারে না। তবে একজন আছেন, যিনি এই জগতের কারণ পরমাত্মা বিষয়ে অবগত আছেন। ঈশ্বর যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, ও ব্যোমে অধিষ্ঠিত তিনিই এই বিশিষ্ট জ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন জগৎকারণের জ্ঞাতা আর কেহই নাই। এই ঋকে ঋষি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণের একত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজকালকার দিনে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বেতনভোগীর কর্ত্তব্য কর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অফিসের কাজের সঙ্গে হৃদয়ের কোন যোগ নাই। বরঞ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমরা বুঝিয়াছি যে, কার্য্যের মধ্যে হৃদয়কে আনিলে কাজের ব্যাঘাত হয় মাত্র। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাজের সম্বন্ধ প্রেমভক্তির দ্বারা মধুর ও সজীব হইয়া উঠিত, আজ আমরা তাহা হারাইয়া ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি, সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই। তবে এখন আমরা মানুষকে ভুলিয়া প্রণালীকে, প্রীতিকে ছাড়িয়া বিধিকে গ্রহণ করিয়াছি, তাই চাকরীর দীনতার কলঙ্কই আমাদের ভূষণ হইয়াছে।

সংসারচন্দ্র যখন নবীন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন, তখন দিনকাল অন্যরূপ ছিল। তিনি একাধারে মহারাজের শিক্ষক, মন্ত্রী, বন্ধু এবং রক্ষক হইলেন। তিনি প্রত্যূষে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সমস্ত দিন তাঁহার সকল কর্ম্মে সহায়তা করিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর আহারাদিও একত্রে হইত, তার পর রাত্রে আহারাদির পর মহারাজ শয়ন করিলে, সংসারচন্দ্র গৃহে ফিরিতেন। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সংসারচন্দ্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেমন করিয়া এই রাজপুত যুবককে তখনকার কুসংস্কার এবং প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়া হিন্দুর পুরাতন ধর্ম্ম, আচার, প্রথা ও কীর্ত্তি বজায় রাখিয়াও তাঁহাকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন, কেমন করিয়া নিজের চরিত্রবলে ধীরে ধীরে এই নবীন নরপতির চরিত্র গঠন করিয়া এই সুবৃহৎ রাজ্যের প্রজাপালন, সুবিচার এবং উন্নতির জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন—তাহা এখন কেবলমাত্র মহারাজের কার্য্যকলাপ আলোচনার দ্বারাই বুঝিতে

পারা সম্ভব। জয়পুরের মত বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্যের অধিপতির প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ যে কত কঠিন, কত দায়িত্বপূর্ণ এবং কতটা জটিল, তাহা যাহারা দেশীয় রাজ্যের সংস্রবে না আসিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। যিনি বিশেষভাবে রাজার চরিত্র, মনের গতি এবং কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব নহে। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রাখিয়া যিনি রাজা ও রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজাকে নিয়মিত করিতে পারেন, যিনি নিজের স্বার্থকে রাজ্যের স্বার্থে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করিতে পারেন, যিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, দূরদর্শী এবং ধৈর্য্য ও কৌশলের সহিত প্রভুর হিতসাধনপ্রয়াসী, তিনিই আদর্শ প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। সংসারচন্দ্র বিশ বৎসর ধরিয়া বিবিধ স্বার্থসংঘাতের মধ্য দিয়া আপনা ভুলিয়া ছায়ার ন্যায় মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন, এই বিশ বৎসরে মহারাজ যে সকল রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—তার সঙ্গে সংসারচন্দ্রের যোগ লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে—তিনি এমনি করিয়াই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিদিনের জলবায়ু যেমন করিয়া মনুষ্য-শরীরকে গঠন করে, তেমনি করিয়া তিনি নিজ চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই জন্য এ সময়ে আমরা রাজকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। মানব-জীবনে বিশ বৎসরকাল সামান্য বলিতে পারা যায় না। সংসারচন্দ্র যৌবনের উদ্যম এবং সৎসাহস লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বিশ বৎসর তাঁহার জীবনের তপস্যার কাল, যাহার ফলে তিনি ভবিষ্যতে রাজাপ্রজা সকলের হিতসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রাজপুতানা এবং রাজপুতগণের ইতিবৃত্তের সহিত, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, তাঁহাদের প্রকৃতি এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যে সকল প্রথা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে সকলের সহিত সংসারচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অভিজ্ঞতা তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে লোককে আশ্চর্য্য করিত, তাহা ও তাঁহার জীবনের এই সাধনার সময়ে উপার্জ্জিত। তিনি শুধু শিক্ষা দেন নাই, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসের সংস্রবে এবং উপদেশে মহারাজ মাধোসিংহ হিন্দুধর্ম্মে পরম আস্থাবান্। মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা এবং তীর্থভ্রমণ, মহারাজ হিন্দুর জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন সংসারচন্দ্র এই সকল ধর্ম্মকার্য্যে প্রধান সহায়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীর্থ দর্শন করিতে মনস্থ করিয়া সংসারচন্দ্রকে উক্ত তীর্থে যাইবার রাস্তা প্রভৃতি দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংসারচন্দ্র যে কষ্ট সহ্য করে প্রথম গঙ্গোত্রী গমন করেন—তাহার বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার নিজ লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসৌরী হইতে ঘোড়া, ডাণ্ডি এবং কুলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা গঙ্গোত্রী যাত্রা করেন। পথে স্থানে স্থানে কোথাও বা ধর্ম্মশালায়, কোথাও বা পাহাড়িয়াদিগের কুটীরে এবং অধিকাংশ সময়ে অনাবৃত স্থানে কাটাইতে হইত। সংসারচন্দ্র যখন যে বিষয়ের ভার লইতেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে সুসম্পন্ন করিতে ঐকান্তিক যত্ন করিতেন,

সে বিষয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। গঙ্গোত্রীর পথে যেখানে যেখানে থাকিবার সুবিধা এবং পথে কি কি প্রয়োজন হইতে পারে, আহার্য্যদ্রব্যের মূল্যাদি, কুলী-ভাড়া, পথের বিবরণ, গ্রাম, নদী, পাহাড় প্রভৃতির নাম—সমস্তই তাঁহার দিনলিপিতে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রার কোন জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিন মাস পরে তিনি জয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। যে বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর নানাপ্রকার পরিশ্রম করিয়াও অটুট ছিল, এই গঙ্গোত্রী যাত্রায়াতে তাহাতে রোগ প্রবেশ করিল। সঙ্গের লোকেরা তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। মহারাজের কাজে তাঁহাকে যে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কদাচ মুখে আনিতেন না। কর্ত্তব্যের আত্মত্যাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, নিজের কোন সুবিধা অসুবিধা তিনি কখন গণনা করেন নাই। কি রাজ্যের হিতকর কার্য্যে, কি ধর্ম্মকর্ম্মে, কি আনন্দ-উৎসবে বা শিকারে, সংসারচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে বিশ বৎসরকাল মহারাজের সাহচর্য্যে কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু কখনও নিজের কর্ত্তব্যপথ হইতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হ'ন নাই, মহারাজের হিতচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তিনি মনে স্থান দেন নাই। তাই মহারাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শুধু কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। একদিকে শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ও হৃদয়ের আকর্ষণ এবং অন্য দিকে স্নেহ, প্রীতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এই মণিকাঞ্চন-সংযোগে এ সম্বন্ধ পরম আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। তাই উত্তরকালে অম্বরাধিপতির মহিষী মহারাণী যাদোনজী সংসারচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে মাতৃ-সম্বন্ধে সম্মানিত করিয়া "রাখী" বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

মহারাজ সবাই মাধোসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করার তিন মাস পরে সংসারচন্দ্র প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মন্ত্রিপদে বৃত হয়েন। তাঁহার জীবনী বুঝিতে হইলে, এই বিশ বৎসরের জয়পুররাজ্যের একটা মোটামুটি বিবরণ জানা আবশ্যক। সাধারণভাবে-বলিতে গেলে, ইহা সুবিখ্যাত সচিবপ্রবর স্বর্গীয় রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের মন্ত্রিত্বকাল। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এ জীবনবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র প্রথমে জয়পুর স্কুলের প্রধানশিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া আসেন; পরে যখন উক্ত স্কুল 'মহারাজ-কলেজে' পরিণত হইল—তখন তিনি তাহার অধ্যক্ষ হয়েন।

গবর্ণমেণ্টের সহিত যখন সম্বরহ্রদের স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব চলিতেছিল, সেই সময় ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও নির্ভীকতা স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাজ রামসিংহ বরোদাধিপতি মহারাজ সয়াজী গায়কোয়াড়ের মোকদ্দমায় অন্যতম বিচারকের পদে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৃত হ'ন, তখন তাঁহার রায় প্রকাশকালে তাঁহার তদানীন্তন প্রাইভেট সেক্রেটারীকৃত অনুবাদ মহারাজের

মনোমত না হওয়ায়, তিনি কান্তিবাবুকে অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই সময়েই মহারাজ তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ দক্ষতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হ'ন। তাহার ফলে জয়পুরে ফিরিয়া তিনি কান্তিবাবুকে কৌন্সিলের অন্যতম সদস্যের পদে নিযুক্ত করেন।

মহারাজ রামসিংহের স্বর্গারোহণের এবং বর্ত্তমান মহারাজের সিংহাসন প্রাপ্তির পরেও কিছুকাল কান্তিবাবু মন্ত্রিসভার সাধারণ সদস্যের পদেই নিযুক্ত থাকেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাজ দ্বাবিংশবর্ষে পদার্পণ করেন এবং রাজত্বের পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হ'ন, তাহার পর হইতেই কান্তিবাবু ক্রমে ক্রমে প্রধানমন্ত্রিপদে উন্নীত হ'ন এবং ১৯০১ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। বর্ত্তমান মহারাজের রাজত্বকালের বিবরণের মধ্যে এত সুদক্ষ মন্ত্রীর কৃতকার্য্যের ইতিবৃত্ত পাওয়া যাইবে বিবেচনায়, পৃথক্‌ভাবে দেওয়া বাহুল্য মনে করি। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র যখন মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন, তখন শাসনপ্রণালীর মধ্যে যে প্রকার বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অবিচার এবং স্বার্থ-প্রণোদিত চক্রান্ত বর্ত্তমান ছিল, তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম স্থাপন করিয়া যে সকল প্রজাহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং দেশীয় রাজ্য সকলের মধ্যে জয়পুরকে যে প্রকারে উন্নতির পথে অগ্রণী করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র নিজের প্রতিভা ও দক্ষতায় যেমন রাজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, জয়পুরাধিপতি এবং গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান শ্রেণীর তাজিমী সর্দ্দার মধ্যে গণ্য করিয়া জায়গীর প্রদান করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি দান করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ এই প্রতিভাশালী কর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে "বিদ্যাগুরু" পদে বরণ করিয়া যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সিংহাসনপ্রাপ্তির পর মহারাজ মাধোসিংহের কিষণগড় ও বাংধাড়া এই দুই রাজ্যের রাজকুমারীর সহিত শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ১৮৮২ সালে মহারাজ বোম্বাই, কলিকাতা, গয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসেন। এই বৎসর আগষ্ট মাসে জয়পুরে ইকনমিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়ম্ (Economic and Industrial Museum) নাম দিয়া এক শিল্পশালা স্থাপিত হয়। ইহারই অনুবৃত্তি ও পোষকতায় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে জয়পুর-শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইল। দেশীয় রাজ্যে ইহা এক অভিনব অনুষ্ঠান। "রাজ্যমধ্যে এবং রাজ্যসীমান্ত প্রদেশে কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কি কি শিল্প প্রচলিত আছে, তাহা জানা এবং তৎসমুদয় একত্র করিয়া শিল্পীদিগকে উৎসাহ দিয়া স্থানীয় শিল্পের উন্নতি বিধান এবং জনসাধারণের শিক্ষাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।" কান্তিচন্দ্র ও সংসারচন্দ্র উভয়েই জয়পুর মিউজিয়ম্ সমিতির সভ্য ছিলেন

এবং ইঁহাদের বহু পরিশ্রমের ফলে এই শিল্প-সমিতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শিল্পপ্রদর্শনীর দ্রব্যাদি পরে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) নবনির্ম্মিত এলবার্ট হলে রক্ষিত হয়।

স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহ রাজ্যের ও প্রজার হিতকল্পে যে সকল সদনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মহারাজ মাধোসিংহ সে সকল সযত্নে রক্ষা এবং তৎসমুদয়ের উন্নতিবিধান করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে জয়পুর বর্ত্তমানে রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুর কলেজে এফ্ এ শ্রেণী খোলা হয়; তারপর ১৮৮৮ সালে ইহাতে বি এ এবং ১৮৯৬ সাল হইতে এম্ এ, বি, এস সি, এম্ এস্ সি পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইতেছে। সংস্কৃত কলেজেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে বহু ছাত্র এই কলেজ হইতে কাশী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। কলেজের সংস্রবে আরবিক ও পারসিক ভাষা শিক্ষার জন্য পৃথক্ বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত জয়পুরে শিল্প-বিদ্যালয় এবং রাজ্যের নানা স্থানে প্রাথমিক ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

রাজপুতানার ন্যায় প্রদেশে কেবল মাত্র বৃষ্টির জলই কৃষকের ভরসা। অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইলে প্রজার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। প্রজাপালক মহারাজ জয়পুরের এই দুঃখ নিবারণের জন্য প্রায় অর্দ্ধকোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাজ্যের নানা স্থানে সুবৃহৎ বাঁধ বাঁধিয়া তাহা হইতে জলপ্রণালী কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯৮ সালে জয়পুর রাজ্যে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়; সে সময় মহারাজ প্রজারক্ষার্থ অকাতরে রাজকোষ খুলিয়া দিয়াছিলেন। রাজ্যের নানাস্থানে বুভুক্ষু প্রজার জন্য অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল। সে সময় মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্র হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই কেবলমাত্র ক্ষুধার্ত্তের আহার দান এবং পীড়িতের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—রাজ্যের অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রজাবৎসল মহারাজ এই দুর্দ্দিনে তাঁর পুত্রোপম প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের উৎসাহ অন্যের মনে সঞ্চারিত করা কান্তিচন্দ্রের এক প্রধান শক্তি ছিল—তাই সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষ-নিবারণ ব্যবস্থা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কান্তিবাবুকে "দুর্ভিক্ষ কমিশনের" সদস্য নিযুক্ত করেন। নিজ রাজ্যে দুর্ভিক্ষে প্রজার অবস্থা দেখিয়াই করুণহৃদয় মহারাজ সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এক ধনভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রথমে ষোল লক্ষ টাকা দান করেন এবং ক্রমে ক্রমে আরও ১০।১২ লক্ষ টাকা এই ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

মোগলসম্রাটদিগের সময় হইতে কি ভারতে কি বিদেশে জয়পুরের রাজগণ বরাবর সম্রাট্দিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ ভগবান দাস, মহারাজ মানসিংহ ও জয়সিংহের কীর্ত্তি ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে প্রচার করিতেছে।

মহারাজ রামসিংহও সিপাহী বিদ্রোহ দমনে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজভক্ত মহারাজও তাঁহার পূর্ববর্ত্তিগণের অনুসরণে নিজরাজ্যে Imperial Service Transport Corps স্থাপন করিয়াছিলেন। এই Transport Corps ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টিরা প্রভৃতি অভিযানে ভারত-গভর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া ইহার কার্য্য-কারিতার পরিচয় দিয়াছে।

সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্বকাল সম্যক্ বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান মহারাজের ও তদীয় রাজত্ব কালের একটা ধারাবাহিক বিবরণ জানা দরকার, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের অবতারণা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ সন পর্য্যন্তের ইতিহাস মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্রের সহিত জড়িত। তাই সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যন্তের একটা মোটামুটি বিবরণ এ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হইল মাত্র; বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়া এ স্থানে সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

"এষা"

(২)

জীবন-মরণের সমস্যা মানব সমাজে নূতন নয়। চিরদিনই মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দিশাহারা হইয়াছে। জীবনের প্রহেলিকাও ভেদ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর মর্ম্মও উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। বর্ব্বর সাধনার শৈশব কল্পনা এ পারের ছবিগুলিকে পরপারে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা পরলোক রচনা করিয়া লইত, এবং সে লোকের যাত্রীদের সঙ্গে তাহাদের নিত্যব্যবহার্য্য অস্ত্র শস্ত্রাদি, ক্রমে গোমেষাদি এবং পরে তাহাদের দাসদাসী, এমন কি জীবন সঙ্গিনীদিগকেও পাঠাইয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইত। আমরা আর এ সকল করি না বটে, কিন্তু এখনও অনেকেই যে একটা কল্পিত পর-লোকের সৃষ্টি করিয়া, শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ করে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাহারা একটা স্থূল, সাকার পরজগৎ কল্পনা করিত; আমরা একটা সূক্ষ্ম, নিরা-কার পরলোক গড়িয়া সেখানে সর্ব্ববিধ আনন্দের ও ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি—বেশ কম এই মাত্র। ফলতঃ পরলোকতত্ত্বটা পূর্ব্বে যেমন, আজিও সেইরূপই অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সমস্যাটা অত্যন্ত পুরাতন হইলেও, যুগে যুগে মৃত্যু মানুষকে নূতন নূতন ভাবে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। বর্ব্বর সাধনার অজ্ঞ অপূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, বর্ব্বর সমাজের শ্রদ্ধা অত্যন্ত কোমল, ও কল্পনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিধাতাপুরুষ যেন এই শ্রদ্ধা ও কল্পনার দ্বারাই বর্ব্বর সমাজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার ক্ষতিটা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যাহাকে অজ্ঞ

বলিয়া এখন উপেক্ষা করিয়া থাকি, তাহা তারই ভিতরে চৈতন্যের অধ্যাস করিয়া, বিশ্বসংসারকে সচেতন করিয়া রাখিত। জড়ে ও জীবে তখন এমন একটা মাখামাখি ছিল, এমন একটা আলাপ আত্মীয়তার আদান-প্রদানের ভাব ছিল, যাহা এখন আমরা কেবল কবি-কল্পনার মায়িক সৃষ্টিতেই দেখিতে পাই, দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করিতে পারি না। আমরা আর প্রাচীন দেবতাদের দ্বারা নৈসর্গিক বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের জড়বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ পুরাতন দেবতাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। আমরা এখন বিশ্ববিবর্ত্তনের অন্তরালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করি না, কিন্তু এক ভীষণ ও বিরাট শক্তি-পুঞ্জের লক্ষ্যহীন সংঘর্ষ এবং সংগ্রামই প্রতিষ্ঠিত করি। আর প্রাচীন দেবতাদের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের পরলোক-বিষয়িণী কোমল শ্রদ্ধা-টুকুও হারাইয়াছি। তাঁহারা মৃতদিগের জন্য সুশোভন চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোকাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। এ সকলে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা শোকে অশেষ সান্ত্বনালাভ করিতেন। আমাদের সে বিশ্বাস নাই। সুতরাং মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া আমরা আজ যত অধীর হইয়া পড়ি, মৃত্যু আমাদিগকে যতটা নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়, প্রাচীনেরা সেরূপ হইতেন না, কাল তাঁহাদিগকে এতটা কার্পণ্যোপহত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা যেমন পরলোক কল্পনা করিতেন, আমরা যে তাহা একেবারেই করি না, এমনও নয়। কিন্তু তাঁহাদের সে কল্পনার সঙ্গে তাঁহাদের সমসাময়িক সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ও সঙ্গতি ছিল, আমাদের পরলোক-কল্পনার মধ্যে সে যোগ ও সঙ্গতি থাকে না। এই জন্য অনেক সময় আমাদের শোক লঘু ও সান্ত্বনা অলীক হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মৃতদিগের জন্য আপন আপন কর্ম্মোচিত লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত নির্ব্বিশেষে সকলেই যে ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইত, এমন অদ্ভুত কল্পনা তাঁহারা করিতেন না। এইজন্য, তাঁহাদের পর-লোক-রচনা কল্পিত হইলেও, সেই কল্পনার অন্তরালেও একটা সত্য ও সংযম বিদ্যমান ছিল। শ্রদ্ধা যেখানে—সংযম সেখানে আপনা হইতেই আইসে। আর ইহলোকের বস্তুর ধারণা যেখানে সহজ ও সরল অথচ দৃঢ় থাকে, সেখানে পরলোকের কল্পনাও নিতান্ত সত্য-ভ্রষ্ট হয় না। আমাদের দৃষ্টের ধৃতি যেমন দুর্ব্বল, অদৃষ্টের কল্পনাও সেইরূপ অলীক হইয়া পড়ে। আধুনিক কবিদিগের পরলোক-চিত্রে এইজন্য অনেক সময় বস্তুতন্ত্রতার লেশমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা জীবিতকে তেমন সমগ্র প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরি না বলিয়াই, তাহাদের প্রজ্বলিত-চিতালোকে দাঁড়াইয়া, গলা ছাড়িয়া গান করিতে পারি—

যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাসরি,
দুঃখ আঁধার যথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।
যাও রে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।

দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে,
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির-বিমল পুণ্য-কিরণে।
যায় যথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান্,
যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে॥

অক্ষয়বাবুর শোকগাথাতে কোথাও এইরূপ কোনও অলীক কল্পনার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী সিদ্ধপুরুষ নহেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্যে যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, অক্ষয়কুমার এ পর্য্যন্ত তার সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। করিলে, কবিতাগুলি তিনি লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু সে তত্ত্ব কয়জনার ভাগ্যেই বা প্রকাশিত হইয়া থাকে? সে তত্ত্বের উপদেষ্টা অতিশয় দুর্লভ; উপযুক্ত অধিকারী শ্রোতাও অতিশয় দুর্লভ। "দেবৈরত্রাপি পুনঃ বিচিকিৎসিতা পুরা"—অতি প্রাচীনকাল হইতে দেবতারাও এ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। "ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ"—এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব মনুষ্যদিগের পক্ষে সুবিজ্ঞেয় নহে। অক্ষয়কুমার এই দেবদুর্লভ তত্ত্ব আয়ত্ত করেন নাই, এ কথা বলিলে এই তত্ত্বেরই কেবল মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভার বা মনীষার কোনও অবমাননা করা হয় না। অক্ষয়কুমার, ইদানীন্তন কালে সভ্যজগতে যে শিক্ষাদীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই লাভ করিয়াছেন। তিনি একালেরই কবি ও মনীষী। এ কালটা যুক্তিপ্রধান, অতিশয় প্রত্যক্ষবাদী। এ কালের শিক্ষা ও সাধনার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ,—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরেই বিশেষভাবে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধনা আপনাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তর্কের দ্বারা যে তত্ত্ব লাভ করা যায় না, অক্ষয়কুমার সে তত্ত্ব লাভ করেন নাই বলিয়া, কোনও নিন্দার কথাও হয় না. তবে অক্ষয়কুমার এই অতর্কপ্রতিষ্ঠ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার না পাইয়াও যে ইহার কল্পিত উপদেশ দিতে যান নাই, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা। এই জন্যই এই গ্রন্থে কোনও অলীক কল্পনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থে এক দিকে যেমন কোনও গভীর তত্ত্বদর্শিতার প্রমাণ-পরিচয় নাই, অন্য দিকে সেইরূপ কোনও প্রকারের লঘুচিত্ততারও নামগন্ধ নাই। লঘুচিত্ত লোকেই কেবল মায়িক কল্পনার গোলাপী নেশা করিয়া, নানাবিধ জল্পনার সাহায্যে, আপনার গভীর শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ ও লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ লঘুচিত্তের উপরে, শোকের দাগ কখনও গভীরভাবে পড়ে না। তাহার প্রেম যেমন হাল্‌কা, শোকও সেইরূপই হাল্‌কা হইয়া থাকে। রোজা যেমন তিলার্দ্ধমাত্র একটা মন্ত্রার্দ্ধ পাঠ করিয়া, অপস্মার-রোগীর কল্পিত রোগযন্ত্রণার উপশম করিতে পারে; লঘুচিত্তের শোকবেদনাও সেইরূপ একবার চক্ষু বুঝিয়া, নষ্ট করিতে পারা যায়। লঘুচিত্ত বিরহীর শোক কদাপি সর্ব্বগ্রাসী হয় না। সে শোকে মর্ম্মের অন্তস্তলকে আলোড়িত করিয়া তোলে না। তাহাদের হাল্‌কা প্রেমের হাল্‌কা বিচ্ছেদে, হাল্‌কা শোকই জাগিয়া উঠে। আর সে শোকের আঘাতে জীবন-মৃত্যুর গভীর ও জটিল সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অক্ষয়কুমারের প্রেম

প্রগাঢ়, বিচ্ছেদ দুর্ব্বিষহ, শোক সর্ব্বগ্রাসী ; তাই এই শোকের আঘাতে তাঁহার পুরাভ্যস্ত জগৎটা চুরমার হইয়া গিয়া, সমগ্র বিশ্ব সমস্যাকে নূতন ও বিকট আকারে, তাঁহার চক্ষের উপরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কোনও রস যতক্ষণ না গাঢ় হইয়া উঠে, ততক্ষণ তাহার নিজস্ব রূপটা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে না। অক্ষয়কুমারের শোক অতিশয় গভীর ; তাঁহার বিরহ আগুনে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া এ শোক যেন নিরেট হইয়া উঠিয়াছে। আর এইজন্যই তাঁহার এই শোকগাথাতে সে গভীর শোকের বিচিত্র রূপগুলি এরূপ বিশদভাবে ফুটিয়াছে যেখানেই কোনও বিশেষ রস, কোনও ক্ষেত্রবিশেষে তাহার আপনার নিজস্ব রূপগুলিকে ফুটাইয়া তোলে, সেখানেই তাহা আপনার বিশিষ্ট আধারের সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া, সার্ব্বজনীন ও বিশ্বজনীন হইয়া উঠে। একের রস তখন সকলের রস, একের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা,—তখন বিশ্বের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা সন্দেহ ও শ্রদ্ধা হইয়া পড়ে। দর্পণে লোকে যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রস-চিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব রসের রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, বিস্মিত, পুলকিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইয়া উঠে। এই লক্ষণাক্রান্ত রস-পটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই-রূপ কাব্যসৃষ্টিই রসবিচারে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই, অক্ষয়কুমারের 'এষা'খানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

'এষার' প্রথম ও প্রধান গুণ—ইহার অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপরে এই কবিতাগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন। যে যেমন দেখে, সে তেমনি আঁকে। চিত্রের অস্পষ্টতা চিত্রকরের দৃষ্টির অক্ষমতাই প্রমাণ করে। 'এষার' চিত্রগুলিতে কোথাও এরূপ অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না। ইহার মধ্যে কোথাও কিছুই দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। অক্ষয়কুমার সুকুমার গোধূলিলগ্নে তাঁহার কবিতাসুন্দরীর অবগুণ্ঠনখানি ঈষদপসৃত করিয়া, সেই আলো-আঁধারের ইন্দ্রজাল-প্রভাবের মধ্যে, তাহার অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন না। তিনি কাব্যই সৃষ্টি করেন, সুললিত শব্দ যোজনা করিয়া, ইন্দ্রসভার অনিন্দ্য সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া, কবিতার নামে কেবল মোহিনী হেঁয়ালি রচনা করেন না। এই বিষয়ে অক্ষয়কুমার আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আদর্শের অনুকরণ করেন নাই, প্রাচীন কবিকুলশিরোমণিদিগেরই পদাঙ্কানুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম কি ভারতচন্দ্র, ইঁহাদের কেহই কাব্যের ছল করিয়া হেঁয়ালি গড়েন নাই। সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের মতন, কেবল শব্দহীন রাগরাগিণীর আলাপও করেন নাই। হেঁয়ালি জিনিষটা হেয় নহে ; উৎকৃষ্ট, সুনিপুণ হেঁয়ালি সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নবিশেষ সন্দেহ নাই। রাগিণীর অনর্থক আলাপও নিষ্ফল হয়

না। কিন্তু সে সকল কবিতা নহে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সার্থক অথচ সহজবোধ্য, সুললিত অথচ গভীরভাবদ্যোতক শব্দ যোজনা করিয়া গভীর রসের ছবি সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতাগুলি পড়িলেই বোঝা যায়, তাহাতে অস্পষ্ট বা দুর্ব্বোধ্য কিছুই নাই। আর বৈষ্ণব-কবিগণের রসানুভূতি সত্য ও গভীর ছিল বলিয়া, তাঁহাদের এই সকল অনুপম রসচিত্রও এমন অদ্ভুতভাবে এতটা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন সকল আন্তরিক রসানুভূতি আছে, সত্য, যাহাকে কোনও ভাষায় ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না। সে সকলকে কেবল ঠারে-ঠোরে ব্যক্ত করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিগণ এ সকল গভীরতম রসের রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহা কেমন সরল ও স্বচ্ছ, কেমন সুন্দর অথচ রসিকজনের নিকটে কেমন সহজবোধ্য হইয়া আছে! শরীরের যেমন একটা যৌবন আছে, প্রাণেরও সেইরূপ একটা যৌবন আছে। এই প্রাণের যৌবন অতিশয় অন্তরঙ্গ বস্তু; ভাষার এমন শক্তি নাই যে, সে যৌবনের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারে। অথচ চণ্ডীদাস এক কথায় কেমন সুন্দর ও সহজ ভাবে সে বস্তুটাকে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"তব্ যৌবন যব্ সুপুরুখ সঙ্গ।"

অথবা অতৃপ্ত, জ্বলন্ত রূপ-লালসার এমন চিত্রই বা আর কোথায় দেখিতে পাই ?—

কি পেখলু ব্রজরাজকুলনন্দন
রূপে হরল পরাণ।
নির্ম্মিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান।

অথবা অন্যত্র শ্যামরূপ-দর্শন-মুগ্ধা শ্রীরাধিকা পাগলপারা হইয়া ইচ্ছা করিতেছেন—এ ভুবনমোহনরূপ—

এমতি করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই।

এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ গভীরতম রসানুভূতিকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা কথায় বলা যায় না—যে গভীর অভিজ্ঞতার প্রকাশে 'বুদ্ধি-বচন হারে"—তাহাকেও সহজভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কোথাও কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া আপনাদের রসচিত্রগুলিকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখেন নাই। তাঁহাদের অন্তরের অনুভূতিগুলি অতিশয় গভীর ও সুস্পষ্ট ছিল বলিয়া, সে সকল অনুভূতি যতই গভীর ও অবাঙ্‌মনসগোচর হউক না কেন, তাহার অভিব্যক্তি কথনই অস্পষ্ট বা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই।

অক্ষয় বাবুর কবিতায় বৈষ্ণবকবিদিগের গভীর রসানুভূতি আছে, এমন কথা বলি না। বৈষ্ণবকবিগণ যে গভীর, নিদারুণ বিরহের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু জগতের আর কোনও সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরার সঙ্গে যেমন জলের তুলনা হয় না, বৈষ্ণব কবিগণের বিরহ-চিত্রের সঙ্গে অক্ষয়বাবুর এই শোকগাথারও সেইরূপ কোনই তুলনা হয় না। অক্ষয়কুমারের বিরহ কেবল বিরহ; ইহার মধ্যে নিগূঢ়তম মিলনের অনুপম আনন্দটুকু লুকাইয়া নাই। বিরহের দশ-দশার সন্ধান অক্ষয়কুমার এখনও পান নাই; তাহার তন্ময়ভাব এখনও আস্বাদন করেন নাই। অক্ষয়কুমারের কাব্যে বৈষ্ণব-কবিতার

নিগূঢ় রসানুভূতি ফুটিয়াছে, তাই এমন কথা বলি না। এ'কালে সে বস্তু ফুটিতে পারে না। আবার যদি সে সহজ সাধনা ও সহজ প্রেম কখন জাগিয়া উঠে, তবে হয় ত কখনও পুনরায় বাংলা-সাহিত্যে বৈষ্ণবকবিকুল-গুরুদিগের শূন্য আসন কোনও ভাগ্যবান্ সাধক-কবি শিরোমণির দ্বারা পূর্ণ হইতেও বা পারে। কিন্তু বৈষ্ণবকবিদিগের রসানুভূতি ও সাধনসম্পদ্ লাভ না ক'রয়াও, আপনার অধিকারে, অক্ষয়কুমারের কাব্য-সৃষ্টি, সত্যে ও সারল্যে, প্রাচীন কবিকুল-গুরুদিগের কাব্য-সৃষ্টি অপেক্ষা বড় বেশী হীন হইয়া আছে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের নিজেদের সময়ের ও নিজেদের সমাজের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ়তম ও সার্ব্বজনীন তত্ত্ব এবং ভাবগুলিকে আপনাদের কবিতাতে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারও তাঁর কাব্যে আমাদের সমসাময়িক বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ় ও সার্ব্বজনীন সমস্যা ও ভাবগুলিকে অতি বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁর কাব্যসৃষ্টির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা ঠিক সে চক্ষে দেখিতে পারি না। একদিকে তাঁদের অন্তরে পরলোক-সম্বন্ধিনী একটা কোমল শ্রদ্ধা ছিল, অন্যদিকে একান্তভাবে বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের ভিতরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের যম-নিয়মাদির সাধনে, একটা অদ্ভুত যোগশক্তি প্রায়ই লুকাইয়া থাকিত। এইজন্য অনেক সময় তাঁহারা নিতান্ত নির্ভীকভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিতেন, প্রিয়জনকেও ধীর-স্থির চিত্তে মৃত্যুর হস্তে অর্পণ করিতেন। আমরা হিন্দুর গঙ্গাযাত্রা-অনুষ্ঠানটাকে, একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম রীতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। শবদাহ-প্রথাটাকেও যে সর্ব্বদা ভাল মনে করি, এমনও বলা যায় না। কিন্তু মুমূর্ষু প্রিয়জনকে যারা গঙ্গাতীরস্থ করিয়া, গঙ্গাস্রোতে আকণ্ঠ ডুবাইয়া, সেই স্রোত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনপ্রবাহকে নিঃশেষ মিশাইয়া দিতে পারিত; আর যারা মৃত প্রিয়জনের দেহে স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিয়া, ভস্মসাৎ হইতে দেখিতে পারে, তারা মৃত্যুটাকে কত যে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়,—এ কথাটা তলাইয়াও দেখি না। শোক করিও না—এ উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে। শোকে ভগবানের মঙ্গলবিধানের মুখ চাহিয়া, তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া, সান্ত্বনালাভ করিবে—এ কথাও সকল উন্নত ধর্ম্মেই বলে। The Lord gave, the Lord hath taken away, Blessed be the name of the Lord!—খৃষ্টীয়ান-সাধনা এইভাবেই শোকার্ত্তের সান্ত্বনা দান করে। কিন্তু হিন্দু কেবল ভগবানের মঙ্গলবিধানের দিকে চাহিয়াই, বৃথা শোক করিবে না, এ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৃতব্যক্তির কল্যাণের মুখ চাহিয়া,—যাকে এতই ভাল-বাস, তার সুখশান্তির জন্য শোক হইতে বিরত হও,—কেবল হিন্দুই এ কথা বলেন। ইহ-লোকে তোমাদের অশ্রুজল ও আর্ত্তনাদ যেমন তাহাকে তোমাদের কাছে টানিয়া আনিত, মৃত্যুর পরেও সেইরূপ, সেই মায়া-মমতার

বন্ধনই তাঁর প্রেতাত্মাকে এই নিরীন্দ্রিয় অবস্থায় এই ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য জগতে টানিয়া রাখে। এ উপদেশ আর কোনও ধর্ম্মে শুনি নাই। এই সকল কারণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে ভাবে দেখিতেন, তাঁদের সে শ্রদ্ধা হারাইয়া ও যে সকল আচার-ব্যবহার ও রাজনীতির ভিতর দিয়া তাঁদের ইহজীবনটা গাড়য়া উঠিত, সেই সকল আচার-ব্যবহার ও রাজনীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া,—আর সে ভাবে আমরা মৃত্যুকে দেখিতে পারি না। তাঁদের শ্রদ্ধা কোমল ছিল, সহজ ছিল, গতানুগতিককে আশ্রয় করিয়াই সে শ্রদ্ধা বাঁচিয়া থাকিত। তাঁরা বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিতর্ক করিয়াই, প্রচলিত মতামতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জীবন যাপন করিতেন। আমরা তাঁদের সে কোমল শ্রদ্ধা হারাইয়াছি; অথচ সাধুযুক্তির দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসকে সংশোধিত ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধারও অধিকারী হই নাই। আমাদের চিত্ত সংশয়প্রবণ। আমাদের অধ্যাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ। তত্ত্বদৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে আমরা যে কেবলই প্রত্যক্ষবাদী ও নিতান্তই জড়বুদ্ধি এবং ইহসর্ব্বস্ব, এমনও নহে। ইন্দ্রিয়ভোগেও আমরা একান্ত তৃপ্ত নহি। শুদ্ধ পশুবৃত্তিতেও আমাদের মন উঠে না। কেবল ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগেতে হৃদয়ের যে নিম্মমতা ও কাঠিন্য জন্মে, আমাদের তাহাও জন্মে না। এ আসুরী সম্পদও আমরা লাভ করি না। কলাবিদ্যার অনুশীলনে, ললিতকলার উৎকর্ষ-সাধনে, আমাদের মধ্যে একান্ত ইন্দ্রিয়সুখ-লালসার ভিতরেও একটা অতীন্দ্রিয়ানুভূতি অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সামাজিক জীবনের ঔদার্য্যে ও বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায়, আমাদের হৃদয় একটা অভূতপূর্ব্ব কোমলতা লাভ করিয়াছে। জীবনের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সুখদুঃখানুভূতির শক্তিটাও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটা আমাদের নিকটে নিতান্তই জটিল হইয়া পাড়য়াছে। আমাদিগের কলারস-সংস্পৃষ্ট বিষয়প্রবণ কোমল চিত্তকে মৃত্যু যেরূপভাবে অভিভূত করে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিত্তকে সেরূপ অভিভূত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা আবার আমাদের অপেক্ষা অশেষগুণে সমধিক শোর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। বীর্য্যবান্ লোকের কষ্টসহিষ্ণুতা, হীনবীর্য্য বা নিবীর্য্য লোকের অপেক্ষা অশেষগুণে বেশী। কষ্টসহিষ্ণুতা তিতিক্ষার একটা মুখ্য অঙ্গ ও উপাদান; আর মৃত্যুর আঘাতও তিতিক্ষু লোককে একেবারে বিচলিত বা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের এই সকল অনায়াস-লব্ধ সাধনসম্পদ্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটা আমাদের নিকটে এক নূতন ভাবে, নূতন অর্থে নূতন শক্তিতে উপস্থিত হইতেছে। আমরা সহজে পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারিও না, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি একপ্রকারের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু আমাদের প্রাণ সে সিদ্ধান্তকে ধরিয়া সান্ত্বনা পায় না বলিয়া, তাহার বিরোধী বিশ্বাসকেও আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হয়। এই দু'টানায় পড়িয়া, আমরা কখনও একদিকে,

কখনও বা অন্যদিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। ইহাই আধুনিক সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। বর্ত্তমান যুগের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ ট্রেজেডি (tragedy)। অক্ষয়বাবু তাঁর 'এষা'তে এই ট্রেজেডিটাকেই অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্যে লর্ড টেনিসন্ তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়ামে'ও (In Memoriam) এই আধুনিক ট্রেজেডির চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। এই আধুনিক সাধনার এই বিশ্বসমস্যাটাকে আশ্রয় করিয়াই টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম'—বিশ্বসাহিত্যে একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'এষা'খানি ও টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম' একই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি। অক্ষয়কুমার টেনিসন্ জানেন, পাঠ করিয়াই পড়িয়াছেন তাঁর কবিকল্পনায় কোনও কোনও রস, এমন কি তার অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত, এই আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী কবি একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। এইজন্য 'এষা'তে কোথাও কোথাও 'ইন্ মেমোরিয়ামে'র ছায়া পড়িয়াছে, এমনও বা মনে হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও 'এষা'খানি অক্ষয়কুমারের, টেনিসনের নহে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে বাঙালী কবির প্রাণের ছাপ, হিন্দু কবির যুগযুগান্তবাহী বিচিত্র জাতীয় সাধনার সহিমোহর অঙ্কিত হইয়া আছে। আমরা ইংরেজি শিখিয়া টেনিসন না কি বহুবার পড়িয়াছি। টেনিসনের কতকগুলি কথা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদবাক্যের মতন প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজি পড়িতে ও লিখিতে, শুনিতে ও বলিতে, এই সকল ভাব ও ভাষা আমাদের চিন্তার সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া গিয়াছে। তাই টেনিসনের সঙ্গে সামান্য বাঙালী কবির নাম করিতে আমাদের শঙ্কা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, 'এষা'তে টেনিসনের অনুকরণের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ামে'র এখানে যেটা সর্ব্বপ্রথম কবিতা, তাহাই বস্তুতঃ তার শেষ কবিতা। ইহার সঙ্গে 'এষা'র শেষ কবিতাটীর তুলনা করিয়া দেখিলেই, অক্ষয়কুমার টেনিসনের নিকটে কতটা ঋণী, আর কতটাই বা এ কবিতাগুলি তাঁর কবিপ্রতিভার মৌলিক-সৃষ্টি, ইহা পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারা যায়। টেনিসনের প্রথম কবিতাটী এই :—

Strong Son of God, immortal Love,
　Whom we, that have not seen thy face,
　By faith, and faith alone, embrace,
Believing where we cannot prove ,

Thine are these orbs of light and shade ;
　Thou madest Life in man and brute ;
　Thou madest Death ; and lo, thy foot
Is on the skull which thou hast made.

Thou wilt not leave us in the dust :
Thou madest man, he knows not why,
He thinks he was not made to die ;
And thou hast made him thou art just.

Thou seemest human and divine,
Thou highest, holiest manhood, thou ;
Our wills are ours we know not how ;
Our wills are ours, to make them thine.

Our little systems have their day ;
They have their day and cease to be .
They are but broken lights of thee,
And thou O Lord, art more than they.

We have but faith · we cannot know ;
For knowledge is of things we see ;
And yet we trust it comes from thee,
A beam in darkness let it grow.

Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell ;
That mind and soul, according well,
May make one music as before

But vaster. We are fools and slight
We mock thee when we do not fear ·
But help thy foolish ones to bear ;
Help thy vain worlds to bear thy light.

Forgive what seem'd my sin in me ;
What seem'd my worth since I began ;
For merit lives from man to man,
And not from man, O Lord, to thee.

Forgive my grief for one removed,
Thy creature, whom I found so fair.
I trust he lives in thee and there
I find him worthier to be loved.

Forgive these wild and wandering cries,
　Confusions of a wasted youth ;
　Forgive them where they fail in truth,
And in thy wisdom make me wise.

অক্ষয়কুমারের 'এষা'র শেষ কবিতাটি এই :—

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ !
　ত্যজিয়াছ মর্ত্তভূমি,
　তবু আছ—আছ তুমি !
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।

　এত রূপ গুণ ভক্তি,
　এত প্রীতি অনুরক্তি—
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ !
নয়—এ মরণ নয়,　　দু'দিন বিরহ !
　আলোকে সু-বর্ণ ফুটে,
　আঁধারে সুগন্ধ ছুটে ;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম—যত্ন অনাগ্রহ।

　বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—
　সেই জপ তপঃ ধ্যান,
সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ।

প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে সতী,
　উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে !
　নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি।
　ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
　তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি !
হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !
　তোমারে হেরিনি, প্রভু,
　বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব্বজীবে সর্ব্বকালে দাও পদে স্থান।

তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো—অন্ধকার—বৃষ্টি,
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক তোমারি প্রদান !
ভাঙ্গিতে গড়িতে প্রেম ওহে প্রেমময় !
মরণে নাহি ত ভিন্ন
প্রেম সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় ।
শোকে ধূ ধূ হৃদি-মরু
আছে তার কল্পতরু ।
নেত্র নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় ।
তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ তোমারি ধরণী ;
তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতিজনা,
শোকে দুঃখ ভ্রমে কেন পরমাদ গণি ?
ব্যাপি' সর্ব্ব কাল স্থান
তব প্রভা দীপ্যমান,
ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি ।
দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন,
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে যায় না বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার ।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার !
নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভালমন্দ করিতে বিচার ।

মজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখান।
　　রোগে শোকে ভাবি ভবে
　　জন্মি নাই মৃত্যু তরে--
যদিও এ জন্ম মৃত্যু কেন নাহি জানি !

　　জানি—মনঃ প্রাণ দেহ
　　নহে আপনার কেহ —
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানা !
দাও প্রেম — আরো প্রেম, চির প্রেমময় !

　　আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি
　　আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয় !

　　জীবন মরণ পানে
　　বহে যাক্ সুখে গানে
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয় !
ক্ষম' এ ক্রন্দন গীতি—শোক অবসাদ !

　　সে ছিল তোমারি ছায়া—
　　তোমারি প্রেমের মায়া !
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ !

　　এখনো সে যুক্তকরে
　　মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ শুভ আশীর্ব্বাদ।

এই দুইটী কবিতাই একরূপ একই বিষয়ে, একই উপলক্ষে রচিত। দুইটীতেই মানব-প্রাণের একটা গভীর প্রার্থনা, মানবমনের একটা গভীর সমস্যা, মানবহৃদয়ের কতকগুলি গভীর ও জটিল রসকে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। টেনিসনের কবিতাটী পূর্ব্বে রচিত, অক্ষয়বাবুরটী পরের লেখা। অক্ষয়বাবুর কবিতার দু'একটি স্থানে মনে হয় যেন টেনিসনের একটু ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !
　　তোমারে হেরিনি, প্রভু
　　বিশ্বাস করি হে তবু—
সর্ব্বজীবে, সর্ব্বকালে দাও পদে স্থান।

তোমারি এ বিশ্বসৃষ্টি,
আলো—অন্ধকার—বৃষ্টি,
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক তোমারি প্রদান।

এখানে কেহ বা এমন মনেও করিতে পারেন যে, টেনিসনের—

Strong son of God, immortal love,
Whom we, that have not seen thy face,
By faith, and faith alone embrace,
Believing where we cannot prove
Thine are these orbs of light and shade
Thou madest life in man and brute,
Thou madest Death and lo, thy foot
Is on the skull which thou hast made

এই কবিতাংশের একটু ছায়া পড়িয়াছে। আবার—

তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
আমরা এ প্রতি জনা—

এখানে টেনিসনের

They are but broken lights of thee,

এই উক্তির গন্ধ পাওয়া যায়। আর—

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চিরপ্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
জীবন-মরণ পানে
বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!

এখানে টেনিসনের—

Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell;
That mind and soul, according well
May make one music as before
But vaster.

এই পঙ্‌ক্তীর একটু আভাষ যেন পাওয়া যায়। এবং সর্ব্বশেষে—

Forgive my grief for one removed,
　Thy creature, whom I found so fair
　I trust he lives in thee, and there
I find him worthier to be loved

এই ভাবটা যেন অক্ষয় বাবুর—

ক্ষম' এ ক্রন্দনগীতি—শোক-অবসাদ !
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া।

এই পদগুলিতে আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু এই সকল ভাবের আংশিক ঐক্য, দু'এক স্থলে, এমন কি, কোনও কোনও শব্দের অনুবাদ সত্ত্বেও, কিছুতেই অক্ষয়কুমারের এই কবিতাটীকে টেনিসনের অনুকরণ বলা যায় না। অক্ষয়কুমার হিন্দুর ভাষায়, হিন্দুর ভাবে, হিন্দুর তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া, তাঁর এই কবিতাটী লিখিয়াছেন। টেনিসন সেইরূপ খৃষ্টীয়ানী ভাষায়, খৃষ্টীয়ানী ভাবে, খৃষ্টীয়ানী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তার কবিতা গড়িয়াছেন। টেনিসনের কবিতাটী যতই সুন্দর ও সুমিষ্ট হউক না কেন, অক্ষয়কুমারের কবিতার তুলনায় অত্যন্ত লঘু—হালকা।

চরস্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন,
　নিরন্তর আত্মপূজা,
　তোমারে যায় না বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ।
　মলিন চঞ্চল মনে
　যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে
বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন!
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার!
　আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
　কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
কার কত সত্যমিথ্যা নিত্য-আবিষ্কার।
　নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,
　তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভালমন্দ করিতে বিচার!

অক্ষয়কুমারের এই পদ দুইটীর সঙ্গে টেনিসনের—

Forgive these wild and wandering cries,
　Confusions of a wasted youth ;

Forgive them, where they fail in truth,
And in thy wisdom make me wise.

এই পদের কোনই তুলনা হয় না। আর—

তার স্মৃতি সনে আজ তোমারি আস্বাদ।

টেনিসন কোথাও এই গভীর যোগের সন্ধান পান নাই। ইহার কাছে

I find him worthier to be loved—

নিতান্তই ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। আর এই দুইখানি কাব্যের শেষের এই দুই আত্মনিবেদনে যে বৈষম্য, যে পার্থক্য, যে উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষিত হয় "এষা" এবং "In Memorium"তেও প্রায় আদ্যোপান্তই তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভা সর্ব্ব বিষয়ে টেনিসনের কবিপ্রতিভার সমকক্ষ, এত বড় কথাটা বলিতে চাহি না। সে বিচারে আজ প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু একটু ধীরভাবে সর্ব্ব প্রকারের পূর্ব্বসংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব শূন্য হইয়া বিচার করিলে, বাংলা ভাষার এই সামান্য "এষা"খানি ইংরেজি "In Memorium" অপেক্ষা মূল বিষয়ের আলোচনায় ও মূল রসের অভিব্যক্তিতে যে কোনও অংশে হীন নহে বরং অনেক বিষয়েই গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর, এ কথা কতকটা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি। কথাটা প্রতিপন্ন করিতে হইলে যেমন টেনিসনের ও অক্ষয়কুমারের কাব্যের শেষ কবিতাটি পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলাম, সেইরূপই প্রত্যেক কবিতাটীর তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়। সে বিচার বিস্তর সময়সাপেক্ষ। কোনও দিন সে চেষ্টা করিতেও বা পারি। In Memorium বহু বহু বার পড়িয়াছি; তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি; শোকার্ত্ত হৃদয়ে, মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহাতে জীবন-মৃত্যুর সমস্যাটীকে যে এষার মতন এমন তন্ন তন্ন করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছে, এমনটা কখনও অনুভব করি নাই। টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়ামে অতি সুন্দর, অতি প্রাণোন্মাদক, অতি মধুর কথা অনেক আছে। কিন্তু ভাবের ঐক্য, রসের সঙ্গতি, রচনার ঘনবিন্যস্ততা বড় বেশী না। কবি বহু দিন ধরিয়া ঐ কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন বিবিধ বিষয়কর্ম্মের বিক্ষেপের মাঝখানে, এক একবার ছুটিয়া গিয়া এক একটী অংশ রচনা করিয়াছেন। যোগস্থ হইয়া, একৈকরসানুভূতিতে বিভোর হইয়া, লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই কাব্যে অনেক অবান্তর কথা আছে। একটা রসের অভিব্যক্তি, স্তরে স্তরে একটা ভাব মানুষের মনে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, শোকার্ত্তের চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কিরূপ, আর বিরহরসটারই বা প্রকৃতি কি, ইহা একেবারেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের "এষা" টেনিসনের "In Memorium অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। "In Memorium-এর মুখ্যী আলো, 'এষা'র মুখ্যী আশা। তারপর [illegible]

গাথার মূল লক্ষ্যই করুণরসের অভিব্যক্তি। টেনিসনের কাব্যে সে গভীর করুণা কোথায়? অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানির প্রতিছত্রে নিদারুণ, মর্ম্মস্পর্শী কারুণ্য-অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(উপন্যাস)

৬।

প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা হাট' হইয়া খুলিয়া গেল—দরজার সম্মুখে ভীষণদর্শন এক মনুষ্যমূর্ত্তি! পাঠক, এ মূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বেই আমাদের পরিচয় হইয়াছে।

জীন কক্ষমধ্যে দু' এক পদ অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গেল। তাহার পৃষ্ঠের থলি, হাতের গাইটযুক্ত যষ্টি, এবং তীব্র কঠোর দৃষ্টি—প্রেত-ছবির ন্যায় ভীষণ। ম্যাগলোয়ারের চীৎকার করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইল, সে শুধু ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ব্যাপ্টিস্তাইন প্রথমতঃ তাহাকে দেখিয়া ভয়ে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, তার পর ভ্রাতার দিকে দৃষ্টি পড়িতে, পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন। মিরিয়েল শান্ত-দৃষ্টিতে আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া ছিলেন।

জীন, মিরিয়েলকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই উচ্চকণ্ঠে ঝড়ের মত বলিয়া চলিল—

"শুনুন আমার নাম জীন ভ্যালজিন। আমি একজন দাগী আসামী, ১৯ বৎসর গ্যালিতে কাটিয়েছি। চার দিন আগে জেল থেকে কারামুক্তি পেয়ে পঁরতারলিয়ায়ের দিকে যাবার পথে চ'লে আস্ছি। আজও আঠারো ক্রোশ পথ হেঁটেছি। সন্ধ্যার সময় এ সহরে এসে পৌঁছেছি। এ পর্য্যন্ত যে হোটেলে বা বাড়ীতে গিয়েছি সবাই আমার হলদে ছাড়পত্র দেখে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। জেলখানায় গেলাম—তারাও ঠাঁই দিলে না। মাঠে গেলাম—আকাশ জুড়ে মেঘ উঠল, তারা ঢেকে গেল। ভাবলাম—বৃষ্টি হয় ত কোথায় দাঁড়াব। ভগবান্ নেই, বৃষ্টি থামাবেই বা কে। তাই সহরেই ফিরে এসে বাগানের সামনে পাথরের বেঞ্চে শুয়ে ছিলাম;—এক বৃদ্ধা এই বাড়ী দেখিয়ে দিলে। এটা কি রকম বাড়ী? সরাইখানা কি? ভয় নেই, আমার পয়সা আছে। উনিশ বছর ধ'রে কয়েদ খেটে আমি ১০৯ ফ্র্যাঙ্ক ১৫ স্যুস জমিয়েছি। ক্ষুধায় আর চলতে পারিনে। আপনাদের এখানে জায়গা হবে?"

"ম্যাগলোয়ার, আর একখানা থালা আন।"

লোকটা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া মিরিয়েলের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"করেন কি?—শুনুন, শুনুন—বুঝেছেন আমি কে?—আমি কি? আমি গ্যালির কয়েদী, সবে মাত্র ছাড়া পেয়েছি। এই দেখুন—"

বলিয়া সে কোর্ত্তার জেব হইতে একখানা ছাড়পত্র বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন, এতে কি লিখ্‌ছে।—'জীন ভ্যাল্‌জীন, সাং—, ১৯ বৎসর ধরিয়া গ্যালির কয়েদী। পাঁচ বৎসর ডাকাতির জন্য, এবং চারিবার পলায়ন-চেষ্টার অপরাধে বাকী চৌদ্দ বৎসর। লোকটার প্রকৃতি বড় ভয়ঙ্কর।' এ দেখেও আপনারা আমাকে খেতে দেবেন?—শোবার জায়গা দেবেন? এটা কি একটা সরাই?—আপনাদের ঘোঁড়শাল আছে ত?"

"ম্যাগ্‌লোয়ার, কোণের ঘরের বিছানায় একটা ফরসা চাদর পেতে দিয়ো।"—তার পর আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া মিরিয়েল বলিলেন—"আসুন মশায়, এই আগুনের দিকটায় এগিয়ে এসে বসুন। খাবার হ'ল বলে; খেতে খেতে আপনার বিছানাও হ'য়ে যাবে এখন।"

লোকটা যেন ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল—কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এ ব্যবহার তাহার পক্ষে অপ্রত্যাশিত, অপূর্ব্ব! তাহার ভীষণ-কঠোর সে মুখের উপর একে একে বিস্ময়, সন্দেহ এবং আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল! সে ছবি—নানাভাবসংঘাতের সে অপূর্ব্ব মিশ্রণ—বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ! লোকটা উন্মাদের ন্যায় অসংবদ্ধ ভাবায় বলিতে লাগিল—"সত্যি? মিথ্যা নয়? 'দূর হ, কুকুর' ব'লে আর সবারই মত আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না? আমি জান্‌তাম—আমাকে দূর ক'রে দেবেন, তাই আগে থেকেই পরিচয়টা দিয়েছিলাম। আমায় খেতে দেবেন?—গদি-চাদর-ওয়ালা বিছানায় শুতে দেবেন?—বিছানা! হায়, উনিশ বছর ধ'রে বিছানায় আর শুইনি। আপনার নাম? আপনি যা চান, তাই দেবো। আপনি খুব ভাল লোক। আপনারই এ সরাই বুঝি?"

"আমি একজন ধর্ম্মযাজক। এই বাড়ীতে বাস ক'রে থাকি।"

"ধর্ম্মযাজক!—ওঃ, তা হ'লে আর আমাকে টাকাকড়ি কিছু দিতে হবে না, কেমন? আপনি ঐ বড় গির্জ্জাটার পাদরী বুঝি? কি বোকা! এতক্ষণ আপনার টুপির দিকে চাই-ই নি—" বলিয়া, যষ্টি ও থলিটা সে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিল। 'আপনার খুব দয়া! কই আমাকে ত ঘৃণা করলেন না—তা হ'লে আমার কাছ থেকে আপনি টাকা চান না, কেমন?"

"না, টাকা আপনি রেখে দিন্। কতদিনে আপনি টাকা ক'টি উপার্জ্জন করেছেন?"

"উনিশ বছরে।"

"উনিশ বছরে।" মিরিয়েল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

জীন বলিতে লাগিল—"আমার সে টাকা সবই জমা আছে। পথে আস্‌তে আস্‌তে মজুরী খেটে কিছু পেয়েছিলাম, তাতেই এ চার দিনের খরচ চ'লে গেছে। আপনি একজন পাদরী না?—তবে একটা কথা বলি শুনুন—আমাদের জেলখানায় একদিন সর্দ্দার পাদরী উপদেশ দিতে এসেছিলেন। আমরা যত কয়েদী তিন দিকে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়ালাম; পাছে আমরা কেউ কিছু করি ব'লে আমাদের ঠিক সামনে গোলন্দাজেরা গোলাভরা কামান নিয়ে পল্‌তে জালিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর সুমুখের সেই ফাঁকা দিকটার [illegible] দাঁড়িয়ে সেই সর্দ্দার পাদরী [illegible] লাগ্‌লেন। তাঁর সে বক্তৃতা [illegible]

ত দূরের কথা, ভাল ক'রে তাঁকে দেখ্‌তেই পাচ্ছিলাম না। খালি তাঁর মাথার উপর কি একটা সোণার জিনিষ চক্‌মক্ কর্‌ছিল, তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। এই হ'ল সর্দ্দার পাদরী, আর এই তাঁর ধর্ম্মের উপদেশ!"

দরজাটা খোলা ছিল; মিরিয়েল নিজেই যাইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন।—বলিলেন —"রাত্রিটা বড় কন্‌কনে। আপনার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।—ম্যাগ্‌লোয়ার উঁর খাবারের জায়গাটা আগুনের দিকে ক'রে দিয়ো।"

যতবার মিরিয়েল তাহাকে 'আপনি' 'মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, ততবারই আগন্তুকের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কয়েদী, বিশেষতঃ গ্যালির আসামীর পক্ষে সে সম্মানলাভ, মরুভূমে তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ জীবের পক্ষে সুশীতল বারিপূর্ণ পাত্রের ন্যায়ই লোভনীয়। হীনতা সম্মানের জন্য এমনই লালায়িত হয়।

মিরিয়েল অকস্মাৎ বাতিদানের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"তাই ত, আলোটা বড় মিট্‌মিট্ কর্‌ছে যে!"

ম্যাগ্‌লোয়ার্ তাহার অর্থ বুঝিল। মিরিয়েলের শয়নকক্ষের আলমারী হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত দুইটি বাতিদান আনিয়া, জ্বালাইয়া, টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল

জীন উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। বলিল—"এত দয়া আপনার! আমায় ঘৃণা না ক'রে গৃহে ঠাঁই দিলেন; আমি কে, তা জেনে, [illegible] আমার জন্য এত সম্মান [illegible] [illegible] বসিয়াছিলেন; মৃদুভাবে তাহার করস্পর্শ করিয়া বলিলেন—"আপনি কে, সে কথায় আমার প্রয়োজন নেই। এ গৃহ আমার নয়—ভগবানের। এখানে অতিথির নাম কেউ জানতে চায় না, তার কোন দুঃখ আছে কি না, সেইটুকুতেই তার প্রয়োজন। আপনি দুঃস্থ, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, এখানে আপনার অবারিত দ্বার। না, ধন্যবাদ দেবেন না, আমি যে আপনাকে আমার বাড়ীতে আশ্রয় দিচ্ছি—এ কথা ভাব্‌বেন না। এ বাড়ীতে আমার যা অধিকার—আপনারও তাই,—বরঞ্চ বেশী। আপনার নাম আমি জান্‌তে চাই না,—আপনি বলবার আগেই তা জেনেছি।"

লোকটা বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে মিরিয়েলের প্রতি চাহিয়া বলিল—"সে কি?—কিসে জান্‌লেন?" গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে মিরিয়েল উত্তর করিলেন—"কেন, আপনি যে আমার ভাই।"

লোকটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল—"আপনি মানুষ নন, দেবতা। কি বল্‌ব—ভাষা জানি না। আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই—সব ভুলে গেছি।"

"আপনি কি জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন?"

'দুঃখ কষ্ট! উ, সে কথা আর কেন বলেন? সেই লালবোর্ত্তা, লোহার শিকল আর গোলা, কাঠের তক্তার শয্যা, অসহ্য গ্রীষ্ম, তীব্র শীত, কারণে অকারণে কশাঘাত আর নির্য্যাতন, কথায় কথায় অন্ধকারময় নির্জ্জন কারাগারে নির্ব্বাসন, রোগশয্যায় প'ড়েও শৃঙ্খলের হাত হ'তে নিস্তার নেই—উঃ, কুকুরেরাও এর চেয়ে সুখে থাকে!

উনিশ বছর এইভাবে কেটেছে। এখন আমার বয়স ছ'চল্লিশ। এতদিনে ছাড়া পেয়েছি, তবু এখনও তার জের চল্‌ছে এই হল্‌দে ছাড়পত্রই তার প্রমাণ।"

"সত্য বটে, আপনি অসহ্য দুঃখযন্ত্রণা সহ্য ক'রেছেন কিন্তু এটা স্থির জান্‌বেন স্বর্গে একজন মাত্র যথার্থ অনুতপ্তের অশ্রুতে যে আনন্দোচ্ছ্বাস জাগে শতজন সাধুপুরুষের আগমনেও তা জাগে না। সে দুঃখ ব্যথা থেকে যদি মানবের প্রতি শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে বাহির হ'য়ে এসে থাকেন—তবে আপনি করুণার পাত্র, আর যদি সে দুর্দ্দিনের শিক্ষা থেকে মহানুভাবকতা, চিত্তের প্রশান্তি এবং সাধু সংকল্প লাভ ক'রে থাকেন তা হ'লে আপনি আমাদের মত সাধারণ যে কোন লোকের চেয়ে অনেক বড়।"

ম্যাগ্‌লোয়ার ইতিমধ্যে খাবার লইয়া আসিয়াছিল—নিতান্ত সাদাসিদা রকমের আহার্য্য, তবে ম্যাগ্‌লোয়ার কি বুঝিয়া, অপরাহ্ন হইতে এক পাত্র ভাল পানীয়ও আনিয়াছিল।

"ব'সে পড়ুন, আর কি?"—বলিয়া মিরিয়েল নিজেই আহার্য্য বণ্টন করিতে আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। সহসা মিরিয়েল বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত, টেবিলটা খালি খালি লাগ্‌ছে কেন?" আসল কথা, অতিথি অভ্যাগত আসিলে, রূপার ছয়খানা থালাই টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখার তাঁর নিয়ম ছিল। ম্যাগ্‌লোয়ার্ তিন জনের উপযোগী তিনখানি মাত্র থালা বাহির করিয়াছিল।—মিরিয়েলের 'বড়মানুষি'র মধ্যে এইটুকুই ছিল। এই যে কৃত্রিম বড়মানুষির ভাব, ইহাতে এমন একটা শিশুসুলভ সরলতা মিশ্রিত ছিল, যাহা তাঁহার সাংসারিক দারিদ্র্যকে মহিমামণ্ডিত করিয়াই তুলিত। আজ সে লোকও নাই, সে সংস্কারও বড় আর দৃষ্টিপথে বড় পড়ে না।

ম্যাগ্‌লোয়ার বাকী তিনখানা রূপার থালা আনিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। লোকটি তখন কোন দিকে না চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া খাইয়া যাইতেছিল। আহারাদির পর সে বলিল "মহাশয়, আমার পক্ষে এ খাবার আশার অতিরিক্ত। কিন্তু তবু সত্য কথা বলিতে কি সে গাড়োয়ানগুলাও আপনার চেয়ে ভাল খায়।"

অন্য কেহ হইলে হয়ত এ কথায় ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু মিরিয়েল সহজভাবে উত্তর করিলেন "তা হবে, হয় ত আমাদের চেয়ে তাদের বেশী পরিশ্রম করতে হয়।"

"তা নয়। তবে আপনার মত এত গরীব নয়। আমি যা ভাব্‌ছিলাম আপনি বুঝি তাও নন। ভগবান্ যদি ন্যায়বিচারক হন, তবে একদিন আপনি ক্যুরে হবেন।"

'ভগবান্ খুবই ন্যায়বান্।" বলিয়া একটু থামিয়া মিরিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, তা হলে পঁয়তারলিয়ারেই যাবেন?"

"হাঁ, আর কোথায় যাব? কাল প্রত্যূষেই রওনা হ'তে হবে। অনেকটা পথ। এ অঞ্চলে রাত্রিটা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাটলেও দিনমানটা বেশই গরম থাকে দেখ্‌ছি।"

'তা, পঁয়তারলিয়ার বেশ জায়গা। কাজেরও সেখানে অভাব নেই। কাগজের কল, তেলের কল, চামড়ার কারবার, ঘড়ির কারখানা, ইস্পাতের তামার কারখানা, আরও

অসংখ্য ছোট বড় কারবার সেখানে আছে আমাদের জানাশুনা লোকও সেখানে আছেন। তবে দুধের কারবারটাই সেখানে খুব বড়—কত শত মণ দুধ ছানা দই ক্ষীর সেখান থেকে প্রতিদিন বিদেশে চালান হয়।” বলিয়া মিরিয়েল বিস্তারিতভাবে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সে যেন অপর দশজনের মতই সাধারণ একজন মানুষ—তার জীবনের কোনখানটা যেন কলঙ্কমণ্ডিত নয়! বক্তৃতার এমন একটা সুন্দর সুযোগ, পাপীর প্রতি সদুপদেশ চেষ্টা, নির্মমভাবে ছুরিকা চালাইয়া ক্লেদপরিপূর্ণ শোষণ-নালী উন্মুক্ত করিয়া পাপের প্রতি পাপীর যাহাতে যথার্থ ঘৃণা জন্মে, তাহার প্রয়াস—এ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া বরং তিনি তাহার অতীত জীবনটাকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইতেই চাহিতে-ছিলেন। যথার্থ করুণা এইখানেই নয় কি? অতীতের ভারে যে প্রতিনিয়তই প্রপীড়িত হইতেছে—তাহাকে মুহূর্তের জন্যও সে কথা ভোলানই কি যথার্থ করুণ নহে?—এই যে মহাপ্রাণতা, যাহা সকল বক্তৃতা উপদেশ দূরে রাখিয়া, হতভাগ্যের জীবনের ক্ষতস্থানে হস্তস্পর্শ করিয়া তাহার যন্ত্রণা আর বৃদ্ধি করিতে চায় না;—এই যে সঙ্কোচের ভাব,—ইহাতে কি যথার্থ দেবত্বের ছায়াপাত নাই?

আহারান্তে উপাসনাদির পর মিরিয়েল বলিলেন—“চলুন মশায়, আপনার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি।”

একতালায় [illegible] শেষের কক্ষটি অতিথির [illegible] ছিল। মিরিয়েলের শয়নকক্ষের [illegible] একমাত্র প্রবেশ-পথ। অতিথির সঙ্গে মিরিয়েল যখন আপন কক্ষ দিয়া যান, তখন ম্যাগ্‌লোয়ার্ তাঁহার শয্যা-শিয়রস্থ দেওয়াল-আলমারিতে রূপার পাত্র-গুলা তুলিয়া রাখিতেছিল; শয়নের পূর্ব্বে এটা তাহার প্রতিদিনের কাজ ছিল।

শয্যা প্রস্তুত ছিল। মিরিয়েল বলিলেন—“তা হ’লে আপনি এখন শু’ন। সুনিদ্রা হোক্। কাল সকালে রওনা হবার আগে একবাটি গরম দুধ খেয়ে তবে যাবেন।”

“সে আপনার অনুগ্রহ।”—বলিয়া সহসা লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। সতর্ক করিবার জন্য, না ভয় দেখাইবার জন্য, না তাহার সহজাত-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিতায়—কে জানে কিসের জন্য। সে সহসা উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিল—‘সে কি মশায়? আপনার এত কাছে আমাকে শুতে দিচ্ছেন? আপনি পাগল না কি? আমি যে একজন খুনী নই, আপনাকে কে বললে?”

মিরিয়েল ধীরস্বরে উত্তর করিলেন—“সে ভাবনা ভগবানের—আমার নয়।” বলিয়া বৃদ্ধ আগন্তুকের দিকে ধীরে ধীরে আপন দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলন করিয়া নীরবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তার পর নিঃশব্দে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তখনও তাঁহার শয়নের সময় হয় নাই। বাগানে আসিয়া তিনি পায়চারি করিতে লাগিলেন এবং ভগবানের যে রহস্যময় অপূর্ব্ব লীলাবৈচিত্র্য গভীর রজনীতে ভাবময় মানব-চক্ষে ফুটিয়া ওঠে, তাহারই ধ্যানধারণায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

এদিকে, লোকটা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিল যে, জামাজুতা না ছাড়িয়াই—ফুঁ দিয়া

বাতিটা নিভাইয়া দিয়া, একেবারে বিছানায় গিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তপরেই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইল।

মিরিয়েল অনেকক্ষণ পর ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষণপরেই সে ক্ষুদ্র বাড়ীটি গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

সুখ-স্মৃতি

১

চির-সাথী বীণাখানি ছিল মোর করে।
প্রভাতে গাহিত পাখী,
ফুলে ছেয়ে যেত শাখা,
জাগিত হৃদয় মোর কি পুলক ভরে।
আকাশ বাতাস ভরা—
কি যেন আকুল-করা—
হরষ-প্লাবন আসি' পশিত অন্তরে—
আজ মনে পড়ে।

২

গগনে প্রখর রবি,
শ্যামল প্রান্তর-ছবি,
অলস মধ্যাহ্ন-বেলা—পতঙ্গ-গুঞ্জন,
নিবিড় প্রচ্ছায় বট,
জনহীন নদীতট
বদ্ধ-তরী দুলে স্রোতে—ব্যর্থ আকিঞ্চন—
টুটিতে বন্ধন।

৩

পাখী উড়ে নীলাকাশে,
কৃষ্ণ বিন্দু যেন ভাসে,—
আঁখি দুটি তারি পানে—সে যেন আপন!
স্নেহ তপ্ত সুনিবিড়
কোথা' তার আছে নীড়,
ক্ষুদ্র সুখ দুখ তার—গৃহীর মতন
কলহ-মিলন!

৪

ফুটিত সন্ধ্যায় তারা,
শুভ্র জ্যোৎস্নারধারা
ঢালিত আকাশে চাঁদ—হাসি' সুধাহাসি;
বসিতাম বীণা নিয়া,
তৃপ্তিরূপা কাছে প্রিয়া,
ভাবিতাম—প্রিয়ার সে ফুল্লরূপরাশি—
কত ভালবাসি!

৫

বীণায় কাঁপিত সুর,
প্রেমস্বপ্নে পরিপূর—
চাহিতাম প্রিয়ামুখ—সুষমার সার!
এই স্বর্গ—এই সুখ,
জানি না কোথায় দুখ,
কোন শূন্য কোন দৈন্য নাহি প্রাণে আর—
এত সুখ কার!

৬

হেরি' নিদ্রালস ভরে—
আঁখি-পাতা ঢুলে পড়ে
প্রিয়ার আমার—বীণা রাখিতাম পাশে!
ঘুমঘোরে বাহু তার
বাঁধিত গলায় হার!
হায়! সে সুখের নিশি যদি ফিরে আসে—
এ বিরহ নাশে!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

পাথরের সন্দেশ

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগে প্রস্তর কত কথাই বলিতেছে, কত সংবাদই দিতেছে, অতীতের কত গৌরবকাহিনী বিবৃত করিতেছে। যে ইতিহাস মানুষ লিপিবদ্ধ করে নাই, অথবা লিপিবদ্ধ করিলেও জলবায়ুর দৌরাত্ম্যে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, পাষাণ সে ইতিহাসও বক্ষে ধারণ করিয়া যুগযুগান্তের পর মানুষের ঘরে আসিয়া হাজির হইতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকিয়া আত্মরক্ষা করতঃ যে কাহিনী সে এত দিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছে, কত কুসংস্কারের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেছে। কি উড়িষ্যায়, কি দাক্ষিণাত্যে, কি পাঞ্জাবে, সর্ব্বত্রই পাষাণ-স্থপতি ও ভাস্করগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি সকল ঘোষণা করিতেছে। খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, পুরী, ভুবনেশ্বর বা কণার্ক, ইলোর, এলিফ্যান্টা, অজন্তা বা পাণ্ডবগুম্ফা, দিল্লী, আগ্রা বা কুতব—যেখানে যাওয়া যাক্, সকলেই নীরবে জাতীয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া কেবল মাত্র বাঙ্গালীই একটা আক্ষেপ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে—তাহার দেখাইবার কিছু নাই। হৃদয়ের এই সন্তাপ নিবারণের জন্য তাহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে, এই প্রস্তরবিহীন প্রদেশে তখনও ভাস্কর-শিল্পের স্থান নাই। কালেও যা ছিল, তাহাও আর [illegible] বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। [illegible] বাঙ্গালী ডেপুটীর মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি প্রমাণ পাইয়াছেন যে, উড়িষ্যার অনেক কীর্ত্তি বাঙ্গালী শিল্পীর রচিত। যে বাঙ্গালী নিজের দেশে কিছুই করিতে পারে নাই, সে বাহিরে যাইয়া কৃতিত্ব দেখাইতেছে, ইহার পক্ষে যুক্তি এই যে, দেশে প্রস্তরের অভাব। দেশে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা নাই বলিয়া বিদেশ হইতে ব্যাখ্যাকার আসিয়াছিল বলিয়া যে জাতির প্রবাদ, তাহারা কি বিদেশ হইতে প্রস্তর আনিয়া আপনাদের কীর্ত্তি স্বদেশেই চিরস্থায়ী করিতে পারিত না? এই সন্দেহ মনে জাগিলেও, খোস্ খবরের ঝুটাও ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া গিয়াছিল। সময়ে সময়ে শিল্পচাতুর্য্যের দুই একটী নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিদেশ হইতে আনীত বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্ধারিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে এমন একটী ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে বাঙ্গালীকে আর মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে না। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে এমন বৃহদাকার প্রস্তর-খণ্ড সকল পাওয়া গিয়াছে যাহা তক্ষণ-কার্য্যের উপযোগী করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, কোনও দৈব-দুর্বিপাকে কার্য্যক্ষেত্র হয় নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রস্তর বিদেশ হইতে আনীত হইলেও, শিল্পী দেশীয়। বিষয়টী এখন আর কেবল মাত্র অনুমানের অন্তর্ভূক্ত নহে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি বাঙ্গালী জাতির এই বিষয়ক কৃতিত্ব প্রত্যক্ষী-ভূত করাইয়া সমগ্র জাতির [illegible] ভাজন হইয়াছেন। আরও গৌরবের বিষয় এই যে, এই সমিতি সম্পূর্ণরূপেই বাঙ্গালীর

কীর্ত্তি—ইহার জন্মদাতা বাঙ্গালী, ইহার পরিচালক বাঙ্গালী।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি নানা দিকে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে তোলপাড় কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাস যে লক্ষ্মণসেনের পলায়নের ইতিহাস নয়, কিন্তু যে সময়ে উত্তর ভারত বিদেশীর আক্রমণে বিধ্বস্ত, সেই সময়ে বাঙ্গালীই সগর্ব্বে সাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান—এই ইতিহাস সেই গৌরবজনক ইতিহাস বাঙ্গালী কোনও কালেই যে ষষ্ঠাংশ দিয়াই আপনার রাষ্ট্রবিষয়ক কর্ত্তব্য শেষ করে না, কিন্তু সেই অন্ধকার-যুগেও অরাজকতার সময়ে স্বনির্ব্বাচিত রাজা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল এবং য়ুরোপ যে সময়ে ধর্ম্ম লইয়া কাটাকাটি করিতেছিল, বাঙ্গালী সেই সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা দিয়া রাষ্ট্র চালাইতেছিল—আমরা সেই ইতিহাস শুনিতে পাইতেছি। অন্যদিকে সমিতি যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা দ্বারা ভারতের ধর্ম্মবিকাশের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোঠা আলোকিত হইবে। কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস তন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু সে কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। আজ কেবলমাত্র তক্ষণ ও ভাস্কর-শিল্প-বিষয়ক সংগ্রহের কথাই বলিব এবং তাহাও অতি সংক্ষেপে। বিশেষ বিবরণ, বাঙ্গালী পাঠক ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্যে' প্রাপ্ত হইবেন।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি রাজসাহীতে যে সংগ্রহাগার স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। কৌতূহলবশতঃ দেখিতে গিয়াছিলাম, হৃদয়ের চিরদিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা মিটিবে—এ ধারণাই তখন ছিল না। কত দুর্লভ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, কত শিলালিপি, কত প্রস্তর-মূর্ত্তি! ধাতু ও দারুনির্ম্মিত সংগ্রহও আছে। কিন্তু প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যবদ্বীপে কতকগুলি মূর্ত্তি পাইয়া পণ্ডিতগণ মহাসমস্যায় পড়িয়াছিলেন—এগুলির আদর্শ কোথা হইতে আসিল? কিন্তু ভরসা হয়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সে সমস্যার মীমাংসার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছেন। সূর্য্যমূর্ত্তি, অৰ্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিতে বাঙ্গালার সামাজিক জীবনের কত কথা যে খোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। আমি মাত্র একটী মূর্ত্তির কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মূর্ত্তিটী বিষ্ণুর বাহন গরুড়। ইহা যে বাঙ্গালীর হস্তরচিত, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ঐ মূর্ত্তিটীর মধ্যেই রহিয়াছে। বিষ্ণু যেন স্বীয় বাহনের উপর ইচ্ছা করিয়াই একটু চাপ দিয়া বসিয়াছেন, গরুড় সে চাপ অগ্রাহ্য করিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে, ইহাই মূর্ত্তিটীর বাহ্যদৃশ্য। কিন্তু শিল্পীর সমস্ত শিল্প-চাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে গরুড়ের মুখে। শিল্পী আপনার প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া তন্ময়ভাবে একটী মহান্ আধ্যাত্মিক ভাবকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ সর্ব্বদাই ভক্তকে

পরীক্ষায় ফেলিয়া অনল-দগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তোলেন।—
"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ; তবু যদি না ছাড়ে পাশ, হই তার দাসের দাস।"
ইহা ভক্তি-শাস্ত্রের কথা। ভক্ত সর্ব্বদাই আনন্দ হৃদয়ে ভগবানের সকল ভাব বহনে প্রস্তুত। মৃত্যুতেও তিনি আনন্দ চিত্ত। ভগবান্, তুমি যত ভাবই চাপাও না কেন, তোমার প্রসাদে আমি সকল ভারই অতিক্রম করিতে সমর্থ—গরুড়মূর্ত্তি যেন দিব্যকণ্ঠে এই কথা বলিতেছে। প্রস্তরখানিতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, নির্ভরের আনন্দ এবং সর্ব্বোপরি ভগবদ্ভক্তের সদানন্দ হাসিমুখ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভক্তিকে এমন প্রকট মূর্ত্তি দিবার ক্ষমতা বাঙ্গালী ভিন্ন জগতে আর কাহারও নাই। মূর্ত্তিখানিতে বাঙ্গালিত্ব যেন দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সমিতির তোষাখানায় আমি যতক্ষণ ছিলাম, অধিকাংশ সময় এই রত্নটির নিকটেই ক্ষেপণ করিয়াছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহারই নিকটে আসিয়াছি এবং এই আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান-সমিতির যিনি মেরুদণ্ড, তাঁহাকে মনে মনে শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। মনে মনে এইজন্য যে, ধন্যবাদ লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হওয়া এক কঠিন কার্য্য। তিনি আদর্শ-কর্ম্মী। অন্যে যে স্থানে এক গুণ কার্য্য করিয়া দশ গুণ প্রশংসার জন্য লালায়িত, তিনি সে স্থানে আত্মগোপন করিবার জন্যই ব্যস্ত। অথচ অকাতরে তিনি এই কার্য্যের জন্য সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া স্থানান্তরে দুই কথা লিখিয়াছিলাম, প্রুফ্ দেখিবার সময় তিনি স্বহস্তে তাহা কাটিয়া দিলেন। বঙ্গের জমিদারগণ ঘরে বাহিরে অনেকেরই চক্ষুঃশূল কিন্তু তাঁহারা যদি কুমার শরৎকুমারের অনুকরণে দেশের মঙ্গলে আপনাদিগকে নিয়োজিত করেন, তবে জনসাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষার উপর তাঁহাদিগের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং সে শূল তাঁহাদিগের গাত্রও স্পর্শ করিবে না, কেবলমাত্র প্রতিপক্ষেরই চক্ষের বেদনা জন্মাইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্বৰ্গীয় জগদীশনাথ রায়

যখন জগদীশবাবু বালেশ্বর জেলায় পুলিশের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন সেই সময়ের পুলিশের ইন্‌স্পেক্‌টার জেনারেল্ কর্ণেল্ পিট্ সাহেব উক্ত জেলার পুলিশের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তথায় যান; গিয়া জগদীশ বাবুকে বলিলেন—"আমি আপনার পুলিশের কর্ম্ম দেখিতে চাহি না; আমি জানি, উহা উত্তম; বীমস্ সাহেবও আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন। আমি আপনার মিলিটারী সম্বন্ধীয় কার্য্য দেখিতে চাহি।" জগদীশবাবু উত্তর

করিলেন—“আপনি ঐ কর্ম্ম দেখিবেন বলিয়া আমি প্রায় তিন শত কনষ্টবল রিজার্ভে আনিয়া রাখিয়াছি; তাহাদের জন্য লইয়া সজ্জিত হইয়া এখনই আনাইতেছি।” কনষ্টবলেরা লাইনের মাঠে সমবেত হইলে, পিউ সাহেব স্বয়ং স্থানে স্থানে নিশান গাড়িলেন এবং বলিলেন—এইটী জঙ্গল, এইটী নদী, এইখানে শত্রুরা আছে; আপনি স্বয়ং হুকুম দিয়া আপনার ফৌজকে লইয়া যান, যাইবার সময় সমস্ত ম্যানুয়েল ও প্লাটুন এক্সারসাইজ্ দেখাইয়া যা'ন।” জগদীশবাবু তাহাই করিলেন এবং এমন সুচারুরূপে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন যে, পিউ সাহেব ছুটিয়া আসিয়া হস্তমর্দ্দন করিয়া উঁহাকে জয়যুক্ত ঘোষণা করিলেন; বলিলেন—“দেখুন, আপনি বাঙ্গালী, এই কর্ম্মে আপনার দোষ আমি নিশ্চয় পাইব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিতেছি যে, আমার পল্টনে কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা আপনি ভাল কাজ করিয়াছেন, আমি গবর্ণমেণ্টে আপনার সম্বন্ধে স্পেসিয়াল্ রিপোর্ট করিব। আশ্চর্য্যের কথা, আপনি শিখিলেন কেমন করিয়া? বিউগল ধ্বনি করিবার সময় ভুল করিয়াছিল; তাহাও আপনি জানিতে পারিয়া ভুল ধরিয়া তাহার দুই টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ধন্য আপনার অধ্যবসায়!” বালেশ্বরে থাকিবার সময় স্যার্ রিচার্ড টেম্পল্ ইঁহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রদান করিবার জন্য বড়লাটকে লেখেন। জগদীশ বাবু এ সংবাদ পাইয়া, তখনই ছোটলাটকে লিখিলেন এবং রায় বাহাদুর লিষ্ট হইতে আপনার নাম কাটাইয়া নিষ্কৃত হইলেন। টেম্পল্ সাহেব বড় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু উঁহার অনুরোধও উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

বালেশ্বরে একজন পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ জগদীশবাবুর আর্দ্দালী ছিল; এ লোকটি সাত হাত লম্বা এবং গৌরবর্ণ, ভাল লোক বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পুলিশ সাহেবেরাও ইহাকে আর্দ্দালীর পদে রাখিয়াছিলেন; এই লোকটার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা উড়িয়া যুবতীকে দেখিয়া তাহার প্রেমাসক্তি হইল। গভীর রাত্রে পুলিশ সাহেবের বাটী ত্যাগ করিয়া সে বুড়াবলং নদীর ধারে সেই স্ত্রীলোকটার ঘরে যা'য় এবং প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই স্ত্রীলোকটা অপর একটা ধনী ব্যবসায়ী মাইতি কায়স্থকে আপনার নিকট আসিতে দিত। কনষ্টবল এ কথা জানিতে পারিয়া ইহাকে বলে—‘দেখ, তোমার জন্য আমি জাত্ দিয়াছি এবং তোমার প্রেমে আমি পাগল, তুমি আর কাহাকে আসিতে দিও না।” স্ত্রীলোকটা সে কথা শুনিবে কেন? মাইতি যথেষ্ট পয়সা দিত, সুতরাং সে তাহাকে আসিতে নিবারণ করিত না। একদিন রাত্রে কনষ্টবল যেমন উহার ঘরে যাইতেছে, সেই সময়ে মাইতিও ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। যেমন তাহাকে দেখা, অমনি কোমর হইতে তলোয়ার খুলিয়া আর্দ্দালি এক কোপে তাহাকে কাটিয়া, নদীর জলে কাপড়, তলোয়ার ধৌত করিয়া, পুলিশ সাহেবের বাটী আসিয়া শয়ন করিল। প্রাতঃকালে যখন জেল ও ট্রেজরীর গার্ড এবং লাইনের জমাদার রিপোর্ট করিতে আসে, তখন কনষ্টবলও সেলাম করিয়া (সাক্ষী) দাঁড়াইয়াছিল। সকালে লাইনে একজন লোক দিয়া ফিরিতে লাগিল, [illegible]

মাঠে চলিল। ইত্যবসরে সিনিয়ার টাউন্ ইন-স্পেক্টার সারদাপ্রসাদ বসু আসিয়া রিপোর্ট করিলেন—"সহরে একটা খুন হইয়াছে।" জগদীশ বাবু উত্তর করিলেন—"তদারক করগে।" সারদাবাবু অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া চলিয়া গেলেন; লাইনে পৌঁছিয়া, কনষ্টবল, হেড্ কনষ্টবল প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাপড়-ওয়ালা মাইতি বায়স্থটি যে খুন হইয়াছে, তাহাকে কি তোমরা কেহ চেন? যদি চান, তবে বলিতে পার, বুড়াবলং নদী তীরে সে অত রাত্রে কেন গিয়াছিল।" জনৈক কনষ্টবল বলিল—"হুজুর, ওখানে একটা বেশ্যা আছে, তাহারই নিকট বাবু ঐ মাইতি যাইত।" সারদাবাবু বলিলেন—'সে বেশ্যাটার কাছে আর কেহ যাইত, তাহা কি জান?' কেহ সঠিক বলিতে পারিল না। একজন বলিল—"পুলিশ সাহেবের আর্দ্দালী শোভন সিংহকে ঐ স্ত্রীলোকটার বাটীতে যাইতে দেখিয়াছি।" তখন সারদা বাবু বলিলেন—"শোভন সিংহের চরিত্র খুব উত্তম, সে ২।৩ টা গুড্ কন্‌ডাক্‌ট্ ষ্ট্রাইপ্ পাইয়াছে, সকল পুলিশ সাহেবদের সে প্রিয়; অমন লোক বেশ্যাবাড়ী কেন যাইত? যাহাই হউক, তাহাকে ডাকাইয়া এ বিষয়ের কিছু জানে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষতি কি, একজন কনষ্টবল গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আন।' কনষ্টবলটি ডাকিতে চলিল এবং লাইনের মাঠের উপর দিয়া চলিল, পুলিশ সাহেবের বাটী এবং লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, এক বৃক্ষের তলায়, শোভন সিংহকে [illegible] অবস্থায় দেখিতে পাইল; [illegible] মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, মুখখানায় যেন চিনের সিন্দূর মাখাইয়া দিয়াছে; আরক্তিম মুখ এবং চক্ষু দু'টিও ঘোর লাল হইয়াছে এবং ঘুরিতেছে। তবুও সাহসে ভর করিয়া কনষ্টবল বলিল—'শোভন সিংহ, তোম্‌কো সারদা বাবু বোলাওতা হ্যায়; নদী-কিনারে ক্যা খুন হুয়া, উস্‌কা বাত্ তোম্‌কো কেয়া পুছেগা।' যেমন ঐ কথা শুনা, শোভন সিংহ অমনি তলোয়ার খাপ হইতে খুলিল এবং বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিল—"যাও, তোমারা ইন্-স্পেক্টার শালাকো কহো মেয়্ নেহি জায়েঙ্গা, মেয়্ খুন্ কিয়া, মেয়্ ফাঁসি জায়েঙ্গা।" কনষ্টবল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া লাইন অভিমুখে ছুটিল এবং সমস্ত সংবাদ জানাইল। সারদা বাবু, সাহেব রিজার্ভ ইন্‌স্পেক্টার, সাহেব হেড কনষ্টবল, পঞ্জাবী সুবেদার এবং নানাদেশীয়, নানাজাতীয় কনষ্টবলগণ ছুটিল। কনষ্টবলদের ভিতর উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, গুরখা, পাঠান, আফগান প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকই ছিল, লাঠী, সোটা, তলোয়ার, বন্দুক, বেওনেট্ লইয়া সকলে ছুটিল। গাছ-তলার নিকট পৌঁছিলে শোভনসিংহ বলিল—"দেখো, হামারা নগিচ্ কই মৎ আও, আনেসে যেয়সা উস্‌কা কাটা, তেয়সা তোম্ লোককো বি কাটেগা, হাম বোল্‌তা হ্যায়্ মেয় খুন্ কিয়া, মেয়্ ফাঁসি যায়েঙ্গা।" কেহই অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল না, ছররা দিয়া বন্দুক ভরিয়া রাখা হইল। শেষে সাব্যস্ত হইল—পুলিশ-সাহেবকে খবর দাও। জগদীশবাবু সংবাদ পাইয়া, যে বেশে ছিলেন, সেই বেশেই চলিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটা কিন-পাঁও ইজের, একজোড়া মোজা ও চটি জুতা, একটা জামা, তার উপর একটা আলখাল্লা

মতন। দ্রুতপদে তিনি চলিলেন এবং শীঘ্র গাছতলার নিকট পৌঁছিলেন। তাঁর পৌঁছিবার পূর্ব্বে সকলে বলিতেছিল "যদি পুলিশসাহেবের উপর চড়াও করে, তবে আমরা ছররা-গাদা বন্দুক উহার গায়ে মারিব।" জগদীশবাবু কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, একেবারে খুনে শোভনসিংহের পার্শ্বে গিয়া দাড়াইলেন এবং বলিলেন "তলোয়ার ফেঁকো, আবি তলোয়ার ফেঁকো।" এই হুকুম দিবার সময় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল. শোভনসিংহ তাঁহার মুখের দিকে দুই একবার তাকাইয়া তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল। তখন জগদীশবাবু হুকুম দিলেন—"ইহার হাতে হাতকড়ি দাও।" কেহ অগ্রসর হয় না; তখন তাঁহার জামার আস্তিন ধরিয়া বলিলেন "লাগাও হাতকড়ি।" সুবেদার দৌড়িয়া গিয়া হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন। তখন জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তোম এ খুন কিয়া?" "হাঁ হুজুর" উত্তর আসিল। তখন "লে যাও" বলিয়া জগদীশবাবু দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল এবং একবাক্যে বলিতে লাগিল—"কি সাহস, কি বীরত্ব।" কতকগুলি লোক যারা পূর্ব্বে পল্টনে কাজ করিত এবং যুদ্ধ বিগ্রহ দেখিয়াছে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"এ রকম বিক্রম আমরা যুদ্ধে কিম্বা অপর কোন কার্য্যে দেখি নাই।"

বালেশ্বরে চাঁদবালী বন্দর খুলিবার জন্য জগদীশবাবু বিস্তৃত করিয়া রিপোর্ট করেন। তাঁহারই রিপোর্ট পাইয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বন্দর খুলিলেন। বালেশ্বরে সমুদ্রের কিনারে নিমকের পোক্তান এখনও হয়। সমুদ্রকিনারা জঙ্গলপূর্ণ, নানা হিংস্রক জন্তুতে পরিপূর্ণ সুতরাং চোরাই পোক্তানি খুব চলে। গবর্ণমেণ্টের ইহাতে বহু ক্ষতি হয়। চৌকি পাহারা করিবার জন্য ছয়মাসের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োজিত হয়। তাহাদের ঠিকা চাকরি, সুতরাং অতিরিক্ত রোজগারের আশায় তাহারা পোক্তানকারীদের সহায়তা করে; সরকারের নিয়মিত লোক্সান হয়। কাপ্তেন্ চেম্বার্স নামক জনৈক ডিপুটি ইন্স্পেক্টার জেনারেল চুরি বন্ধ করিবার জন্য জঙ্গলের ভিতর হস্তিপৃষ্ঠে পুলিশ বসিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করেন, ব্যয়াধিক্য হয় বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। জগদীশবাবু এক সুকৌশল করিয়া চুরি বন্ধ করেন, নিমকের অস্থায়ী পুলিশকে তিনি স্থায়ী পুলিশের কার্য্য করিতে দিলেন এবং স্থায়ী পুলিশকে নিমক মহলে কার্য্য করিতে পাঠাইলেন, স্থায়ী দলকে বলিলেন—"দেখ, তোমাদের চিরদিনের রুটি, লোভে পড়িয়া তাহা হারাইও না, এক ছটাক অতিরিক্ত লবণ যেন পোক্তান না হয়। ভাল কাজ করিলে আমি তোমাদের শীঘ্র পদোন্নতি করিয়া দিব।" অস্থায়ী পুলিশকে বলিলেন,—"তোমাদের ছয় মাসের জন্য ঠিকা কর্ম্ম। যদি স্থায়ী পুলিশে আসিতে চাও, চোরাই লবণ ধরিতে চেষ্টা কর; এক ছটাক ধরিলেও তোমাদের মঙ্গল হইবে।" এই রকম উভয় পুলিশদিগকে উত্তেজিত করায় অতিরিক্ত আইনবিরুদ্ধ পোক্তান একেবারে বন্ধ হইল। অতিরিক্ত পোক্তানিটা কি, তাহা বুঝাইয়া বলি। ব্যবসায়ীরা কেহ ত্রিশ হাজার মণ, কেহ পঞ্চাশ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে সরকারকে

মাশুল প্রদান করেন। লবণ প্রস্তুত করিতে গেলে, সমুদ্রের জল চাই, সুতরাং সকল পোক্তানই (লবণ তৈয়ার করা) সমুদ্রের কিনারে হয়। এখন এ সব স্থান জঙ্গলপূর্ণ, হিংস্রকজন্তুর আবাসভূমি, ঐ সামান্য অতিরিক্ত পুলিশদল ব্যতীত পাহারা দিবার আর কেহ নাই, এই দলকে টাকায় বশীভূত করিয়া ত্রিশ হাজার মণ করিব বলিয়া পঞ্চাশ হাজার মণ 'তৈয়ার' করিয়া লইলে, কে আমার প্রতিরোধ করিবে? সরকারকে বিশ হাজার মণ তৈয়ার করিবার জন্য মাশুল ফাঁক দিলাম, অনেক টাকার সুবিধা হইয়া গেল।

জগদীশবাবুর বাঙ্গালা নামের উপর কি যত্ন ছিল এবং কেমন করিয়া তিনি পুলিশদলের উপর ডিসিপ্লিন্ (discipline) রক্ষা করিতেন, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি— নীলগিরি জঙ্গলের ভিতর, গড়জাত এলাকার একটা পুলিশ ষ্টেশনে ঘর নির্ম্মাণ হইতেছিল, জগদীশবাবু ঐ ঘরটা দেখিতে যান। ঘরটার দরজা জানালা তখন কিছুই বন্ধ নাই, চতুর্দ্দিক্ খোলা ছিল। জগদীশবাবুকে এ ঘরে রাত্রে বাস করিতে হয়। সামান্য একটা খাটিয়ায়, তিনি শয্যা করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি যখন গভীর হইল, চতুর্দ্দিকে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক এবং অপরাপর জন্তুর ভীষণ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। জগদীশ বাবুর নারায়ণ বলিয়া একটা বাঙ্গালী খান্‌সামা, ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভয়ে সেই প্রভুর খাটিয়ার নিম্নে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রহরী বলিয়া উঠিল— "দেখো, বাঙ্গালিকা কাম্, পুলিস সাহেব নিদ্ যাতা হায়, এ বাঙ্গালি উন্‌কো খাটিয়াকা তলেমে থাকে সুতা।" এ কথাগুলি, জগদীশ বাবুর কর্ণে গেল, তখন তিনি সহসা উঠিয়া, সে অন্ধকারে একাকী ষ্টেশন-ঘরের চারি পাশে অকুতোভয়ে বেড়াইয়া আসিলেন এত নিকটে জন্তুগুলা চীৎকার করিতেছিল যে, প্রতিক্ষণের সময় কোন না কোন একটা জন্তু তাঁহার সম্মুখে আসিতে পারিত, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ অকারণ বিপদ আহ্বান করা কেন? তিনি বাঙ্গালী, পাহারাওয়ালা বাঙ্গালী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী নামের গৌরব-রক্ষার্থে এবং তাঁহার অধীনস্থ ফোর্সের (force) ঠিক চাল বজায় রাখিবার জন্য, তিনি বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন।

বর্দ্ধমানের একটা দৈব ঘটনার কথা উল্লেখ করি মেজিষ্ট্রেট-কলেক্টার নরম্যান্ সাহেবের বাটীতে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া জগদীশ বাবু যান যাইবার সময় কাথবরটান হারপারের বাড়ীর তৈয়ারি একজোড়া জুতা (shoes) পরিতেছিলেন, সহসা তাহা খুলিয়া ফেলিয়া মর্টিন কোম্পানীর প্রস্তুত একজোড়া ব্যাল্‌মোরাল বুট (Balmoral boot) পরিলেন। পরিবার সময় তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—"দেখ, রাত্রে আসিব, 'সু'র পরিবর্ত্তে একজোড়া বুট পরা ভাল।" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন— "কেন, আসিতে গাড়ি যাইবে না?" তিনি বলিলেন—"দিবসে দু'টা ঘোড়া অধিক খাটিয়াছে, রাত্রে জুতিবার আবশ্যক নাই, বরং সন্ধ্যার বেহারাটা একটা লণ্ঠন লইয়া যেন যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিও।" রাত্রি দুইটার সময় যখন মজলিস ভাঙ্গিয়াছে, তখন জগদীশ বাবু বেহারার তত্ত্ব লইলেন। সে ব্যাটা সুখে স্বচ্ছন্দে সাহেবের বেহারার ঘরে

নাসিকার রব করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল; সাহেবের চাকরদের ভিতর কেহই তাহার থাকিবার স্থানের কথা অবগত ছিল না, কোন সন্ধান না পাইয়া জগদীশবাবু পদব্রজে চলিয়া গেলেন। একটি খ্রীষ্টানপাড়ার ভিতর দিয়া যেমন যাইতেছেন, পথ জুড়িয়া একটা গোখুরা সর্প শয়ন করিয়াছিল, জগদীশ বাবু তাহার মধ্যস্থলে যেমন পা দিয়াছেন, অমনি সে বিষধরটা তাঁর পায়ে ৩৪ ছোবল মারিল; কামড়গুলা বুটের উপর পড়িল, তাঁহার কিছু হইল না, বাঁচিয়া গেলেন, জুতা জোড়াটি পরা থাকিলে, কি অনর্থই ঘটিত, কে যেন তাঁহাকে জুতা ছাড়িয়া বুট পরিতে বলিল, ভগবান এই প্রকারে তাঁহার ভক্তদের বাঁচাইয়া থাকেন। রাত্রে বাটী পৌঁছিয়া জগদীশ বাবু আর্দ্দালীকে লণ্ঠন আনিতে হুকুম দেন। লণ্ঠন আনিলে, তাহার আলোকে দেখিলেন বুটের উপর তখনও বিষ রহিয়াছে, সর্পটা ছুটিয়া আসিয়া পাছে কামড়ায়, এই আশঙ্কায় জগদীশবাবু তাহার মাথা পদদলিত করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, কনষ্টেবলদের সেই সর্পটাকে তুলিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন, তাহারা সেটাকে আনিলে, দেখিলেন—তখনও সে গর্জ্জন করিতেছে, এক 'বাও' অপেক্ষাও লম্বা, কনষ্টেবলরা তখন সেটাকে লগুড়াঘাতে সংহার করিয়া অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিল।

(ক্রমশ)

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(২)

রস দুই জাতীয়;—এক স্থায়ী, অপর অস্থায়ী। রসতত্ত্ববিদেরা হাস্যাদ্ভুতাদিকে অস্থায়ী বা আগন্তুক, আর দাস্যাদিকেই স্থায়ী রস বলিয়া থাকেন। হাস্যাদি আগন্তুক রস ইতর জন্তুরাও আস্বাদন করিয়া থাকে। দাস্যাদি স্থায়ী রস কেবল মানুষেই আস্বাদন করিতে পারে। আর স্থায়ী এবং অস্থায়ী—এই উভয়বিধ রসের মধ্যে মাধুর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মাধুর্য্যে দাস্যাদির গুণ তো আসেই; কিন্তু তার উপরে এই মাধুর্য্যকে আশ্রয় করিয়া হাস্যাদি আগন্তুক রস সকলও অতি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠে। সচরাচর হাস্যাদি আগন্তুক রসের পরস্পরের মধ্যে একটা স্থিতি-বিরোধ জাগিয়া রহে। যে আধারে যে সময়ে ইহার কোনও একটা রস ফুটিয়া উঠে, সেই সময়ে সেই আধারে অপর কোনও আগন্তুক রস ফুটিবার স্থান বা অবসর পায় না। রুদ্ররসের আবির্ভাবে হাস্যের তিরোভাব অনিবার্য্য। [illegible] সঙ্গে ভাবনোদ্দ্য সমাবেশ ও [illegible]

অসাধ্য। কিন্তু মাধুর্য্যেতে সর্ব্বদাই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। মাধুর্য্যরস-নিমগ্ন ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ক্রোধ ও কারুণ্য, ভয় ও অভয়, কোমল ও রুদ্র প্রভৃতি বিপরীতভাব সকল জাগিয়া উঠিয়া পরস্পরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া দেয়। এই কারণে মাধুর্য্য এত জটিলতা প্রাপ্ত হয়। আর এইজন্যই মাধুর্য্যের রূপ বা মূর্ত্তিও এক-দিকে যেমন নিরতিশয় মনোহর, অন্য দিকে সেইরূপ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে।

রসের যাবতীয় রূপই জীবদেহে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু দাস্য-সখ্যাদি স্থায়ী রসের মধ্যে মাধুর্য্য রস যেমন করিয়া মানুষের দেহকে অধিকার ও অভিভূত করে, এমন আর কোনও রসে করিতে পারে না। অন্যদিকে অপর কোনও রসে মানুষের শরীরকে অধি-কার ও অভিভূত করিয়াই, আবার পরে পলে তাহাকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য এতটা প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামও উপস্থিত করে না। এ রস মানুষের এই দেহে, তার ইন্দ্রিয়গ্রামকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়, সত্য; কিন্তু আবার এই দেহের দেহত্ব অর্থাৎ তার জড়ত্বকে এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব অর্থাৎ তাহাদের আপনার বিশিষ্ট বিষয় ভোগ করিবার যে প্রবল লোভ আছে, সেই লোভকে নষ্ট না করিয়া, এ রস কিছুতেই আপনার চরম চরিতার্থতাও লাভ করিতে পারে না। এই রস সত্যসত্যই "দগ্ধেন্ধন-মিবানলম্"—দগ্ধদারুনিঃসৃত অনলের ন্যায়। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়াই প্রাচীনকালে অনল জ্বালাইতে হইত। কিন্তু যে কাষ্ঠ-[illegible] এই অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হইত, সেই অগ্নি আপনার প্রথম আশ্রয় সেই কাষ্ঠফলককে বা অরণীকে নিঃশেষ দগ্ধ করিয়াই ক্রমে আপনার পূর্ণতম ও উজ্জ্বলতম রূপ এবং স্বরূপকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিত। মাধুর্য্যরসেরও এই ধর্ম্ম। মাধুর্য্যও মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া, তার ইন্দ্রিয়-গ্রামের মন্থন হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ক্রমে সেই দেহের জড়ধর্ম্মের ও তার ইন্দ্রিয়কুলের স্বাভাবিক বিষয়লিপ্সার একান্ত নিরসন না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাতে এই অপূর্ব্ব রসের স্বকীয় রূপ ও স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

রসমাত্রেই প্রবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তির পথই রসের পথ। নিবৃত্তিমার্গে এ বস্তু মিলে না। আর মানুষের যাবতীয় প্রবৃত্তির মধ্যে কাম-প্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। জীব এ জগতে দুইটা প্রবৃত্তির তাড়নায় এত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। এক তার ক্ষুৎপ্রবৃত্তি, আর অপর—এই কামপ্রবৃত্তি। জীবের ক্ষুধার প্রেরণা অতিশয় বলবতী। তার কামের সন্ধুক্ষণ এই ক্ষুধার তাড়না অপেক্ষা কোনও অংশে দুর্ব্বল নহে। ফলতঃ মূলে একই প্রয়োজন হইতে জীবের ক্ষুৎপ্রবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তি,—এ দু'য়েরই উৎপত্তি হইয়াছে। জীবস্থিতিরক্ষাই সেই মূল প্রয়োজন। জীব আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে, এইজন্য ভগবান্ তাহাকে এই বল-বতী ক্ষুধা দিয়াছেন। সে আপনার বংশরক্ষা করিবে, এইজন্য তাহাকে এই দুর্দ্দান্ত কাম-প্রবৃত্তি দিয়াছেন। জীবস্থিতিভঙ্গনিবারণই জীবের ক্ষুধার তাড়না ও কামের সন্ধুক্ষণের মূল প্রয়োজন। দুইটাই জীবের আদিপ্রবৃত্তি। কিন্তু ক্ষুধাটা কদাপি সর্ব্বগ্রাসী হয় না।

ক্ষুধাটা একান্তই একটা শারীর ক্রিয়া। অন্নময় কোষেই তার উৎপত্তি, অন্নময় কোষেই তার বিলয়। ক্ষুধা আপনি জীবকে কোনও আনন্দ দান করে না। ক্ষুধার তৃপ্তিতে একটু আরাম ও আনন্দ লাভ হয় বটে কিন্তু অতৃপ্ত ক্ষুধায় কেবল যন্ত্রণাই আছে, কোনও আনন্দ নাই। এই বিষয়ে কামের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কামের সঞ্চারেই আনন্দ জাগিয়া উঠে। ক্ষুধার বৃদ্ধির সঙ্গে জীবের বেদনাই কেবল বাড়িয়া যায়; সে যাতনার ভিতরে কোনও সুখ, কোনও উল্লাস, কোনও আনন্দ কখনও থাকে না। কিন্তু কাম যত বাড়ে, তার পিপাসা যত প্রবল হয়, সে পিপাসার যাতনা যত গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে, ততই সে ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গেই, আবার অপূর্ব্ব উৎসাহ, অনুপম উল্লাস এবং পরমানন্দও জাগিয়া উঠে। এ অদ্ভুত প্রবৃত্তিতে বিধাতা বিষামৃত একত্র করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। এই কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে মাধুর্য্য রসের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এইজন্যই "কামগায়ত্রী" মাধুর্য্য সাধনের বীজমন্ত্র। কিন্তু পঙ্ক আর পঙ্কজ যেমন এক বস্তু নয়, সেইরূপ কাম আর মাধুর্য্যও ঠিক একই বস্তু নহে। দু'য়েতে স্বর্গনরক প্রভেদ রহিয়াছে। হীন ও হেয় পঙ্কেই যেমন পঙ্কজের জন্ম হয়, সেইরূপ লোকে সচরাচর যাহাকে হীন ও হেয় কামপ্রবৃত্তি বলে, তাহা হইতে মাধুর্য্যেরও উৎপত্তি হয়। কয়লা হইতে হীরক জন্মে, তাই বলিয়া কয়লা আর হীরক এক হয় না। সেইরূপ কাম হইতে জন্মে বলিয়া, কাম আর প্রেমও এক হয় না। ফলতঃ সচরাচর, বিশেষতঃ আজিকালিকার কাম-প্রধান সভ্যতা ও সাধনা কামকে যেরূপ হীন এবং হেয় মনে করে, তাহাও ঠিক সঙ্গত নহে। প্রজননই কামের কর্ম্ম। এইজন্য কামের অভিমানী দেবতা কন্দর্পও শ্রীভগবানেরই বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"—প্রজননের জন্য আমিই কন্দর্প। সৃষ্টিলীলায় এই কন্দর্প বা কামই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ সহায়। এই কামদেবতা বা কন্দর্পই বিশ্বের বিশাল প্রাণস্রোতকে পুষ্ট করিয়া, জীবস্থিতি রক্ষা করিতেছেন। ভগবদ্বিভূতি বলিয়া কন্দর্পও নমস্য। কামও হীন বা হেয় নহে। প্রজনন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে, ইউজেনিক্‌সের (Eugenics) প্রতিষ্ঠার কল্পে, আধুনিক সভ্যতা এবং সাধনাতেও কামের মর্য্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রজননসম্পর্কবিহীন হইয়া, কাম যখন কেবলমাত্র ভোগপরম হইয়া উঠে, তখনই তাহা হেয় ও হীন হইয়া পড়ে। জীবস্থিতি-রক্ষার জন্য যে প্রবৃত্তির সৃষ্টি, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া, তখন সেই প্রবৃত্তিই জীবস্থিতিভঙ্গের সহায় হইয়া উঠে। আর ভোগপরম লোকে পবিত্র কামপ্রবৃত্তিকে তার স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া তার বর্ত্তমান অধোগতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনেরা প্রজননের জন্যই কামের সেবা করিতেন। তাঁহাদের কাম ভোগপরম ছিল না। ইজন্যই সেকালে লোকে কামের নাম করিতে একটুও সঙ্কুচিত হইতেন না। তাঁরা "কামায় কামপতয়ে"—বলিয়া সর্ব্বলোক-সমক্ষে, নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। আর কামের মর্য্যাদা তাঁরা জানিতেন বলিয়াই, সকল রসের শ্রেষ্ঠ

সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক-সম্পদ-সম্পন্ন যে মাধুর্য্য-রস, তাহাকেও শৃঙ্গার বা আদিরসের সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

ফলতঃ শৃঙ্গার আর মাধুর্য্য একই বস্তু। সাহিত্যে যাহাকে শৃঙ্গার-রস বা আদিরস বলে, রসতত্ত্বে তাহাকেই মাধুর্য্য বলিয়াছেন। সাহিত্যের রস আর ভক্তির রস একাঙ্গ বিভিন্ন জাতীয় বস্তু নহে। ভক্তির সঙ্গে রসতত্ত্বের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভক্তি শ্রীভগবানকে নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তিরূপেই ভজনা করে। আর শ্রীভগবানেতে যে সকল রস নিত্য ফুটিয়া থাকিয়া, তাঁর এই নিখিল রসামৃতমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই সকল রসই সাহিত্যেরও উপজীব্য। মানবের যাবতীয় রস-পিপাসা ও রসসৃষ্টি সেই ভগবল্লীলারসকে আশ্রয় করিয়া, তারই উদ্দেশে অবিরাম ছুটিতেছে। সত্য বটে যে শ্রীভগবানের রসমূর্ত্তি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত; আর সাহিত্যের সাধারণ রসস্ফূর্ত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং প্রাকৃত। কিন্তু প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত গুণবাচক শব্দমাত্র, বস্তুবাচক শব্দ নহে। ইহারা বস্তুর গুণমাত্রই প্রকাশ করে, সে বস্তুর বস্তুত্বকে নির্দ্দেশ করে না। ইহাতে বস্তুর গুণেরই বৈষম্য বুঝায়; কিন্তু কোনও মৌলিক পার্থক্য বুঝায় না। রস-বস্তু এক, দুই বা বহু নহে। যাহাকে প্রাকৃত বলি, তাহাও সেই রস, যাহাকে অপ্রাকৃত বলি তাহাও সেই একই রস। আকারের বৈষম্য, প্রকাশের ইতর-বিশেষ, গুণের তারতম্য আছে, কিন্তু বস্তু এক। কেবলমাত্র গুণভেদে প্রাকৃতাপ্রাকৃতের বিভিন্নতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত রস রাজসিক বা তামসিক, তাহা মলিন। প্রাকৃত দেহের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দিগকে আশ্রয় করিয়া, প্রাকৃত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও প্রেরণায় যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা প্রাকৃত রস বলিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রাকৃত রসই যখন আবার নির্ম্মল হইয়া সাত্ত্বিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই অপ্রাকৃত পদবাচ্য হইয়া থাকে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রামাবতী

(৪)

পাল-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেও আত্মরক্ষার জন্য বিপুল উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। রামাবতী-নির্ম্মাণ তাহার প্রমাণ-রূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। রামাবতী নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে রাজধানী কোন্ স্থানে বর্ত্তমান ছিল, তাহার পরিচয় অদ্যাপি উদ্-ঘাটিত হয় নাই। সে রাজধানী পরিত্যক্ত ও নূতন স্থানে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল কেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয় উদ্-ঘাটিত হইয়াছে।

রামাবতী-নির্ম্মাতা রামপালদেবের পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল ইতিহাস-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার একখানি তাম্রশাসন বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার আমগাছী গ্রামে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এক কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইবার পর, তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত কোলব্রুক্‌ তাহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণমাত্র প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হবনালি একবার সম্পূর্ণ পাঠের উদ্ধার-চেষ্টায় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পদ্যাংশের সম্পূর্ণ পাঠ অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। গদ্যাংশের পাঠ এখনও বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এই তাম্রশাসনে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহার দীর্ঘকাল পরে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক পরিচয় বিজ্ঞাপক প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, মদনপালদেবের মনহলী গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, এবং গৌড়কবি সন্ধ্যা কর নন্দি-বিরচিত রামচরিতম্‌ কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ উল্লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব প্রথম মহীপালদেবের পৌত্র এবং নয়পালদেবের পুত্র। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পরিচয় সকল তাম্রশাসনেই একরূপ,—তাহাতে কোনরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই। তাঁহার নিজের তাম্রশাসনে এবং তাঁহার পৌত্র মদনপালদেবের তাম্রশাসনে আছে,—তিনি "শত্রুকুল-কালরুদ্র" ছিলেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে আছে—তিনি "সর্ব্বাকারর্দ্ধি-সংসিদ্ধ" ছিলেন। এরূপ সাধারণ ভাবের পরিচয়ে ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

রামচরিতম্‌ কাব্য এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া, একটি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। তাহার সহিত তাম্রশাসনোক্ত প্রশংসা বাক্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সত্য সত্যই "শত্রুকুল" ছিল। তাঁহার শত্রু প্রবলপরাক্রমশালী ছিলেন। অবশেষে সেই শত্রু তৃতীয় বিগ্রহপালের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া, "কপাল-সন্ধি" সংস্থাপিত করিয়া, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কর্ণ,—তিনি ডাহলাধিপতি ছিলেন। রামচরিতম্-কাব্যের (১।৯) শ্লোকটি এই,—

সহসা-বিতরণ-জিতকর্ণঃ ক্ষৌণীং
যৌবনশ্রিয়োদুহে।
অশ্রান্ত-দানবারাতি-শয়ো যোহভূদ্ বৃষাঙ্কচরঃ॥

এক অর্থে এই শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের জনক দশরথের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; অন্য অর্থে এই শ্লোকেই আবার রামপালদেবের জনক তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দশরথ পক্ষে যে ভাবে পাঠ করিতে হইবে, শ্লোকটি সেইভাবে উপরে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল-পক্ষে যে ভাবে পাঠ করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

সহসাবিত-রণজিত কর্ণঃ ক্ষৌণীং

যৌবনশ্রিয়োদহে।

অশ্রান্ত-দানবারা-তিশয়ো যাঽভূদ্ বৃষানুচরঃ॥

রামচরিতম্ কাব্যের টীকায় উভয়পক্ষের অর্থ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং তৃতীয় বিগ্রহ-পাল-পক্ষের অর্থোদ্ঘাটন-সময়ে টীকাকার বলিয়া দিয়াছেন,—দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়া, তৃতীয় বিগ্রহ-পালদেব রণপরাজিত কর্ণকে উন্মূলিত না করিয়া, তাঁহাকে "রক্ষিত" করিয়াছিলেন। মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য টীকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

[দশরথ পক্ষে]

"সহসেত্যাদি। যো দশরথো যৌবনশ্রিয়া তরুণিমসংপত্ত্যা সহ ক্ষৌণী মুদূহে। সহসা বিতরণেন অবলম্বিত দানেন জিতঃ কর্ণঃ কানীনো যেন। অশ্রান্ত অপ্রাপ্তশ্রমো দান-বারাতীনাং দেবানাং শয়ঃ করো যস্মাৎ। অতএব হি অসুর-পরাজয়-সিদ্ধেঃ বিবুধৈঃ করেণ প্রহরণ-গ্রহণ শ্রমোঽপি নাসাদিতঃ। তথাহি বৃষানুচরঃ শচীসহচরানুচরোঽভূৎ।"

[বিগ্রহপাল-পক্ষে]

"অন্যত্র। যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণস্য রাজ্ঞঃ সুতয়া সহ ক্ষৌণীমুদূঢ়বান্। সহসা বলেন অবিতো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণো দাহলাধিপতি র্যেন। রণজিত এব পরন্তু রক্ষিতো, ন উন্মূলিতঃ। [illegible]। দানবারো দান-সমুচ্চয়ো [illegible] তস্য অতিশয়ঃ প্রাচুর্য্যং স চ অশ্রান্তোঽবিচ্ছিন্নো যস্য অতএব বৃষানুচরো ধর্ম্মানুগতঃ"

টীকাকার এইরূপে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার সন্ধান প্রদান না করিলে, মূল শ্লোক হইতে সম্যক্ অর্থ সহসা প্রতিভাত হইত না। শ্লেষের অনুরোধে কবি ইচ্ছামত শব্দ চয়ন করিতে পারেন নাই,—যেরূপ শব্দ চয়ন করিলে, উভয়পক্ষের অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে, সেইরূপ শব্দ চয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সকল শ্লিষ্ট কাব্যের অবস্থাই এইরূপ। তজ্জন্য সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নিকট যে অর্থ অনায়াসলভ্য থাকে উত্তর কালে টীকার অভাবে তাহা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। রামচরিতম্-কাব্যের যে অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই, সেই অংশের শ্লোকাবলীর অর্থবোধে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। কর্ণপরাজয় কাহিনী রামচরিতের ভূমিকায় এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—

"Within a short time of the accession of Vigrahapala, he came in conflict with Karna, who was very severely beaten. His kingdom lay at the mercy of Vigrahapala. But Vigrahapala spared both the king and his kingdom. Karna entered into a treaty with him, acknowledging his supremacy; and Karna's daughter Yauvanasri was married to Vigrahapala."

এই বিবাহোৎসব বিজয়োৎসব [illegible] কাব্যের

উপাদানরূপে গৃহীত হইলে, ইহা একখানি সরস কাব্যের আখ্যানবস্তুকে বাস্তবিক করিতে পারে। বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই আখ্যানবস্তু এখনও সেরূপ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। বেলাবো লিপি আবিষ্কৃত হইবার পর আরও একটু অধিক সমাচার প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—কর্ণের বীরশ্রীনাম্নী কন্যার সহিত বঙ্গপুরাধিপতি জাতবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপে দাহলাধিপতি সকল বঙ্গভূমির সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকালে আর কোনও ঘটনা সংঘটিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব কতকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। তাঁহার আমগাছী-লিপিতে তদীয় বিজয়রাজ্যের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত থাকায়, কেহ কেহ তাঁহার শাসনকালকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র মনে করিয়া কালগণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনুকূল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, বরং কিছু কিঞ্চিৎ প্রতিকূল প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় মহীপাল, মধ্যম শূরপাল ও কনিষ্ঠ রামপাল। রামপাল-পুত্র মদনপালদেবের মনহালি লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—রামপাল তাঁহার জনকের দীর্ঘ শাসন-সময়ে” শৈশব হইতেই বাহুবিক্রমের পরিচয় প্রদানে শত্রুরাজ্যকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের এই পুত্রত্রয় যৌবন-শ্রীর গর্ভে উৎপন্ন ছিলেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং প্রসঙ্গাধীন বর্ণনায় মনে হইতে পারে,—তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সহিত দাহলাধিপতি কর্ণের সংগ্রাম-সংঘর্ষ-সময়ে রামপাল কনিষ্ঠ পুত্ররূপে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তৃতীয় বিগ্রহপালদেব যে চিরং দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন এই স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে, তাঁহার শাসনকালকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র বলিয়া কালগণনা না করাই যুক্তিসঙ্গত।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকাল গৌরবমণ্ডিত বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাঁহার বাহুবল অল্প ছিল না। তাঁহার বাহুবলে দাহলাধিপতিও পরাভূত হইয়া কন্যাদানে সন্ধি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনসময়েই অন্য একটি অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপ্লবের বীজ ধীরে ধীরে লোকলোচনের অগোচরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল। সে বিপ্লব এখন ইতিহাসে “কৈবর্ত্ত-বিপ্লব” নামে কথিত হইতেছে। তাহার কথাই রামচরিতম্-কাব্যের প্রধান কথা,—তাহার কথাই রামাবতী নির্ম্মাণের প্রধান কথা। সুতরাং তাহার আলোচনা অপরিহার্য্য। (ক্রমশ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নারী

পূর্ণ-প্রস্ফুটিত শ্বেত-শতদল সম
মাধুরী বিকাশি'
প্রথম যে দিন, নারি, মানবের গৃহে
দেখা দিলে আসি'—
নিশীথ-সমুদ্র পারে—সহসা যেমন
রবির উদয়—
সে দিন জাগিল বিশ্বে কি মহাপুলক
অসীম বিস্ময়।

অনন্ত-বিস্তৃত এই গ্রন্থে গ্রথিত
নিখিল ভুবনে
কে জানিত এত শোভা—রহস্য অপার—
আছিল গোপনে।
হে নারি, তোমার দিব্য জীবন মাঝে
লভিয়া উপমা—
সে দিন সার্থক হ'ল কল্পনার নব
বিচিত্র সুষমা।

উষার অরুণ রাগ বিম্বিত—তোমার
তরুণ অধরে
নিবিড় কাদম্ব মেঘ তরঙ্গিত হেন
কৃষ্ণ কেশস্তরে।
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ আকাশের নীলিমা তোমার
প্রশান্ত নয়নে,
মুগ্ধ পূর্ণিমার শশী হেরে প্রতিরূপ
তোমার আননে।
সেই হ'তে, নারি, তোমা' কত ছন্দে গীতে
বন্দিয়াছে কবি,
কল্পনার শত বর্ণে চিত্রকর তব
আঁকিয়াছে ছবি।
শিল্পীর সাধনা নিত্য গড়িতে তোমার
অনিন্দ্য প্রতিমা,
কবিতা সঙ্গীত শিল্পে বিভাসিত, নারি,
তোমার মহিমা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা

উজানি—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। রাঢের ক্ষুদ্র পল্লী উজানিতে বসিয়া কবি পল্লীজীবনের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের রেখা-চিত্র আঁকিয়াছেন। সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে কবির উৎসর্গ-পত্র হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। —"মা, মহাকবি কবিকঙ্কণ তোমার উজানির গুণগৌরবগাথা, তোমার খুল্লনা, ধনপতি, শ্রীমন্তের অপূর্ব্ব কাহিনী—অমর সঙ্গীত তোমায় শুনাইয়াছেন। আজ তোমার ক্ষুদ্র কবি তোমার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথা তোমায় শুনাইবে।" আমাদের মনে হয়, কবির এই উৎসর্গ-পত্রই সমস্ত গ্রন্থখানির key-note. বাস্তবিক, বাংলার এই ছায়াশীতল, শান্তি-সৌন্দর্য্যপূর্ণ গ্রামের ও গ্রামবাসীর যে চিত্র কবি আমাদের আজ শুনাইয়াছেন, তাহা আধুনিক কৃত্রিমতাপূর্ণ কবিতার দিনে একান্ত দুর্লভ। পল্লীগ্রামবাসী আমরা, এ কবিতাগুলি

পড়িতে পড়িতে, মনে হয় যাহা হারাইয়াছি—তাহা আবার যেন ফিরিয়া পাই—আবার সেই গ্রামের স্নেহময়ী পল্লী মাতার মুখখানি যেন আমাদের চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্রের পরে—আমাদের খাঁটি বাংলার নিখুঁত চিত্র বঙ্গভাষায় আর কেহ আঁকিয়াছেন কি না, জানি না। আজ 'উজানি'র কবি—সেই বাংলার রেখা-চিত্র লইয়া উপস্থিত—ইহাতে বংশের বাহুল্য, বৃহৎ উদ্দেশ্যের জটিলতা নাই বটে, কিন্তু তিনি যে সামান্য রেখাপাতে খাঁটি বাংলার এবং খাঁটি বাঙ্গালীর প্রতিদিনের সুখ দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন—যাহা আমাদের হৃদয়ে এমন একটা স্থান স্পর্শ করিয়াছে, যাহা বহুদিনের হারান পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রিয়জনের জন্য গোপনে রক্ষিত ছিল। 'উজান' পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইতেছিল—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বম্
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

দধীচি (নাটক)—শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি, এস্ সি প্রণীত। মূল্য (কাগজের মলাট) ১৲ টাকা। দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণের কল্যাণার্থ মহর্ষি দধীচির আত্মদানের ঘটনা লইয়া এই নাটক রচিত। গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন—"ভক্তি ভিন্ন দেবজয় সম্ভব নয়; ভক্তি-বলে ভক্ত ভগবান্‌কেও ভয় করে না। বৃত্র যে কেবল পশুবলেই স্বর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না, তাই ধর্ম্মের, ভক্তির ভিত্তির উপরে বৃত্র-চরিত্র স্থাপন করিয়াছি।" গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয়—অধর্ম্মাশ্রিত অহঙ্কৃত দেবগণের পতন ও দুর্দ্দশা এবং ধর্ম্মাশ্রয়ে পুনরায় তাঁহাদের উত্থান; বৃত্র 'মাত্র উপলক্ষ বিশ্বের বিধানে।' দেবাসুর-যুদ্ধের নামে যে বিভীষিকার চিত্র, ভীমকান্তি কঠোর দানবরাজের যে ছবি, স্বতঃই আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে—এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। তাণ্ডবলীলারত রুদ্রের পশ্চাতে শিবের শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, বজ্রপাতভ গুরুগম্ভীর বরষার বর্ষণের পর ধরিত্রীর শান্তশ্রী—সে ছবি তেমন ভাল ফুটে নাই। তেজোহীন নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত বৃত্র যেন অনাসক্ত মুমুক্ষু যোগীর ন্যায়। কোথাও তাহার চরিত্রের একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। বৃত্র ভক্ত বটে, কিন্তু ভক্তির তেজ তাহাতে নাই, তেজের গৌরবও নাই। বৃত্র-চরিত্রে সামান্য মানবের মত এতটা পরাধীনতার ভাব—এতটা আত্মশক্তির অভাব আমরা দেখিতে চাই না। আত্মশক্তির বিকাশের সহিত যে ধর্ম্মের ও ভক্তির সমন্বয়, তাহাই যথার্থ স্পৃহণীয়। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে নিষ্ক্রিয়তা—অনাসক্তির কথা অনেক শুনিয়াছি,—সকল চরিত্রকেই এক তুলিকায় আঁকিলে চলিবে না। নাটকটি মূলতঃ ভক্তিমূলক। নন্দী, দধীচি, বৃত্র, জয়া, শান্তি—সবই এক ছাঁচে ঢালা;—ইন্দ্রের চরিত্র চলিত কিংবদন্তীর (tradition) অনুরূপই হইয়াছে। তবে, ভক্তি-মূলক নাটক হিসাবে ইহা ভাল হইয়াছে। ইহাতে ভাব আছে, ভাষা হৃদয়গ্রাহী, লিখনভঙ্গীও ভাল, ছাপা কাগজও পরিষ্কার।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী, মেট্‌কাফ প্রেস, ৭৬ নং, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন।

নিমাই-চরিত্র

একবিংশ অধ্যায়

রামানন্দ রায় মিলন

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং ফাল্গুন মাসে পুরুষোত্তমে উপনীত হন। ফাল্গুন ও চৈত্র গত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে গৌর বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া কহিলেন "অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে আমি দক্ষিণে যাইব মনস্থ করিয়াছি। তোমাদের অনুমতি হইলে আমি একাকী গমন করিতে চাই। যতদিন আমি নীলাচলে প্রত্যাগত না হই, ততদিন তোমরা এখানে আমার প্রতীক্ষা করিও।" প্রত্যাসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভক্তগণ বিষণ্ণ হইলেন। নিত্যানন্দ কহিলেন "একাকী যাওয়া ভাল নহে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" গৌর উত্তর করিলেন 'তুমি ত অনবরত আমাকে নাচাইতেছ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম, তুমি আমাকে ভুলাইয়া লইয়া গেলে অদ্বৈতের বাড়ী। নীলাচলে আসিবার পথে তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। তোমাদিগের স্নেহে আমার কর্ত্তব্য-হানি ঘটিতেছে। জগদানন্দ ত আমাকে বিষয় ভোগ না করাইয়া ছাড়িবে না। যদি কখনও তাহার বাক্যের [illegible] করি, তিন দিন সে আমার সহিত [illegible] করে না। আমার সন্ন্যাসদুঃখ মুকুন্দের অসহ্য। দামোদর অনবরত আমার উপর শিক্ষাদণ্ড উদ্যত করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার লোকাপেক্ষা নাই, কিন্তু আমি ত লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারি না। আমার জন্য তোমাদিগকে দুঃখিত দেখিলে, তোমাদের দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া আমাকে পীড়া দেয়। তাই আমার ইচ্ছা, কিছুদিন একাকী ভ্রমণ করিয়া আসি।" অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল, কৃষ্ণদাস নামক এক সরলমতি ব্রাহ্মণ জলপাত্র ও বহির্বাস বহিবার জন্য সঙ্গে যাইবে। চারি দিন পরে গৌর বিদায়গ্রহণ করিলেন। যাত্রাকালে সার্ব্বভৌম কহিলেন "গোদাবরী-তটে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দ নামক এক ভক্ত আছেন। শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে এতদিন আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। তোমার কৃপায় তাঁহার মহত্ত্ব এখন বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি তোমার সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার সহিত অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করিও।" অঙ্গীকার করিয়া গৌর যাত্রা করিলেন। রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভক্তগণ আলালনাথ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। আলালনাথে দেববিগ্রহের সম্মুখে বহু নৃত্যগীত হইল। দলে দলে লোক গৌরকে দেখিতে আসিয়া ভক্তি লাভ করিল।

আলালনাথ হইতে 'হরি' 'হরি' বলিয়া গৌর যাত্রা করিলেন। মুখে কেবল—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাং॥

তিনি যে গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিলেন, তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়া ও প্রেম-সঙ্গীত শুনিয়া তথাকার যাবতীয় লোক হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এ সমস্ত লোক কর্ত্তৃক হরিনাম গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তন ধ্বনি উত্থিত হইল। কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া গৌর কূর্ম্মমূর্ত্তির সম্মুখে প্রেমবিহ্বল অবস্থায় নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দলে দলে লোক দেবালয়ে সমাগত হইল। কূর্ম্মনামক এক ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং সপরিবারে তাঁহার পাদোদক পান করত পরম যত্নে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। গৌর তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার কিয়ৎকাল পরেই বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ তথায় তাঁহার দর্শনোদ্দেশে সমাগত হইল। গৌর প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া, ব্রাহ্মণ নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ গৌর তথায় প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন তাঁহার স্পর্শে সেই গলিতকুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। নিরাময় ব্রাহ্মণ আনন্দভরে গৌরগুণ গান করিতে লাগিল।

বাসুদেবকে অনুগ্রহ করিয়া গৌর গোদাবরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গোদাবরী-দর্শনে গৌরের যমুনার কথা মনে হইল, তত্তীরস্থ বনানি দর্শনে বৃন্দাবন স্মৃতিপথে উদিত হইল। গৌর গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তাহার তটে উপবেশন করত হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে বিবিধ আড়ম্বরের সহিত চতুর্দ্দোলারূঢ় রামানন্দ রায় স্নানার্থ নিকটস্থ ঘাটে উপস্থিত হইলেন, সন্ন্যাসী দর্শনে রামানন্দ সসম্ভ্রমে আসিয়া প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া গৌর কহিলেন 'তুমিই কি রায় রামানন্দ ?''

রামানন্দ উত্তর করিলেন "হাঁ, আমিই সেই শূদ্রবংশোদ্ভব দাস।" উভয়ের দর্শনে উভয়ের শরীরে স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য, প্রভৃতি সাত্বিক লক্ষণসমূহ আবির্ভূত হইল। উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেন। আত্মসংবরণপূর্ব্বক গৌর কহিলেন "সার্ব্বভৌমের নিকট আমি তোমার গুণাবলি সমস্তই শ্রুত হইয়াছি, আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।" রামানন্দ কহিলেন "আমার সহচর সহস্র ব্রাহ্মণ তোমার দর্শন মাত্রেই—'কৃষ্ণ' নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে, অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে কি এতাদৃশ ক্ষমতা সম্ভবপর ?" গৌর কহিলেন "পরম ভাগবত তুমি, তোমার দর্শনেই তোমার ব্রাহ্মণগণের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। আমার মত মায়াবাদী সন্ন্যাসীও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসমান হইয়াছে।" এমন সময়ে রামানন্দ-সঙ্গী ব্রাহ্মণগণ গৌরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিয়া গৌর রামানন্দকে কহিলেন "আবার যেন দর্শন পাই।" রামানন্দ কয়েকদিন তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রণামান্তর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দের জন্য গৌর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, এমন সময়ে রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দুইজনে তত্ত্বালাপ আরম্ভ হইল। গৌর কহিলেন "সাধ্য কি, তাহা নির্ণয় কর।"

রামানন্দ—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

বিষ্ণুপুরাণ—৩।৮।৮

পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হন বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন তাঁহার প্রীতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

গৌর—ইহা বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা—৯।২৭

হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

গৌর—ইহা বাহিরের কথা; ইহার পরে কি বল।

রামা—

অজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভাগবত—১১।১১।৩২

মৎকর্তৃক যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক তৎসমস্ত পরিত্যাগ করত যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

গীতা—১৮।৬৭

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।

গৌর—এ ত বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

গীতা।১৮।৫৪।

"যিনি (জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তিনি কিছুতেই শোক করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত হইয়া, আমার প্রতি পরম ভক্তি লাভ করেন।" জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার।

গৌর—ইহাও বাহিরে কথা; ইহার পরের কথা বল।

রামা—জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সাধ্যসার।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমস্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১৩

জ্ঞানলাভে প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তোমাকেই কেবল প্রণাম করেন, এবং সাধুমুখনিঃসৃত ভবদীয় কথা শ্রবণ করত কায়মনোবাক্যে সৎপথস্থ হইয়া জীবন ধারণ করেন, তুমি ত্রিভুবনদুষ্প্রাপ্য হইলেও তাঁহাদিগের নিকট সুখলভ্য।

গৌর—ইহাও বাহ্য; ইহার পরে কি বল।

রামা—প্রেমভক্তিই সর্ব্বধর্ম্মের সার।

গৌর—ইহাও হয়; কিন্তু ইহার পরে কি বল।

রামা—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৫।১১

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল হয়, তাঁহার দাসগণের আবার কি পাপ্য অবশিষ্ট থাকে?

গৌর—ইহাও হয়, কিন্তু ইহারও পরে কি আছে বল।

রামা সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১২।১১

যিনি এইরূপ ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে সাধুগণের নিকট, পরদেবতারূপে দাস্য-রসের ভক্তগণের নিকট এবং নরশিশুরূপে মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশিত হন, সেই ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত কৃতপুণ্য ব্রজ-রাখালগণ বিহার করিয়াছিলেন।

গৌর—উত্তম, কিন্তু ইহার পরে কি বল।

রামা—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

নেমং বিরিঞ্চির্ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।

ভাগবত—৯ ১৫

গোপী যশোদা মুক্তিদাতা শ্রীহরির নিকট যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মা, মহাদেব ও তাঁহার বক্ষস্থিতা লক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

গৌর—ইহাও উত্তম, ইহার পর কি আছে বল।

রামা—কান্তভাব সর্ব্বসাধ্যসার।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ বাহুদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-ব্রজসুন্দরীগণের যে প্রসাদ সমুদিত হইয়াছিল, অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিতান্তানুরাগিণী লক্ষ্মী ও নলিনগন্ধবতী স্বর্গকামিনীগণেরও তাহা প্রাপ্য হয় নাই।

কৃষ্ণ প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে; তাহার তারতম্যও আছে। কিন্তু যাহার যে ভাব, তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে তারতম্য বোধ করা যায়।

শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রস পাঁচটী। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে, বায়ুর গুণ তেজে, তেজের গুণ জলে ও জলের গুণ ক্ষিতিতে আছে তেমনি পঞ্চরসের প্রত্যেকের গুণ তাহার পরবর্ত্তী রসের মধ্যে নিহিত আছে। শান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য সকলের গুণই মধুর রসে আছে। এই মধুর রসেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

ভাগবত—১০।৩২।২২

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—সুন্দরীগণ, তোমাদিগের সহিত আমার প্রেমসংযোগ নিরবদ্য ; বহু ব্রহ্মপাত কাল জীবন ধারণ করিয়াও তোমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব না। কেননা, তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। তোমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সমর্থ নহি। অতএব নিজ নিজ সাধু ব্যবহার দ্বারাই তোমাদিগের কৃত সাধু ব্যবহারের বিনিময় হইল।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—যাহাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। মধুর ভাবে যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে ভজনা করিতে সক্ষম হয়েন না বলিয়া সেই ভক্তগণের নিকট ঋণী থাকেন।

গৌর—সাধ্যের ইহাই সীমা বটে, তবে ইহারও পরে যাহা আছে কৃপা করিয়া বল।

রামা—ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক আছে তাহা জানিতাম না। মধুর রসের মধ্যে রাধার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

অনয়ারা ধতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।

ভাগবত—১০।৩০।২৪

রাধিকা নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন ; যেহেতু কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে ইঁহাকেই বিজন প্রদেশে লইয়া গেলেন।

পদ্মপুরাণে আছে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ। গোপীগণের মধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

গৌর—তোমার মুখে অমৃতনদী বহিতেছে। আচ্ছা, অন্যের অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রস্ফুরিত হয় না। গোপীগণের ভয়ে কৃষ্ণ রাধিকাকে চুরী করিয়াছিলেন। যদি রাধিকার জন্য গোপীগণকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেই রাধিকার জন্য তাঁহার গাঢ় অনুরাগ প্রকাশিত হইত।

রামানন্দ—কৃষ্ণ গোপীগণের রাসনৃত্য ত্যাগ করিয়া রাধার অন্বেষণ করিতে করিতে বিলাপ করত বনে বনে ফিরিয়াছিলেন। শত কোটি গোপীসঙ্গে রাস-বিলাস কালে একমূর্ত্তি রাধাপার্শ্বে সদা-সর্ব্বদা বিরাজ করিয়াছিল। রাধা অভিমান ভরে রাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার অন্বেষণে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কোথাও তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শতকোটি গোপীতেও কৃষ্ণের কাম নির্ব্বাপিত হয় নাই,—এক রাধিকাতেই তাঁহার তৃপ্তি। ইহাতেই রাধিকার গুণ অনুমিত হইতে পারে।

গৌর—তোমার নিকট আমার আগমন সার্থক হইয়াছে। এখন কৃষ্ণ-রাধিকার স্বরূপ এবং রস ও প্রেমতত্ত্ব কিছু বল।

রাম—আমি ইহার কিছুই জানি না। তুমি যাহা বলাইতেছ—তাহাই বলিতেছি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।

কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনিই সকলের আদি, তিনি স্বয়ং অনাদি। কৃষ্ণই গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

প্রফুল্ল কমলানন, পীতাম্বর বনমালী মন্মথেরও মন মুগ্ধ করেন। নানাভাবাশ্রিত ভক্তগণের রসামৃতের তিনিই বিষয়স্বরূপ। তিনি শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তিধর, এবং অন্য যাবতীয় অবতারের মনোহারী। তিনি আপন মাধুর্য্যে আপনারই মন হরণ করেন এবং আপনাকে আপনি আলিঙ্গন করিতে চাহেন।

কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। এখন রাধাতত্ত্ব কিছু বর্ণনা করি। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান—চিৎশক্তি, মায়া-শক্তি ও জীবশক্তি। এই তিন শক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গা কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি এবং ইহাই সর্ব্বপ্রধান। কৃষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিও তদনুযায়ী ত্রিবিধ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। হ্লাদিনী শক্তি হেতু কৃষ্ণ সদা সুখসাগরে মগ্ন থাকেন। সুখস্বরূপ নিজ সুখ আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করান। হ্লাদিনী শক্তিই ভক্ত-গণের সুখের কারণ। হ্লাদিনীর সারভূত অংশের নাম প্রেম, অথবা আনন্দচিন্ময় রস। এই প্রেমের সারতম অংশ মহাভাব বলিয়া খ্যাত। এই মহাভাবে কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীমতী রাধিকা মহাভাবস্বরূপা এবং একমাত্র তিনিই কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তি করিতে সক্ষম।

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা, কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা। জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা।

কৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমি কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অনুপম-গুণবতী প্রেয়সী কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কেশে কুটিলতা, নেত্রে তরলতা, স্তনে নিষ্ঠুরতা, এক রাধিকারই আছে; একমাত্র রাধিকাই হরির বাসনা পূর্ত্তি করিতে সক্ষম, অন্য কেহ নহে।

নিরন্তর কামক্রীড় বলিয়া কৃষ্ণের নাম "ধীরললিত।" যে পুরুষ বিদগ্ধ (চতুর), নবতরুণ, পরিহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত ও প্রেয়সীবশ, তাহারই নাম ধীরললিত। কৈশোরে কৃষ্ণ রাত্রি-দিন রাধার সহিত কুঞ্জক্রীড়া করিয়া-ছিলেন।

গৌর—বেশ! আর কি আছে বল।

রামা—আর আমি জানি না। তবে আমার স্বীকৃত একটী গান শোন।

রামানন্দ গাহিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহু কেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥

গৌর—সাধ্যবস্তু কি তাহা বুঝিলাম। কিন্তু সাধন বিনা কেহ সাধ্য লাভ করিতে পারে না। এখন এই সাধ্যবস্তুর উপায়স্বরূপ সাধন-তত্ত্ব কিছু বল।

রামানন্দ—তুমি যাহা বলাইতেছ, তাহাই বলিতেছি ; শোন। সাধনের কথা অতি নিগূঢ়। সখী ভিন্ন কেহ রাধাকৃষ্ণ-লীলা বুঝিবার অধিকারী নহে। সখী হইতে এই লীলার বিস্তার। সখীভাবে ভিন্ন রাধাকৃষ্ণকুঞ্জ-সেবারূপ সাধ্যবস্তু কেহই পাইতে পারে না।

সখীর স্বভাব বর্ণনা করা কঠিন। কৃষ্ণের সহিত নিজে ক্রীড়া করিতে সখীর মন নাই। সখী চায় কৃষ্ণের সহিত রাধিকার লীলা সংঘটন করিতে। কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা রাধিকার স্বরূপ ; সখীগণ সেই কল্পলতার পল্লব, পুষ্প ও পত্র। কৃষ্ণলীলামৃতে লতা সিঞ্চিত হইলে, পল্লব, পুষ্প ও পত্র অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। এদিকে সখীগণ কৃষ্ণসঙ্গমসুখ কামনা না করিলেও, রাধিকা যত্ন করিয়া তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম সংঘটন করেন। সখীগণ স্বকায় ইন্দ্রিয়সুখ বাঞ্ছা করেন না—কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম। যে ভক্ত সেই গোপীভাবামৃতে অভিলাষী, বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। যে রাগানুগ মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজনা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রজলোকের যে ভাবে ভক্ত তাঁহাকে ভজনা করেন—তিনি তদনুরূপ গতি লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিধিমার্গে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ।

যশোদানন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ দেহিবৃন্দের সম্বন্ধে যেরূপ সুখলভ্য, আত্মভূত জ্ঞানিবৃন্দের পক্ষে তদ্রূপ নহেন। এই জন্যই ভক্ত গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া রাত্রি-দিন রাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করেন। গোপীভাব বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুর ভজন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হন নাই।

ইহা শুনিয়া গৌর প্রেমভরে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকথালাপে অতিবাহিত হইল। রামানন্দের অনুরোধে দশ দিন গৌর তথায় অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন কৃষ্ণকথা চলিতে লাগিল। একদিন গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "বিদ্যার মধ্যে সার কি ?"

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তি বিনা আর বিদ্যা নাই।

গৌর—জীবের কোন্ কীর্ত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত-খ্যাতি।

গৌর—কোন্ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণপ্রেম।

গৌর—দুঃখমধ্যে গুরুতর কি ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত-বিরহ।

গৌর—মুক্তমধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

রামানন্দ—যে কৃষ্ণপ্রেম সাধনা করে।

গৌর—গানমধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ গান ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যাহার মর্ম্ম।

গৌর—শ্রেয়োমধ্যে সারতম কি ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।

গৌর—অনুক্ষণ জীব কি স্মরণ করিবে ?

রামানন্দ—কৃষ্ণগুণ-লীলা।

গৌর—ধ্যেয়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণ-পাদাম্বুজ।

গৌর—সর্ব্বত্যাগ করিয়া কোথায় বাস করা জীবের উচিত ?

রামানন্দ—শ্রীবৃন্দাবনে।

গৌর—উপাস্তের মধ্যে প্রধান কে ?

রামানন্দ—যুগল-মূর্ত্তি।

গৌর—মুক্তি ও ভক্তিকামীর স্থিতি কোথায় ?

রামানন্দ—স্থাবর দেহ ও দেব-দেহ। অরসজ্ঞ জ্ঞানী কাকের মত জ্ঞানরূপ নিম্ব-ফল চোষণ করে। রসজ্ঞ ভক্ত কোকিল প্রেমরূপ আম্রমুকুল ভক্ষণ করে।

আর এক দিন রামানন্দ কহিলেন "কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, তুমি সমস্তই আমার চিত্তে প্রকাশিত করিয়াছ। বাহিরে উপদেশ না দিয়া তুমি ভিতর হইতে এই সমস্ত তত্ত্ব আমার অন্তঃকরণে প্রকাশিত করিয়াছ কিন্তু একটী আশ্চর্য্য জ্ঞান আমার বিদূরিত হইতেছে না। প্রথমে আমি তোমার সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এখন শ্যামবর্ণ গোপরূপে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তোমার সম্মুখে যেন এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিকা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার গৌর কান্তির আভায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। আর দেখিতেছি—তুমি বংশীবাদন শ্যামসুন্দর রূপে ভাবময় চঞ্চল দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ। ইহার কারণ আমাকে বল।

গৌর কহিলেন—"রাধাকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ তুমি এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান।"

রামানন্দ কহিলেন "আমাকে ছলনা করিতে পারিবে না। তোমার নিজরূপ আমাকে দেখাইতেই হইবে। স্বীয় রস আস্বাদনার্থ তুমি রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। আপনি আপনার প্রেম আস্বাদন করিতে করিতে তুমি আনুষঙ্গিক ভাবে ত্রিভুবন প্রেমময় করিয়াছ। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই এখানে তুমি আসিয়াছ,—তবে আবার কপটতা কেন ?"

তখন রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত মূর্ত্তি গৌর রামানন্দকে দেখাইলেন। রামানন্দ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দশ দিন অতিবাহিত হইল। খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে যেমন তামা, কাঁসা, রূপা, সোণা, রত্ন, চিন্তামণি,—উত্তরোত্তর উত্তমবস্তু লাভ হয়, তেমনি উভয়ের কথোপকথনে ক্রমেই অধিকতর মূল্যবান্ তত্ত্ব-কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অবশেষে গৌর বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ পরম দুঃখিত চিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বিদায় কালে গৌর কহিলেন "তুমি বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন কর। আমি সত্বরই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইব। তখন উভয়ে একত্র অবস্থান করিব।"

(ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুদ্ধ লতায় মঙ্গ

প্রথম বয়সে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি রাজাধিরাজ অশোকদেবের ব্যবহার বিশেষ উদার ছিল না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধবাদী সমাজবিপ্লবকারী ক্রমবর্দ্ধমান এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত তখনও জন-সাধারণ মধ্যে তত প্রচলিত হয় নাই, কিন্তু ভিক্ষুমণ্ডলীর বৈরাগ্য, অহিংসা, জীবে দয়া, নিরহঙ্কার, বিপদে নির্ব্বিকার সহিষ্ণুতা, সার্ব্বজনীন প্রীতি লোকসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। অনেকে এই নবীন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। রাষ্ট্রনীতি-কৌশল পরিচালিত রাজসভায় ব্রাহ্মণ, শ্রমণ উভয়েই প্রায় তুল্য সমাদর পাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত ছিদ্র পাইলে অশোকদেব এই নবীন সম্প্রদায়ের লোককে দণ্ডিত করিতে ত্রুটী করিতেন না।

রাজাধিরাজ অশোক অপরাহ্নে মৃগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভিক্ষু উপগুপ্ত সম্বন্ধে কি বিধান হয়, জানিবার জন্য নগরবাসিগণ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ রাত্রি প্রভাতেই ভিক্ষুর বিচার হইবে।

সেকালেও যে রাজরাজন্যবর্গ সান্ত্রী প্রহরী অথবা পার্শ্বরক্ষক দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকিতেন, তাহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। [illegible] উন্মেষসাধনের পর হইতে রাজরাজড়ার রাত্রিবাসগৃহও অনেক সময় অতি বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত থাকিত। কোন্ রাত্রিতে কোন্ রাজ্ঞীর গৃহে, অথবা কোথায় বল্লভ রাজার নিদ্রার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা সকলে জানিতে পারিত না। রাজা হয় ত পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন না করিয়া গৃহস্বামিনীর অভিমান ক্ষুণ্ণ করিতেন এবং অন্য গৃহে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া অতর্কিত অনুগ্রহে অপরাকে অতি সম্মানিত করিতেন। এইরূপ ক্ষুণ্ণ অভিমান অথবা অতর্কিত সম্মান যে রাজার অনুরাগ-বৈষম্যে সংঘটিত হইত, তাহা নহে। দেশকালপাত্র বিবেচনায় শত্রু-সমাকুল রাজরাজড়ার পক্ষে এইরূপ অজ্ঞাত গৃহবাস সেকালে নিতান্ত বিধেয় বলিয়াই পরিগণিত হইত।

পরিচারিকা লীলা সন্ধ্যার পর হাসিতে হাসিতে আসিয়া রাজ্ঞী কারুবকীকে জানাইল, রাজাধিরাজ দেবী অসন্ধিমিত্রার গৃহে রাত্রিযাপন করিবেন।

"তুই কেমন করিয়া জানিলি?"

"সৌবিক মহাশয় প্রতিহারীদিগকে বলিয়া দিয়াছেন; অন্তঃপুরে অনেকেই তাহা শুনিয়াছে।"

"তাহা শুনিয়া তোর আনন্দ কেন?"

"আমি মালিনীকে ফুল মালার জন্য সংবাদ

দিয়া আসিলাম। অগুরু, চন্দন, গন্ধচূর্ণ—আর সময় নাই।—সৌবিক মহাশয় আমাকেও কিছু বলিয়াছেন!"

"মর্ হতভাগী। শেষে লোক হাসাবি না কি?"

"আমরা হাসিব, অন্যের কান্না পায়, কাঁদিবে।"

রাজ্ঞী তখন স্মিতমুখে বলিলেন,—

"যাহা যাহা করিতে হয়, কর গিয়া, কাহাকেও কিছু বলস্ না।"

দেবী কারুবকী প্রমীতসেনকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছেন কিন্তু মৃগয়া হইতে ফিরিয়া রাজাধিরাজ যখন অবস্থা শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া দেবী চিন্তাযুক্ত ছিলেন; ভিক্ষু উপগুপ্তের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য রাজাধিরাজকে অনুরোধ করিবেন, মঞ্জুলার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ রাজাধিরাজের কার্য্যে অনধিকারচর্চ্চা যে দুঃসাহসের কর্ম্ম, দেবী তাহা জানিতেন। দেবীর একমাত্র ভরসা, যদি রাজাধিরাজ অন্যের নিকট অবস্থা শুনিবার পূর্ব্বে একবার নিজে তাঁহাকে বলিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার অনেকটা সম্ভাবনা। সে সুযোগ কি ঘটিবে? সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত নির্জ্জন সাক্ষাৎ নহে। রাজাধিরাজ অন্তঃপুরে পৌঁছিলে সপত্নী, ভোগিনী, আত্মীয়া, পরিচারিকা সকলে মিলিয়া মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা, অভিবাদন করিয়াছিলেন। তখন কোন কথা বলিবার, প্রার্থনা জানাইবার সুযোগ ত ঘটে নাই।

দেবী কারুবকীর শয়নগৃহ সুসজ্জিত; স্নিগ্ধ গন্ধদীপ-মালায় আলোকিত; পুষ্পস্তবক মাল্যে, অগুরু-চন্দনপ্রক্ষেপে, গুগ্‌গুল গন্ধে সুরভিত হইল। লীলা অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্ঞীর বেশভূষার শোভন পরিবর্ত্তন এবং তাঁহার কেশকলাপে অপূর্ব্ব শ্রীমতী কবরী রচনা করিতে ভুলিল না। বহু সপত্নীপরিবৃতা বিগতোন্মুখযৌবনা রাজরাণীও অঙ্গপ্রসাধন ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন না, রাজ্ঞী কারুবকীর ত আজ বিশেষ প্রয়োজনই ছিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বাসকসজ্জা রাজ্ঞী উৎকণ্ঠিতা হইলেন, গৃহে এবং অলিন্দে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকার কথায় বিশ্বাস করিয়া শেষে কি বিপ্রলব্ধার বিষম মনোব্যথা ভোগ করিতে হইবে?

এমন সময় লীলা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাজাধিরাজ আসিতেছেন। রাজ্ঞী সেই অলিন্দেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজাধিরাজ উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী অগ্রসর হইলেন, হস্তস্থিত শ্বেতপুষ্পমাল্য তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া প্রণাম ও তাঁহার পূজা করিলেন। অশোকদেব হাতে ধরিয়া রাজ্ঞীকে তুলিলেন। ফুলমালা পত্রপল্লবে সজ্জিত সুরভিত গৃহের শোভা এবং রাজ্ঞীর বেশভূষা ও অঙ্গরাগের পারিপাট্য দেখিয়া রাজাধিরাজ স্মিতমুখে বলিলেন,—

"এ গৃহে যে চিরবসন্ত বিরাজ করে!"

"এখানে দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাই শুষ্ক লতায়ও মঞ্জরী দেখা যায়।"

দীপরশ্মি প্রকাশিত রাজ্ঞীর প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন;—

"শুঙ্কলতা ?—শুঙ্কলতার সঞ্জীবনী শক্তিতে বৃদ্ধ দেবতার দেহও যে উৎফুল্ল হইয়া উঠে !"

হাসিতে হাসিতে উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাধিরাজ পালঙ্কে উপবেশন করিলে রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"সৌবিক আজ রাজ্ঞী অসন্ধিমিত্রার নাম করিয়াছিল।"

"সৌবিক অসন্ধিমিত্রার নাম করিলে যে কাহাকে বুঝায়, তুমি তাহা জান।"

"কিন্তু কয়দিন পরে আজ রাজধানীতে আগমন, আমি এতটা সৌভাগ্যের আশা করিতে সাহস পাই নাই !"

"আত্মশক্তিতে তোমার বিশ্বাস কম।"

"স্ত্রীজাতির আবার আত্মশক্তি।"

'নয় কেন ?"

"তা'র উপর কি নির্ভর করা যায় ?"

"চিত্তের সাহস পৃথিবী জয় করিতে পারে।"

"পৃথিবী জয়ে আমার পয়োজন নাই।—দাসীর একটী প্রার্থনা আছে।"

"অশোকের প্রিয়তমা মহিষীর আদেশ প্রচার হউক।"

রাজ্ঞী একটুকু হাসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের উৎফুল্লতা যেন একটুকু কমিয়া গেল। ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"এই মাত্র স্ত্রীজাতির সাহসের কথা বলিতেছিলেন, আমি এক অসম সাহসের কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।"

"অসম সাহস আছে বলিয়াই ত রাজ্ঞী সাক্ষকী দোর্দণ্ডপ্রতাপ অশোকদেবের উপযুক্ত মহিষী। ব্যাপারটা কি ?" রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন, "কোন শ্রমণের উপদেশে ভিক্ষুণী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছ ?"

"রাজাধিরাজ যেদিন রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইবেন, দাসীও তাঁহার পদানুসরণ করিবে।"

'তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে।'

রাজ্ঞী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন, রাজাধিরাজ তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসাইলেন, বলিলেন ;—

"কি অসম সাহসের কাজ করিয়াছ ?—ধর্ম্মপালের কারাবাসের আদেশ দিয়াছ, না কলিঙ্গ-জয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছ ?"

"অতদূর সাহস হয় নাই।"

"তবে কি ?"

রাজ্ঞী ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন ;—

"মঞ্জুলা আসিয়াছিল—"

"মঞ্জুলা ?—কেমন আছে ? অনেক দিন তাহাকে দেখি নাই।"

"আমার অপরাধ ক্ষমা হইবে ?"

"কি অপরাধ ?"

"মৃগয়া-যাত্রার দিন সচিবপুত্র প্রমীতসেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল—"

রাজাধিরাজ হাসিয়া উঠিলেন।'

' প্রমীতসেন ত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই।"

"রাজবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে সেদিন এক জন ভিক্ষু এবং প্রমীতসেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল।"

"সেই কথা ? এখন মনে পড়িতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, ভিক্ষু আমাকে সম্বোধন করিয়া কি যেন বলিবার সময় লোকের ঠেলাঠেলিতে প্রহরিণীদিগের রজ্জু-

সীমার উপর হেলিয়া পড়ে। একজন প্রহরিণী তাহাকে শূলবিদ্ধ করিতে উদ্যত হয়। প্রমীতসেন ভিক্ষুকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হয়। প্রমীত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই। রাত্রি প্রভাতে তাহার মুক্তির আদেশ দিব — এখন কোন্ অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, বল।"

রাজ্ঞী পরিপক্ক ব্যবহারজীবী ছিলেন না. পুনরায় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা আসিয়াছিল—"

"হাঁ, তাই কি ?"

"আমি প্রমীতসেনের মুক্তির জন্য ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাকে কারা হইতে মুক্তি দিয়াছেন।—দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এই অপরাধ ?"

রাজ্ঞী মুখ নত করিয়া রহিলেন।

রাজাধিরাজ তখন সেই প্রবীণা রাজ্ঞীর চিবুক ধরিয়া মুখ উঁচু করিলেন এবং নিজের গলদেশ হইতে পূজা-উপহার পুষ্পমালা খুলিয়া লইয়া তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। রাজ্ঞীর মুখ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজাধিরাজের পরাজয়

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ; —

"কত লোক ত বিচারে অবিচারে দণ্ডিত হয়, কোন দিন ত তুমি কাহারও জন্য অনুরোধ কর নাই। প্রমীতসেনের জন্য তোমার এত ব্যস্ততা কেন ?"

"প্রমীতসেনকে চিনি না, কোন দিন তাহাকে দেখি নাই। তবে সচিবপুত্র যে নগরে একজন ভাল লোক—ধনী, দাতা, দরিদ্রের বন্ধু এবং আপনার বিশ্বাসভাজন, তাহা ত আপনার মুখেই কতদিন শুনিয়াছি।—আমিও এক অনুরোধে পড়িয়াছিলাম।"

রাজাধিরাজের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে তোমাকে অনুরোধ করিল !"

"মঞ্জুলা ”

"মঞ্জুলা ! তাই বলিতেছিলে, মঞ্জুলা আসিয়াছিল ?"

"হাঁ।"

"সে কেন প্রমাতের জন্য অনুরোধ করিল ? প্রমীত তাহার কে ?"

"কেহই নহে। মঞ্জুলা একদিন মাত্র প্রমীতসেনকে দেখিয়াছিল।"

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। রাজ্ঞী তখন সেই দুর্য্যোগময় সন্ধ্যায় নগরোপকণ্ঠে মঞ্জুলার সঙ্গে প্রমীতের সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন —

"মঞ্জুলা ত এখন আর ছোট্ট বালিকা নহে।"

"তাহার বয়স আঠার বৎসর পার হইয়াছে।"

"নগরের পথে দৈব-দুর্য্যোগমধ্যে ক্ষণকালের পরিচয়, তাহার জন্য অনুরোধ !"

"ক্ষণকালের পরিচয়ে আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হইতে পারে।"

"হইতে পারে বটে, এখানেও কি তাহাই হইয়াছে ?"

"অসম্ভব কি ?"

রাজাধিরাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা বড় হইয়াছে, মাতার কাছে থাকে। শেষে কি সে সেই অভাগিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে?"

"অসম্ভব। আমি ত তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছি। মঞ্জুলার চরিত্র পবিত্র। আর, সে অভাগিনীর স্বভাবও ত অনেক দিন সংশোধন হইয়াছে।"

"সে যাহাই হউক, এ ভাবে আর দিন যাওয়া উচিত নহে। মঞ্জুলার বিবাহের কি হইল?"

"কিছুই হয় নাই। নানা কারণে তাহার উপযুক্ত বর যে সহজে মিলিবার নহে, তাহা রাজাধিরাজের অজ্ঞাত নহে।"

"মঞ্জুলা কেন প্রমীতের জন্য অনুরোধ করিল?"

"আমি যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।"

"বটে? প্রমীতের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইলে কেমন হয়?"

"হইলে ত অতি উত্তম হয়, কিন্তু প্রমীত-সেন যে বিবাহিত, তাহার পত্নী বর্ত্তমান।"

রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন;—

"মহারাজা অশোকের ত একের অধিক রাজ্ঞী বর্ত্তমান!"

রাজ্ঞীও হাসিয়া উত্তর দিলেন;—

"রাজা মহারাজার পক্ষে যাহা সম্ভব বা শোভন, অপরের পক্ষেও কি তাই?"

"নয় কেন?—প্রমীতের অতুল সম্পত্তি। সে সম্মত হইবে?"

"কাহার কথা বলিতেছেন?"

"প্রমীতের কথা।"

"প্রমীত আর একদিন মঞ্জুলার গৃহে যাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছে।"

"ও হোঃ! তাহার পর?"

"প্রমীত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে।"

"আর মঞ্জুলা?"

"চিত্ত হারাইয়াছে।"

"তবে আর কি চাই?"

"রাজাধিরাজের অনুগ্রহ।"

"ঘটকতাটা কি আমাকেই করিতে হইবে?"

"না, আমিও করিব না। কিন্তু প্রমীত যে মঞ্জুলার অনুরোধে কারামুক্ত হইয়াছে, সে কথা কোনরূপে তাহাকে জানাইতে হইবে।"

"কেন?"

"উভয়ে উভয়ের নিকট ঋণী থাকা ভাল। একপক্ষ ঋণী থাকিলে অপর পক্ষের মনে অভিমান থাকিয়া যায়। সে স্থলে চিত্তের বিনিময় হয় না, ঋণী চিত্তদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করে।"

নীরব হাস্যে রাজাধিরাজের মুখ প্রভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—

"শুনিয়াছি, পিতামহ ঠাকুরের এক মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম চাণক্য পণ্ডিত। রাজনীতি এবং অর্থনীতি-শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ পণ্ডিত ঠাকুর আজ জীবিত থাকিলে, চিত্তবিনিময় শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে তোমার নিকট হার মানিতেন।"

রাজ্ঞীর মুখ হাসিময় হইল, তিনি বলিলেন,—

"চিত্ত বলিয়া যে একটা কিছু পণ্ডিত ঠাকুরের ছিল, তাহা শুনি নাই; সুতরাং তাহার দানবিনিময় হয় ত তিনি বুঝিতেন না।—অনেক স্ত্রীলোক চিত্তবিনিময় চায় না, অতদূর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে স্থান পায় না, নিজের চিত্ত দান করিয়াই তাহারা সুখী!"

রাজাধিরাজ হাসিলেন, আদরে রাজ্ঞীর কবরী স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—

"সেরূপ দুর্লভ চিত্তের বিনিময়ে দান করিবার উপযুক্ত কিছু রাজরাজড়ার ভাণ্ডারে নাই !"

লজ্জায় রাজ্ঞীর স্মিত-প্রফুল্ল মুখ নত আরক্ত হইল।

রাজাধিরাজ বলিলেন ;—

"মঞ্জুলা যদি চিত্ত হারাইয়াই থাকে—প্রমীতকেই দিয়া থাকে, তবে আর তাহার জন্য ব্যস্ততা কেন ?"

"আত্মীয় সুহৃদেরা তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। ঘর সংসার করিতে হইবে, আদান প্রদান দুই-ই চাই। - আর পুরুষেরাই কি অত স্বার্থপর ?"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!—তা মঞ্জুলার অনুরোধেই যে তাহার মুক্তি হইয়াছে, প্রমীতসেন যাহাতে তাহা জানিতে পারে, তাহা করা যাইবে।—প্রমীতসেনকে মুক্ত করিয়াছ, ভিক্ষুর জন্য কোন চেষ্টা কর নাই!—ভিক্ষু কে ?"

"ভিক্ষু পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর।"

"উপগুপ্ত ?"

রাজাধিরাজ রাজ্ঞীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, রাজ্ঞী বলিলেন ;—

"হাঁ ; আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টা দেশ-পূজ্য পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর !"

রাজাধিরাজ কোন উত্তর দিলেন না। রাজ্ঞী পালঙ্ক হইতে নামিয়া দুই হাতে রাজাধিরাজের পদধারণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন ;—

"ভিক্ষুদেবকে মুক্তি দিবার আদেশ হউক !"

অশোকদেব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে রাজ্ঞীর হাত ধরিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন ;—

"এই সকল ভিক্ষু শ্রমণেরা দেশের শত অমঙ্গল ঘটাইতেছে।"

"শ্রমণ ভিক্ষুরা অমঙ্গল ঘটাইতেছে ?"

"হাঁ।"

"ইঁহারা ত অতি নিরীহ !"

"ইহারা চোর দস্যু অথবা দ্যূতকারী ব্যভিচারী নহে, কিন্তু ইহাদের আচারব্যবহার-দৃষ্টান্তে দেশের নিয়ত অমঙ্গল ঘটিতেছে ; লোকে যাগযজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ড, পূজাবলি পরিত্যাগ করিতেছে ; সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িতেছে।—ইহাদের শাসন আবশ্যক।"

"রাজাধিরাজের সভায় ত ব্রাহ্মণ শ্রমণের তুল্য সম্মান।"

"সে ত রাজনীতির কূটকৌশল"

"অখণ্ডপ্রতাপ রাজরাজেশ্বরের রাজ্য-শাসনে ন্যায়ের স্থলে কূটকৌশল !"

স্ত্রী-হৃদয়ের মহিমময়ী সরলতায় মুগ্ধ রাজ-চক্রবর্ত্তী বলিলেন ;—

"মন্ত্রণাসভায় এ প্রশ্ন উঠিলে উত্তর দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্ঞী কারুবকীর পবিত্র শয্যায় বসিয়া উত্তর দিতে আমার সাহস হয় না।—আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি !"

স্ফুরদুজ্জ্বল নেত্রে রাজ্ঞী কহিলেন ;—

"তবে আমার প্রার্থনা সিদ্ধ হউক !"

"অবশ্যই হইবে। লীনকে বলিয়া রাখ, প্রভাতে সৌবিক যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়।" (ক্রমশঃ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

নক্ষত্র-পূজা

দুর্গোৎসব

শরৎকালে আমরা দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দেবীর পূজা করি। এই পূজার চলিত নাম শারদীয়া পূজা।

দেবীর বাহন অনমীলিত লোচন মৃগরাজ সিংহ। সিংহপৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ পদ এবং মহিষাসুর-স্কন্ধে দেবীর বাম পদ। সিংহ মহিষাসুর-শীকারে প্রমত্ত। দেবী দশভুজা এক দক্ষিণ হস্তে সর্পলাঙ্গুল এবং এক বামকরে মহিষাসুরের কেশ-পাশ ধারণ করিয়াছেন। সর্প মহিষাসুরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

দশভুজার দক্ষিণ করপঞ্চকে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি এবং বাম করপঞ্চকে খেটকপূর্ণ চাপ, পাশ, অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা বা পরশু চক্‌মক্ করিতেছে।

দেবী দশভুজার শিরোদেশে স্থিত চালে ভূতেশ ভবানী-পতি রুদ্রদেব চিত্রিত থাকে এবং দেবী দশভুজার পদতলে অমৃতপূর্ণ ঘট স্থাপিত থাকে।

দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে হুতুমবাহিনী লক্ষ্মী দেবী ও মূষিকবাহন গজানন গণপতি দেব এবং নবপত্রিকাশোভিত "কলাবউ" অবস্থিত আছেন। এবং দেবীর বাম পার্শ্বে হংসারূঢ়া বীণাপাণি সরস্বতী দেবী ও শিখি বাহন শক্তিধর কুমার দেব অধিষ্ঠিত আছেন।

মহামায়ার এই প্রতিমার গূঢ়মর্ম্মভেদে সাত্ত্বিক উপাসকমাত্রের চিত্তে কৌতুহল জন্মিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই আধিভৌতিক প্রতিমার মূল আদর্শ (আধিদৈবিক চিত্র) আমরা উপাসকের চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে সযত্ন হইব। এই আধিভৌতিক প্রতিমার আদি আধ্যাত্মিক চিত্র উপাসক স্বয়ং সাধনা-বলে স্বহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়া লইতে যত্নশীল হইবেন। সাধনাক্ষেত্রে উত্তর-সাধকের স্থান নাই।

ইদানীন্তন কালে হিন্দু আপনাকে নক্ষত্র-উপাসক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু হিন্দু জানেন যে, বৈদিক ঋষির নক্ষত্র-উপাসনা হইতে তাঁহার পৌত্তলিকতা উদ্ভূত হইয়াছে।

রাশিচক্রে সিংহরাশি সূর্য্যের গৃহ, বাহন, এবং নাক্ষত্রিক প্রতিমা, এবং সিংহরাশির পরেই কন্যারাশি প্রতিষ্ঠিত আছে।

তারা-কন্যা—"জলে নৌকাস্থা শস্য অগ্নি-ধারিণী স্ত্রী" এবং কন্যারাশিস্থ চিত্রা-নক্ষত্র তারা-কন্যার উত্তমাঙ্গ গঠন করে এবং দশভুজা-মূর্ত্তি ধারণ করে। পঞ্জিকার মলাটে—নক্ষত্রগণের যে মূর্ত্তি চিত্রিত থাকে, তাহাতে চিত্রার দশভুজা-মূর্ত্তি চিত্রিত থাকিত। "গোলোকে সর্ব্বদেবদর্শন" প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাংলার পঞ্জিকার পুরঃপৃষ্ঠায় আর নক্ষত্রমূর্ত্তি দেখা যায় না। ভরসা করি, বারাণসী-ধামের পঞ্জিকার পুরঃপৃষ্ঠা হইতে নক্ষত্রমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয় নাই।

প্রাচীন কালে যখন উত্তর-সৌরস্থিতি (North Solstice) চিত্রানক্ষত্রে ছিল। তৎকালে তারা-কন্যার শিরোভাগ রাশি-চক্রের শীর্ষস্থানে ছিল এবং দশভূজা তারা-কন্যা তারা-সিংহের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন।

তারা-কন্যার ঊর্দ্ধে ও উত্তরে ভূতেশ মণ্ডল (Bootes) (*) অবস্থিত আছে। এই ভূতেশ-মণ্ডল বায়ু-দৈবত স্বাতি নক্ষত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। বায়ু রুদ্র-দেবের অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তি। এবং তারা-কন্যার পদতলে কাংস্যমণ্ডলে (Creator) স্থিত তারা-কাংস্য অমৃতের ভাণ্ড।

হিন্দু আরও জানেন যে, সুদীর্ঘ কৃষ্ণসর্প (Hydra) কন্যারাশিস্থ হস্ত নক্ষত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে তারা-কন্যার এক করকে যামা কর-তারার অদূরে মহিষাসুর (Centaur) বিদ্যমান আছে।

এই প্রকাণ্ড আধিদৈবিক তারাচিত্র দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার অবিকল আদর্শ।

এই আধিদৈবিক তারাচিত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেই উপাসক তাঁহার উপাস্য দেবীর প্রতিমার মূল তাৎপর্য্য গ্রহণে সক্ষম হইবেন। নতুবা নহে।

হিন্দু সতত মনে ধারণা করিবেন—নক্ষত্র-উপাসক হইলেও তিনি জড়োপাসক নহেন। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরম-ব্রহ্মের উপাসক। তবে উপাসকের হিতার্থে তাঁহার পরমব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়াছে। তাই পরমব্রহ্ম প্রকৃতি-পুরুষ, শ্রী-হরি, হর-গৌরী, ইন্দ্র চন্দ্র, বায়ু, বরুণ রূপে—ভারতে উপাসিত। কেবল "বিচার-দিনে" ঈশ্বরের সহিত হিন্দুর সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর হিন্দুর আজীবন সখা। সুতরাং তাঁহার রূপ চাই। তাঁহার এক এক মূর্ত্তি এক এক নক্ষত্রে স্থাপিত হইয়াছে। তাই বেদে প্রকাশ যে—দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি।

তাই হিন্দু "শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং অগ্নি-প্রত্যধিদেবতম্" দেবের পূজা করেন॥

তাই হিন্দু "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনারায়ণম্" দেবের পূজা করেন।

এক নক্ষত্রে হরি-হর স্থাপিত। যা শ্রী সা গিরিজা প্রোক্তা। যঃ হরিঃ সঃ হরঃ স্মৃতঃ॥" (বরাহ পুরাণ)

তারা-কন্যা "জগৎ-প্রসবিতা সবিতা"-দেবের নারী-মূর্ত্তি বা পত্নী অর্থাৎ সূর্য্য-প্রভা সূর্য্যা-দেবীর নাক্ষত্রিক প্রতিমা। তাই তারা-কন্যা সূর্য্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অগ্নি এক হস্তে ধারণ করেন। সূর্য্য-পত্নী তারা কন্যা সূর্য্যাধিষ্ঠিত নারায়ণের পত্নী শ্রী ও লক্ষ্মী। এবং তিনি সূর্য্যাধিষ্ঠিত রুদ্রদেবের পত্নী ভগবতী রুদ্রাণী। ঐ দেখ রুদ্রাণী "রুদ্রারূপেণ দেবানাম্ অগ্রতঃ দর্শনং দদৌ" (বৃঃ দেঃ সুঃ) এবং ঐ শুন ভগবতীকে—"সূর্য্যমন্ত্রেণ পূজয়েৎ" (ইতি পাদ্মে)।

উপাসক দেখিতেছেন যে—ভগবতী নারায়ণের চক্র, রুদ্রদেবের ত্রিশূল খড়্গ, ইন্দ্রের পরশু (বজ্র), বরুণের পাশ এবং কুমারের শক্তি ধারণ করিয়া আছেন।

তারা-কন্যা চিরকুমারী এবং চির সতী,

(*) গ্রীকজ্যোতির্বিদ্‌গণ বলেন যে "Bootes গ্রীক শব্দ নহে"। বোধ হয় ভূতেশ হেলেসপন্ট পার হইয়া Bootes নাম গ্রহণ করিয়াছেন—(লেখক)।

তাই দক্ষসুতা তারা-কন্যা সর্ব্বত্র * "সতী" নাম পাইয়াছেন।

সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যা দেবী উদয়গিরিতে জাত বলিয়া "গৌরী" নাম পাইতে পারেন। অথবা সূর্য্যার প্রতিমা হেমবর্ণা। তাহাপর সোম-ধারা বেদে হৈমবতী নাম ধারণ করেন। এই দুই কারণে পুরাণে দেবী হিমবন্দুহিতা হইয়াছেন। অভিধানে দেবীর এক নাম চিত্রা। চিত্রা নামের সার্থকতা উপাসকের বিশেষ বিবেচ্য। দেবীর সাবিত্রী নাম উপাসকের মনে বেদের সূর্য্যা দেবীর ছায়া আনিয়া দেয়। সিংহপৃষ্ঠে তারা কন্যা [illegible] এবং "প্রকৃতি-পুরুষের" আদি আদর্শ।

মহিষ ও সর্প অন্ধকারের সহচর বলিয়া তাহারা অন্ধকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মহিষাসুর মণ্ডল এবং জলসর্প-মণ্ডল (কালীয়) অন্ধকারের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। সর্পবেষ্টিত মহিষ অন্ধকারের রণমূর্ত্তি। সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যা অন্ধকার বিনাশে সতত উদ্যত। আলোক ও অন্ধকারের অবিরাম সংগ্রাম জগতে নিয়ত চলিতেছে। এ সংগ্রামের আদি বা অন্ত নাই। কখন (দিনে) আলোক উচ্চে, কখন (রাত্রে) অন্ধকার উচ্চে। এ সংগ্রামে জয়-পরাজয় নাই। সিংহবাহিনী তারা-কন্যার হস্তে সর্পবেষ্টিত মহিষ-অসুরের মরণ নাই। তাই দেবী 'মহিষ-মর্দ্দিনী" নাম ধারণ করেন। দেবী মহিষ-বিনাশিনী নহেন † পাছে দেবী সূর্য্যার এই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন উপাসকের মনে দ্বিধা জন্মে সেই সংশয় বিমোচনার্থে তারা-সিংহ দেবীর বাহন এবং ভূতেশ দেবীর শিরোদেশে এবং অমৃতভাণ্ড দেবীর পদতলে স্থাপিত হইয়াছে।

এই তারা-চিত্র মহর্ষি কাত্যায়নের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। মহর্ষির উদ্ভাবিত তারামূর্ত্তি কাত্যায়নী নাম ধারণ করে।

"উমা কাত্যায়নী গৌরী"

ইন্দ্রের শচী আদিত্যের শ্রী ও লক্ষ্মী, রুদ্রের রুদ্রাণী, বরুণের সুদেষ্ণা, যমের ধূমোর্ণা, চন্দ্রের 'চিত্রা', কুমার কামদেবের 'দেবসেনা', সতী সাবিত্রী সকলেই তারাকন্যার মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। এই মূর্ত্তির উপাসনায় বিশাল-হৃদয় উপাসকের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি এক আধারে সকল দেবদেবীর উপাসনায় চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারেন।

অদরদর্শী বৈষ্ণবগণ বেশ পড়েন—

(ক) যঃ হরিঃ সঃ হরঃ স্মৃতঃ

(খ) শংকরঃ ভগবান্ গৌরীঃ (বিষ্ণুপুরাণ)

(গ) রুদ্রদেবের প্রার্থনামতে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভার্য্যা পার্ব্বতীকে অর্পণ করেন।

তথাপি তাঁহার ভেদ-জ্ঞান দূর হয় না।

তিনি বেদোক্ত রুদ্রদেবকে মোগল বানাইতে চাহেন।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তড়িৎময়ী প্রভাদেবী বেদে কুমারী সূর্য্যা নামে গীত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন।

সেই সূর্য্যাদেবী আদ্যাশক্তির আধিদৈবিক প্রতিমা।

নববর্ষের আদি দিনে রাশিচক্রে সূর্য্যের নব যাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। বাক্যান্তরে জগৎ-প্রসবিতা সবিতাদেবের নারীমূর্ত্তি কুমারী ভগ-

---

* দ্রঃ। Semitic Ariadne (the very chaste one)

† মহর্ষি বেদব্যাস মহিষাসুর বধের এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রদ্যুম্ন কামদেবও কুমার [illegible] গ্রহের উদয়ে নিশাকালে মহিষাসুরের [illegible] হইয়াছে। ([illegible])

বতী সাবিত্রী সতীর নব যাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। ভগবতী সাবিত্রী দেবীর যাত্রা হইতে নববর্ষের প্রথম দিন "ভগবতীযাত্রা" উপাধি ধারণ করে।

খৃঃ পূঃ ১১৮১ সালের ১লা আশ্বিন হইতে আশ্বিন-আদিবর্ষ পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিনে কৃষ্ণ নবমী তিথি ছিল, তাই কৃষ্ণ নবমী তিথিতে কল্প আরম্ভ করিয়া ভগবতীর পূজা আরম্ভ হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভগবতী সাবিত্রী দেবীর আধি-দৈবিক বা নাক্ষত্রিক প্রতিমা সিংহবাহিনী তারা-কন্যাতে সবিতাদেবের প্রবেশ দিনে নব-বর্ষের অবতারণা উপলক্ষে হিন্দুর এই শারদীয় মহোৎসব হয়। হিন্দু কালক্রমে শারদীয়া পূজার মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। এখন তিনি ভাবেন তিনি নক্ষত্র-উপাসক নহেন। তিনি পুরাণে পড়েন—যোগ ভঙ্গ হেতু মহর্ষি কাত্যায়ন মহিষাসুরকে অভিসম্পাত করেন যে "আদ্যাশক্তি দশভুজামূর্ত্তি হইয়া তাহাকে সংহার করিবেন।"

পারিপার্শ্বিক দেবদেবী

গণপতি

মূষিকবাহন গজানন গণপতি দেব সিদ্ধি-দাতা গণেশ নামে সকল দেবের অগ্রে পূজা লইতেছেন। ইনি কে?

বৃহস্পতি সূক্তে আমরা ঋক্ মন্ত্রে (২।২৩।১) পড়ি—

"গণানাম্ ত্বা গণপতিম হবামহে" হে বৃহস্পতি তুমি মরুৎগণের অধিপতি তোমায় আহ্বান করি।

তাই কালিকাপুরাণে নির্দ্দেশ হইল "গণেশবীজং তম্ ইদম্ তয়োঃ মন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্" গণেশ দেব ও দেবগুরু বৃহস্পতি উভয়ের বীজমন্ত্র এক।

অর্থাৎ

ইহারা একে অন্যের প্রকৃতি। সুতরাং গণপতি বৃহৎ-পতির প্রতিমা তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঋক্মন্ত্রে পড়ি (২২৩।১৮) বজ্রধর বৃহস্পতি মেঘ অধোমুখ করেন।

তন্ত্রমতেও "বারিপূর্ণাং মহীং কৃত্বা। পশ্চাৎ সঞ্চরতে গুরুঃ।"

জলবর্ষী দিগ্‌গজের কথা সকলেই জানেন। জলবর্ষী গজ জলদেবতা বৃহস্পতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বক্রদংষ্ট্র গজমুণ্ড "এক-দন্ত গজানন" হইল।

মূষিক ভাবী ঝটিকা গণনা করিতে পরম দৈবজ্ঞ। আপতত্ত ঝড়ের পূর্ব্বে জাহাজের নৌ নিগড় তুলিলে মূষিকদল ঝাঁকে ঝাঁকে ঝম্প দিয়া জাহাজ হইতে সমুদ্র-জলে পড়ে ও কিনারা লয়।

বিলাতী কাণ্ডারী ঠেকিয়া শিখিয়াছেন এই জ্যোতিষীদল চম্পট দিলে জাহাজ ভাসাইতে নাই। তাই মূষিক মরুৎগণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মূষিক "গণানাম্ গণ-পতি"র বাহন হইল।

দেবগুরু বৃহস্পতি দেবগণের পিতা।

"দেবানাম্ যঃ পিতরম্"... (ঋ ২।২৬।৩) তিনি বেদমন্ত্রের জনিতা ...জনিতা ব্রাহ্মণঃ অসি (ঋ ২।২৩।২)। গতিকে তিনি সিদ্ধি-দাতা গণেশ। তিনি আর্য্যজাতির আদি উপাস্য বৃহৎ-পতি। তাঁহার পূজা না করিয়া হিন্দু অন্য দেবের পূজা কিরূপে করিবেন। তাই গণপতি বৃহস্পতির পূজা সর্ব্বাগ্রে করিতে

হয়। নতুবা অন্য দেবগণ পূজা গ্রহণ করেন না। কাহার সাধ্য দেবগণের পিতা বেদমন্ত্রের জনিতা গুরু বৃহস্পতিকে ছাড়িয়া পূজা করে বা পূজা লয়?

মূল-তত্ত্ব জানিলে পৌরাণিক উপন্যাস পড়িতে বড়ই আনন্দ অনুভব হয়। মূল তত্ত্ব জানা না থাকিলে বড়ই বিপদ

বড়ই দুঃখের বিষয় যে সুপণ্ডিত অষ্টাদশক পদ্মপুরাণকার গণপতির মূল উদ্‌ঘাটনে মহাভ্রমে পতিত হইয়া মূষিকবাহনে কামদেবকে চড়াইয়াছেন।

তবে সাহিত্যিক নিষ্ঠাবশে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে "সিদ্ধিপদ কানন" ধ্যানে মনটা যে বিচলিত না হয় এমন নহে।

বেদমতে বৃহস্পতি ব্রহ্মণ তাই গণেশের হাতে বাদ্যভাণ্ড। জ্যোতিষমতে বৃহস্পতি গ্রহে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র উভয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ব্রহ্মাধিদৈবং সুরগুরুং ইন্দ্র প্রত্যধিদৈবতম্ তাই ব্রহ্মার (বিধির) কলম গণপতির হস্তে।

কার্ত্তিকেয়

কুক্কুটশোভিত কুমার শিখিবাহন কার্ত্তিকেয় কে? মহাভারতমতে কুমার স্কন্দদেব অগ্নির পুত্র। অগ্নিদেব কুমারকে চিত্র-শিখণ্ডী এবং শিখণ্ডী (কুক্কুট) উপহার দেন। কুমার দেবসেনার পতি।

মার-গ্রহ (মঙ্গল) সম্বন্ধেও দেবসেনা-পতি। জ্যোতিষ মতে ভৌম ভূমিনন্দন মার গ্রহের অধিদেবতা স্কন্দদেব।

"স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং"

কালিকাপুরাণে নির্দ্দেশ আছে যে "কাম-দেবস্য বীজন্তু যদ্বং ভৌমস্য কার্ত্তিকম্।" কামদেব ও ভৌমগ্রহ উভয়ে একই বীজমন্ত্রে অর্চ্চিত হইবে। অর্থাৎ ভৌমগ্রহের অধি-দেবতা কামদেব।

ভৌমগ্রহের জ্যোতিষোক্ত অধিদেবতা কুমার স্কন্দদেব এবং কামদেব একই ব্যক্তি।

অথর্ব্ববেদোক্ত কামসূক্ত (৯।২) পাঠে আমরা পাই যে কামদেব ত্রিমূর্ত্তিতে মানবের হিত সাধন করেন। সমরদেব, মৃত্যুদেব এবং প্রণয়দেব। "যৎ তে কাম শর্ম্ম ত্রিবরূথম্।" কুমার কার্ত্তিকেয় দেবকে আমরা এই 'ত্রিমূর্ত্তি উপাসনা' করি।

পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে এ-সময় য়ুরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় শরৎকাল জীবের মরণের সময়। তাই কার্ত্তিক মাসে মৃত্যুদেব কার্ত্তিকেয় উপাসিত হইয়া থাকেন।

কামারিপুপ্রবণ রণদুর্ম্মদ চিত্র-শিখণ্ডী (ময়ূর) কামদেব—কার্ত্তিকেয়দেবের বাহন। কামারিপুপ্রবণ রণদুর্ম্মদ শিখণ্ডী (কুক্কুট) কুমার কাম—কার্ত্তিকেয়দেবের ভূষণ। এবং কামারিপুপ্রবণ ছাগের মুণ্ড কুমার কার্ত্তিকেয় দেবের সপ্তম মুণ্ড। মহাভারত-উক্ত এই "ছাগবক্ত্র সপ্তম মুণ্ড" প্রতিমায় প্রকাশ থাকে না।

কালপুরুষমণ্ডল (Orion) কামদৈবত ভৌমগ্রহের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। কৃত্তিকা-নক্ষত্র সন্নিহিত এই তারামণ্ডলে ময়ূর পৃষ্ঠে কুমারদেব আসীন আছেন। এবং তারা-কুক্কুট কুমারের শিরোদেশ সুশোভিত করিতেছে। এই তারা-কুক্কুট চাক্ষুষ দৃষ্টির গোচর নহে। ফীল্ড গ্লাস সাহায্যে ইহাকে দেখিতে হয়। চণ্ডীতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মন্ত্র-

কুক্কুটবৃত কুমার-মূর্ত্তিকে নারীবেশ দিয়াছেন। যথা :—ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরে অনঘে।

কৌমারীরূপসংস্থে চ নারায়ণি। নমোহস্তুতে ॥

অহি-সর্প অহি-অন্ধকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। অহি সর্প ভক্ষণ শিখণ্ডী ময়ূর এবং শিখণ্ডী কুক্কুট উভয়েই লঘুহস্ত। অহি-সর্পনাশী স্কন্দবকায় ময়ূর কুক্কুট উভয় অহি অন্ধকারনাশী অপরূপ কুমারদেবের ভূষণ বাহন হইলেন।

কুমার যে শক্তির আঘাতে মহিষ-অসুর বধ করিয়াছিলেন ঐ শক্তি কুমার-করে বিরাজমান আছে।

এই শক্তি ভৌমগ্রহের হস্তে দিয়া স্কন্দ-পুরাণকার মঙ্গল গ্রহের স্তবে বলিয়াছেন,—

"ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভম।

কুমারং শক্তিহস্তং চ লোহিতাঙ্গম্ নমাম্যহম্ ॥"

চিন্তাশীল পাঠক বিচার করিবেন যে, স্তবটী গুহদেবে প্রয়োগ করিলে খাটে কি না।

লক্ষ্মী

বেদমতে—শ্রীঃ চ তে লক্ষ্মীঃ চ পত্নৌ। শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যদেবের পত্নীদ্বয়।

পদ্মপুরাণে পড়ি —"লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মিঃ" লক্ষ্ম-(কলঙ্ক)-ময়ী লক্ষ্মীদেবার ভ্রাতা কলঙ্কী চাঁদ। পূর্ণিমা তিথির স্ত্রীগ্রহ রাকাচন্দ্র ভিন্ন শীতরশ্মির ভগিনী আর কে হইবে ?

চন্দ্র ওষধিপতি। বেদমতে (ঋ ২।৩২।৫) রাকা ধন ও সহস্র পোষ (সাহায্য) দাত্রী।

যাঃ তে রাকে সুমতয়ঃ

যাভিঃ দদাসি বসূনি।

তাভিঃ নঃ অদ্য···

সহস্র পোষং সুভগে রণানা ॥

সকলেই জানেন যে পূর্ণিমাচন্দ্রে লক্ষ্ম সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। তাই রাকাদেবী লক্ষ্মী নাম গ্রহণ করিয়া ধনধান্যদায়িনী হইয়াছেন। লক্ষ্মী শস্যের অধিপত্নী। হুতুম চন্দ্রের সহচর। সে দিবাভাগে অদৃশ্য থাকে। শস্যভক্ষক মূষিক বিনাশে হুতুম সিদ্ধহস্ত। এই গুণে সে লক্ষ্মীর বাহন হইল।

দ্বাদশ পূর্ণিমার মধ্যে শারদীয় পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্নারূপে অতুলনীয় এবং জগতের অপার আনন্দপ্রদ বলিয়া কৌমুদী (কু+মুদ) আখ্যা পাইয়াছে।

শরৎশস্য আহরণ সমাপ্ত হইলে উল্লাসে ভারতের কৃষককুল কৌমুদীর নিশা আনন্দে জাগরণ করিত। তাই এই পূর্ণিমা কো-জাগরী নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই কো-জাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে রাকার উদয় ক্ষণে হিন্দুকৃষকের ঘরে ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। কিন্তু খাজানা, সেষকর ও চৌকিদারী টেক্সের দায়ে কৃষককুল ব্যাকুল হইয়াছে। রাত্রি জাগরণ কে করে ?

লক্ষ্মীদেবী অন্ধকার-মহিষ নাশে ভগবতী সূর্য্যার দক্ষিণ হস্ত। তাই দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইয়াছেন।

সরস্বতী

বীণামণ্ডলের (Lyra) পার্শ্বে আকাশ সরস্বতী সোমধারার (The Milky way) মধ্যে প্রবাহিত আছেন।

ঋক্‌মন্ত্রে (১।৩।১২) পড়ি—বারিধিকে সরস্বতী কিরণে আলোকিত করিতেছেন যথা—

"মহঃ অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা" টীকায় সায়ন বলিলেন "দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবৎ দেবতা নদীরূপা চ।" আকাশ সরস্বতী বলিতে সাহসে কুলাইল না।

বেদমতে সরস্বতী বাক্‌দেবী। এবং সরস্বতীর কৃপায় বেদমন্ত্র রচিত হয়। সরস্বতী প্রচণ্ড, নক্ষত্রপথগামিনী এবং অন্ধকার বিনাশিনী। যথা—ঋ ৬ ৬১ ৭

"ঘোরা হিরণ্যবর্ত্তনীঃ বৃত্রঘ্নী" তাই মহিষাসুর বধে সরস্বতী ভগবতী দুর্গার সহায় হইয়াছেন। তাঁহার ভূষণ তারা-বীণা এবং তাহার বাহন তারা-হংস (Cyghus)

তারাদর্শক।

শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী

বঙ্গদেশের পবিত্র সারস্বতধাম নবদ্বীপের বিদগ্ধজননী অথবা পোড়ামা তলা হইতে একটী সরল রাজপথ পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ৺বুড়াশিবের কোঠা ওলাদেবীর মন্দির ও পাড়ার মার তলা অতিক্রম করিয়া নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলার সীমাবাঞ্জক পলতা বা আদিগঙ্গার খাত পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথের বাম পার্শ্বে ওলাদেবী তলার সম্মুখে শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ছিল। দক্ষিণ-দ্বারী ও উত্তরদ্বারী দুইটী মৃণ্ময় ভিত্তিবিশিষ্ট চণ্ডীমণ্ডপ। উহার মেঝে, বারান্দা, সিঁড়ি প্রভৃতি পাকা সিমেণ্ট করা। পূর্ব্বদ্বারী সুদীর্ঘ গৃহশ্রেণী উহাতে প্রায় সাত আটটী ঘর। প্রত্যেক ঘরের অদ্ধাংশ উচ্চ, উহাতে বিদ্যার্থিগণ শয়ন ও উপবেশন করিতেন এবং অপর নিম্নাদ্ধে পাকের উনোন ও আহারের স্থান। প্রত্যেক ঘরে একটী করিয়া দরজা ও উহার সমসূত্রপাতে ক্ষুদ্র আকারের একটী করিয়া জানালা। পূর্ব্বদিকে বাগান; উহাতে পেঁপে, কদলী, নিম, বেগুন, মেটে আলু, লাউ, মটেশাক, পেয়ারা, ফজলি আম প্রভৃতির গাছ। উঠানের চতুর্দ্দিকে দোপাটী, গাঁদা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প তরু-শ্রেণী। তদ্ভিন্ন চতুষ্পাঠী গৃহশ্রেণীর উত্তর ভাগে দক্ষিণদ্বারী চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিম পার্শ্বে সমতলভূমিতে একটী বড় বিল্বতরু ও একটী চম্পক বৃক্ষ শোভা পাইত। চতুষ্পাঠী গৃহশ্রেণীর দক্ষিণাংশে বৃহৎ কূপ বিদ্যমান।

এই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয় নবদ্বীপের বিশ্রুতনামা পণ্ডিতগণের অন্যতম। তিনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ৺হরমোহন চূড়ামণি ও প্রধান স্মার্ত্ত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয়ের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী এবং মহামহোপাধ্যায় ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, ৺প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন, ৺হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মহামহোপাধ্যায় ৺রাজ-কৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়-গণের সমসাময়িক। মহামহোপাধ্যায় ৺যদু-নাথ সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও ৺শ্রীনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়গণ তাঁহার পরবর্ত্তী। শিরোরত্ন মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের ভঙ্গ-কুলীন-বংশসম্ভূত। তাঁহার বংশোপাধি বন্দ্যো-পাধ্যায়। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার

ও ন্যায়দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শিরোরত্ন মহাশয় পাঠ শেষ করিয়া যদি মিশনরী কলেজে কিছুদিন চাকরি স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত অধ্যাপকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক প্রখ্যাত ও যশস্বী হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা রক্ষা করিতে গিয়া মিশনরী কলেজের কার্য্য পরিত্যাগ করেন।* তাহার পরে, তিনি সুন্দর চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া পবিত্র অধ্যাপন-ব্রত ব্রতী হন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের দুই পক্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই ব্রত অক্ষুণ্ণ ছিল। এখনও সেই সারস্বতনিকেতন চতুষ্পাঠীর শেষ চিহ্ন মৃত্তিকা-স্তূপ রহিয়াছে কিন্তু সেখান হইতে বাগ্‌দেবীর পবিত্র বীণাঝঙ্কার চিরকালের জন্য নীরব হইয়াছে। সে মধুর ঝঙ্কার আর কখনও সেখানে শ্রুত হইবে না।

পূজ্যপাদ গুরুদেব শিরোরত্ন মহাশয়ের প্রথম জীবনে ও মধ্যজীবনে কত শত বিদ্যার্থী তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা গণনা করা অসম্ভব এবং আমি তাঁহাদের সকলের নামও অবগত নহি; আমি গুরুদেবের শেষ জীবনের ছাত্র, আমাদের সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। আমি একাদশবর্ষ বয়সে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়নের নিমিত্ত এই চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করি, তখন আগমেশ্বরীতলার ৺মথুরানাথ তর্কবাগীশ (মথুর পুরুত) পাঠ শেষ করিয়াছেন, তবে মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের পাঠ চাওয়াইতে আসিতেন। বুড়াশিবতলার তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি মহাশয় তখনও চতুষ্পাঠীর মেরুদণ্ডস্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন। কুমারখালীর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসন্ন গোস্বামী কিছুকাল পরে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। শিবচন্দ্র দাদা কাশী ঘুরিয়া পুনরায় এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়াছিলেন। অপর দুইজন সংসারে প্রবিষ্ট হন। আমি প্রতিদিন স্বহস্তে লিখিয়া ব্যাকরণ পাঠ করিতাম, গুরুদেব আমার হাতের লেখা দেখিয়া আমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ ভায়া* এবং আমার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য ও অমরকোষ অভিধান পাঠ শেষ হইলেই গুরুদেব ব্যাকরণ পড়ান ছাড়িয়া দেন। তিনি ব্যাকরণপাঠার্থী ছাত্রদিগের শুভদিনে ব্যাকরণের একটী পাঠ পড়াইয়াই আমার এবং হরগোবিন্দ ভায়ার হস্তে পড়াইবার জন্য অর্পণ করিতেন। যদিও পাঠার্থীদিগের কতক সংখ্যক আমার হস্তে ও কতক হরগোবিন্দ ভায়ার হস্তে দিতেন। কিন্তু একের অনুপস্থিতিতে অপরকে

(*) তদানীন্তন পণ্ডিতগণের মধ্যে শিরোরত্ন মহাশয়কে সমধিক ব্যুৎপন্ন শুনিয়া মিশনরী কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রথমে শিরোরত্ন মহাশয় অস্বীকার করেন, শেষে এইরূপ নিয়ম হয়, শিরোরত্ন মহাশয় মাসিক বেতন গ্রহণ করিবেন না, তবে 'মিশনরী' সাহেব ছয়মাস কিম্বা এক বৎসর অন্তর ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুত্রদিগকে কিছু টাকা উপহার দিতে পারেন। শিরোরত্ন মহাশয় ছয়মাসের অধিক কর্ম্ম করেন নাই, তাঁহার পুত্রদিগকে কোন উপহারও গ্রহণ করিতে হয় নাই।

(*) বর্ত্তমান নড়াল ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক।

সকল ছাত্রকেই পড়াইতে হইত। আবার ছাত্রেরা কোন মাসে আমার নিকট কোন মাসে বা জয়গোবিন্দ ভায়ার নিকট পড়িতেন। বৈদেশিক ছাত্রদের মধ্যে দুইজন আমাদের অপেক্ষা পাঠে অধিক অগ্রসর ছিলেন। একজন বিদ্যারত্ন আখ্যায় অভিহিত, ইঁহার নাম আমরা কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিতীর্থ, তারকেশ্বরের মোহান্তের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক)। আমরা যাঁহাদের পাঠ চাওয়াইতাম, যতদূর স্মরণ আছে, নিম্নে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিভূষণ, বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক), শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (ইদানীং বিদ্যাভূষণ, নদীয়ার রাজ-পুরোহিত), ৺প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (৺হরমোহন চূড়ামণি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র), শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিভূষণ, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌত্র এবং হরিসভার অধ্যক্ষ), ৺কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, ৺যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত্ত ৺শ্রীনাথ শিরোমণি মহাশয়ের সহোদরদ্বয়), ৺দুর্গাদাস আচার্য্য (পরে বিদ্যারত্ন, নদীয়ার রাজার তদানীন্তন পঞ্জিকাকার ৺তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশের পুত্র), শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ গোস্বামী ভাগবতরত্ন (চৈতন্য-চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ), ৺মাধবচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতভূষণ, শ্রীগোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গোস্বামী (ইদানীং সন্ন্যাসী), শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা), ৺দীননাথ রায় ([illegible]), শ্রীযুক্ত মতিলাল সান্ন্যাল (মতি [illegible]), [illegible] ভট্টাচার্য্য (নদীয়ার রাজার দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুরোহিত যাদু ভট্টাচার্য্যের পুত্র)। এত ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী (শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র, ইদানীং প্রসিদ্ধ কথক), শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ ঘটক (ইদানীং বৃন্দাবননিবাসী পুরাণপাঠক), শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন (মুগ্ধবোধের বাঙ্গালা অনুবাদক) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা (যশোর-জেলা-নিবাসী), শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী (লটাখোলা-নিবাসী), শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ মিশ্র (উৎকল যাজপুর নিবাসী), ৺আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ মিশ্র পাত্রীঙ্কর (গঞ্জাম জেলার অধিবাসী), এতদ্ভিন্ন ত্রৈলিঙ্গ দেশ হইতে অনেক ছাত্র অনেক সময় আসিতেন যাইতেন, তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রীষ্মকালে প্রাতঃকালে ৭টার সময় ও শীতকালে ৮টার সময় চতুষ্পাঠীতে আসিতেন। তাঁহার টীকি ছিল না, প্রশস্ত টাক টীকির স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্ণ শ্যাম, শুভ্র উপবীত বক্ষঃস্থলে শোভা পাইত। একখানি সাদাপেড়ে ধুতি পরিতেন। বেশ দামী তালতলার চটি পায়ে দিতেন। তাঁহাকে কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নাই, শীতকালে একখানি পাতলা চাদরের উপর বনাত কিম্বা শাল গায়ে দিতেন। একটু বেঁটে ছিলেন, গুড় গুড় করিয়া যখন রাস্তা দিয়া আসিতেন, তখন চতুষ্পাঠীতে সকলে উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিত। তিনি আসার সময় একটা কাগজের ঠোঙ্গায় বড় বড় কতকগুলি টীকা ও উৎকৃষ্ট তামাক

লইয়া আসিতেন। ছাত্রবৎসল গুরুদেব জানিতেন, অন্তেবাসিগণ তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং ঐ দুই দ্রব্য এরূপ পরিমাণে আনিতেন যে, তাহাদ্বারা সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত সমস্ত দিন রাত্রি চলিত। তিনি আসিয়াই দীনুদাদা বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র দীনুদাদা ঈষৎ হাসিমুখে গিয়া দুই হাত বাড়াইয়া টীকা-তামাক গ্রহণ করিতেন এবং তামাক সাজিয়া টিকা ধরানোর ছলে খুব মকৃথম দুই টান দিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হুকার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেন। দীনুদাদার অনুপস্থিতিতে বেণীদাদার হস্তে তাম্রকূট-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাক্ষাতে কোন ছাত্র তামাক খাইত না, কিন্তু তিনি যেন কিরূপ অভাবনীয় উপায়ে জানিতেন কে তামাক খায়, কে খায় না। যাহারা তামাক খায় না, তাহাদিগকে তিনি তামাক সাজিতে বলিতেন না। হরগোবিন্দ ভায়ার এবং আমার ও বালাই ছিল না, সুতরাং কখন তিনি আমাদের দু'জনকে তামাক সাজিতে বলিতেন না। পূর্ব্বাহ্ন ১০টা কোন দিন বা ১১টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা চলিত। তাহার পর পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র চয়ন করিয়া গৃহে যাইতেন। একদিন কিংবা দুইদিন অন্তর বাগান হইতে থোড়, মোচা, কলাপাতা, মেটে আলু, কাঁচা কলা, নিমের পাতা, লঙ্কা, কাঁচা পেঁপে, পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা হইত। যে দিন ঐ সকল গৃহে যাইত, সে দিন পূর্ব্বেই পরিচারিকা ঝুড়ি লইয়া বসিয়া থাকিত।

চতুষ্পাঠী হইতে বাটী গিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বস্ত্র ও কোশা লইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতেন। সেখানে স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা শেষ করিয়া গৃহে আসিতেন। বাটী হইতে পূজোপকরণ সহ পুনরায় বুড়াশিবের কোঠায় আসিয়া শিবপূজা করিতেন। তাহার পর বাটীতে গিয়া নারায়ণ পূজা করিয়া আহার শেষ করিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া যাইত। আধঘণ্টা বিশ্রামের পর, পুনরায় চতুষ্পাঠীতে আসিতেন। বিকালে নিজের চতুষ্পাঠীর ছাত্র পড়াইতেন না, নবদ্বীপের অন্যান্য চতুষ্পাঠী হইতে প্রতিদিন বহু বিদ্যার্থী ন্যায়ের শব্দখণ্ড, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কুসুমাঞ্জলি পড়িবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতেন। যদিও ভট্টাচার্য্য মহাশয় অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ন্যায়ের অনুমান-খণ্ড পড়াইতেন, কিন্তু ন্যায়ের শব্দখণ্ডে তাঁহার ন্যায় ব্যুৎপন্ন অধ্যাপক সে সময়ে নবদ্বীপে আর কেহই ছিলেন না। সুতরাং নবদ্বীপের সকল ছাত্রই পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট শব্দখণ্ড ও কুসুমাঞ্জলি (যাহাতে ন্যায়-মতে ঈশ্বর নিরূপণ করা হইয়াছে) পাঠ করিতে আসিতেন। আগন্তুক ছাত্রদের মধ্যে পাকা টোলের লক্ষ্মণ আচারী ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী এই দুইজন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। লক্ষ্মণ আচারী গোঁপের জন্য ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী ছাতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্মণ আচারীর গোঁপ নৈমিষারণ্যের সেই বড় হনুমানের গোঁপের মত বেটাগো ছিল। সদানন্দ ব্রহ্মচারীর ছাতার আকার অতি বৃহৎ, উহাতে বারোটা ডাল ছিল, শাদা ডবল কাপড় এবং শাদা ঝালর চতুর্দ্দিকে শোভা পাইত। ঐ ছত্রটীর মধ্যে চারি পাঁচটী লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারিত, [illegible] ব্রহ্মচারী মহাশয় একাকীই উহার [illegible]

ভোগ করিতেন। বর্ণটী গৌর, মাংসল দেহ, মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবসন, দাঁত সাদা ধবধবে, হাঁসিলেই দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িত। নামেও সদানন্দ, কার্য্যেও সদানন্দ, সকলের সঙ্গেই সর্ব্বদা হাসিমুখে কথা কহিতেন। ব্রহ্মচারী পাকাটোলে লক্ষ্মণ আচারীর ঘরের পাশের ঘরে বাস করিতেন। আচারী কৃষ্ণবর্ণ শাস্ত্রোক্ত গোষ্পদপরিমিত দীর্ঘশিখা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইত। পেচকের ন্যায় আরক্ত নয়ন ও অত্যন্ত ক্রোধান্ধ। আচারী কথায় কথায় সরলপ্রকৃতি ব্রহ্মচারীর নামে অভিযোগ করিতেন, আমাদের চতুষ্পাঠীতে উহার বিচার হইত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। আবার দুইজনে কোলাকুলি করিয়া হাসিতে হাসিতে টোলে ফিরিয়া যাইতেন। পাকাটোলের আর একটী প্রবীণ বিদ্যার্থী গুরুদেবের নিকট "বাদার্থ" পড়িতে আসিতেন। ইঁহার জন্মভূমি পঞ্জাবের জলন্ধর নগর। ইনি একচক্ষু, ছাত্রমণ্ডলীতে কাণাভট্টের (রঘুনাথ শিরোমণির) দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাকাটোলের অধ্যাপক ৺প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের তিরোভাবের পর ইনি কয়েক বৎসর পাকাটোলে অধ্যাপনা করেন। অকৃতদার, এখন হরিদ্বারে বাস করিতেছেন। ইঁহার নাম রামকৃষ্ণ তর্কশাস্ত্রী। পাকাটোলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিদ্যার্থীই বাস করিতেন। আমাদের টোলের সীমানার পরই পাকাটোলের সীমানা, সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখদিকে থাকিয়াও আমরা ঐ টোলের [illegible] আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ [illegible] ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

দুইটী পেঠেলী ছিল (নবদ্বীপে ঝীকে পেঠেলী বলে)। ঐ দুই পেঠেলী মহাপ্রভাবা এবং ছাত্রগণের একপ্রকার পরিচালিকা। ইহাদের দু'জনের নামই শশিমুখী। একটী বয়স্থা ও একটী প্রৌঢ়া। বয়স্থা ছোট শশী ও প্রৌঢ়া বড় শশী নামে প্রসিদ্ধা ছিল। ইহারা দু'জনেই সৎস্বভাবা, চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, উহারা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ছাত্রদের পরিচর্য্যা করিত। ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থগুলির নাম জানিত, ছাত্রেরা চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপকের নিকট পড়িতেছে, এমন সময় কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হইলে ছাত্রের গৃহ হইতে তাহা আনিয়া দিত। তৈলঙ্গী, তামিল, মহারাষ্ট্র ছাত্র আসিলে ঐ দেশীয় অন্য ছাত্রের অনুপস্থিতিতে উহারাই তাহাদের ভাষা বুঝিয়া সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিত। আমাদের চতুষ্পাঠীর বৃদ্ধা পেঠেলীর সে কৃতিত্ব ছিল না। একবার আমাদের চতুষ্পাঠীতে দক্ষিণভারতের সুদূর প্রদেশ হইতে একটী বিদ্যার্থী ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত আগমন করেন। প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সংস্কৃতভাষায় সকল কথা হইল। গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াই ছাত্রটী বলিলেন "সখি মাডবি আড়া" পেঠেলী কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা বলিলাম "কিং প্রার্থয়তে ভবান্? ইয়ং বরাকী তব উপলব্ধুং শক্নোতি।" তাহার পর, তিনি হাসিয়া বলিলেন—মহ্যম্ অঙ্গারং দেহি।" শেষে পেঠেলী বুঝিতে পারিয়া উনুন ধরাইয়া দিল। পাকাটোলের পেঠেলীরা হইলে ঐ ছাত্রটীর জন্য আমাদিগকে কিছুই বলিতে হইত না। দূরদেশ হইতে যে সকল বিদ্যার্থী নবদ্বীপে আসিতেন, তাঁহারা এক

প্রকার জ্ঞানযোগী, অনেক সময় তাঁহারা শাস্ত্র চর্চ্চায় নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। একদিন পাকাটোলের ছাত্রেরা হাত মুখ ধুইতে পলতায় (আদি গঙ্গার খাতে) গিয়াছে, দুইজন জিগীষু ছাত্রের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছে। দুইজনে দুই নিশিন্দ্যার ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া বাঁধের উপরে দাঁতন করিতে করিতে ন্যায়শাস্ত্রের কোন পূর্ব্বপক্ষ সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে বসিয়া গিয়াছেন। এদিকে বেলা দশটা বাজে অধ্যাপক 'গৃহগমনোন্মুখ,' বড় শশী (পেঠেলী) খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া ধমক দিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। আবার অন্য-দিন গঙ্গাস্নান করিয়া একদল পাকাটোলের মৈথিল বিদ্যার্থী টোলে ফিরিতেছেন, ৺ভুবন-মোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলের একদল মৈথিল ছাত্র স্নানে যাইতেছে। পোড়ামা তলায় উভয়দলের যেই সাক্ষাৎ হওয়া অমনি তর্ক আরম্ভ, পূর্ব্বোক্ত দলের পশ্চাৎ একটী মুটে ছিল, তাহার মাথায় একধামা আম ও তাল। ছাত্রগণ তর্ক করিতেছেন, তাঁহাদের মাথা ঘুরিতেছে, টিকী দুলিতেছে, মুটে হাঁ করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া আছে। এদিকে পোড়ামাতলার বটের গাছের ডাল হইতে একটী ছোট বানর একটী একটী করিয়া আম ও তাল তুলিয়া লইতেছে, হাতে হাতে আম ও তাল বৃক্ষময় বানর-সম্প্রদায়ের মধ্যে চালান হইতেছে। ছোট শশী গঙ্গাজল লইয়া যখন সেখানে উপস্থিত, তখন শেষ আমটী বানর শিশু কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। সে চেঁচিয়ে বলিল "তোমরা এখানে ঘটাকাশ, পটাকাশ কচ্ছো, এদিকে তোমাদের পিণ্ডী যে বানরে গেলছে।" তখন সকলে ধামার মধ্যে ফলের অত্যন্তাভাব লক্ষ্য করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আবার ছোটশশী পোড়ামা-কোঠায় গঙ্গাজলের কলসী রাখিয়া মুটে সঙ্গে করিয়া আম ও তাল কিনিতে গেল। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই হইত।

আমাদের চতুষ্পাঠী বুড়া শিবতলা সরকের দক্ষিণ পার্শ্বে, উহার ঠিক উত্তর পার্শ্বেই স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের টোল। ঐ টোলে বাঙ্গালী ছাত্র ছিল না, অধিকাংশ মৈথিল, দুই একটী উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছাত্র ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটী তরুণবয়স্ক দণ্ডী ঐ টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সম্পন্ন লোকের সন্তান, উপনয়নের পর স্বেচ্ছায় দণ্ড ত্যাগ করেন। যেমন সুন্দর সুগঠিত দেহ, তেমনি প্রতিভাবান্। তিনি আমাদের টোলে ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের নিকট বিকালে কুসুমাঞ্জলি পড়িতে আসিতেন। তাঁহার প্রতিমাসেই বাটী হইতে মণি-অর্ডার আসিত, গরদের কাপড় গিরিমাটী দিয়া ছুপাইয়া পরিতেন। দণ্ডীদের অগ্নিস্পর্শ করা নিষেধ, সুতরাং রাম-সীতার বাটীতে মাসিক আট টাকা দিয়া হিন্দুস্থানী পাচকের হস্তে এক বেলা চর্ব্ব্যচুষ্য আহার করিতেন এবং ফলমূল মিষ্টান্ন দুগ্ধে রাত্রের ব্যাপার সমাপ্ত হইত। দণ্ডী প্রাতঃ-কালে মুখ ধুইয়াই সেই সময়ের দোয়া ঈষদুষ্ণ একসের দুগ্ধের মধ্যে এক ছটাক ঘৃত মিশাইয়া পান করিতেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর ন্যায় বল ছিল। ঐ দণ্ডীর নাম সোমেশ্বরানন্দ, সোমেশ্বরানন্দ গৃহত্যাগী দণ্ডী অথচ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়মাসে বিকালবেলা আকাশে মেঘ উদিত হইলেই আকাশের দিকে তাকাইয়া

অতি মধুর স্বরে মেঘদূতের নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিতেন।

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥"

আমরা তাঁহার জীবনের রহস্য কিছু বুঝিতে পারিতাম না। তখনও নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় প্রায়ই দল বাঁধিয়া যাইতে হইত, প্রায়ই পথের মধ্যে কি গঙ্গার ঘাটে তর্ক-বিতর্ক হইত। সায়ংকালে গঙ্গাতীরে যাইবার সময়ও ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হইত।

প্রতিপদ্, চতুর্থীর রাত্রি, অষ্টমী, ত্রয়োদশীর রাত্রি প্রভৃতি অনধ্যায় কালে আমরা বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃতানুবাদ ও সংস্কৃত কবিতা রচনার চেষ্টা করিতাম। কোন কোন দিন অন্য টোল হইতেও অধিকবয়স্ক ছাত্রেরা আসিয়া আমাদিগকে উদ্ভট কবিতা শুনাইতেন। আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে সময়ে নবদ্বীপের প্রধান কবি। আমরা তাঁহার রচিত কবিতারও আলোচনা করিতাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত উদারচরিত ছিলেন, তিনি যেমন দয়ালু তেমনি নির্লোভ, লোকে তাঁহাকে একটু ক্রোধী বলিত, কিন্তু অতটুকু ক্রোধ না থাকিলে লোকে গ্রাহ্য করিবে কেন? তাঁহার যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য ছিল, তিনি চতুষ্পাঠীতে পদার্পণ করিলেই সেই ছাত্র-কলরবে মুখরিত চতুষ্পাঠী যেন "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" হইত। নবদ্বীপের সকল ছাত্রই গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইতেন। এতদ্ভিন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গরিব ছাত্রদিগকে বৃত্তি ব্যতীত মাসিক দুইএক টাকা বাঁধিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু সে ক্রোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। আমরা দেখিয়াছি তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইলেও, তিনবার কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেই তাঁহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত হইত। একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পড়াইয়া কেবল বাটী যাইবেন এমন সময় চাউল বোঝাই গরুর গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া টোলের কঞ্চির বেড়ার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। সংবাদ পাইবা মাত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া আনালেন। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই গাড়োয়ানের প্রাণ উড়িয়া গেল সে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে একবার হাত উঁচু করিয়া মারিতে যান আবার পিছাইয়া আসেন, এইরূপ বার তিনেক করিয়া তাহার পর ফুলের সাজি বেলতলায় রাখিয়া আবার কি মনে হইল, হাত উঁচু করিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহার পর একবার কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেন। আবার বকিতে বকিতে কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেন। তখন ছাত্রেরা চুপে চুপে বলিতে লাগিল, আর একটীবার কাছা ঝাড়িলেই বেচারা নিস্তার পায়। সত্য সত্যই আর একবার কাছা ঝাড়িয়া যখন কাছা দিলেন, তখন তাঁহার পুনরায় পূর্ব্ববৎ সৌম্যভাব লক্ষিত হইল, বলিলেন "যা বেটা যা আর কখনও বেড়া ভাঙ্গিস না, সকালে কিছু খেয়েছিস্?" গাড়োয়ান বলিল "ঠাকুর মশাই খাব কি? শেষরেতে গাড়ী ছেড়েছি, নদের বাজারে যাব, চাউল বেচব তবে তো পয়সা পাব।" ঐ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ট্যাঁক থেকে তিনটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "যা মুড়ি মুড়কী কিনে খাগে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, তাঁহার পু· মথুরায় আ: সার্জ্জন ডাক্তার ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাঁহার প্রেরিত অর্থও না কি গ্রহণ করিতেন না। গুরুদেবের উপদেশ ও শাসনগুণে ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক পবিত্রতার তিলমাত্র হানি নাই আমরা জীবনের প্রথম অংশ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সকলেই সুস্থ দেহে অতি আনন্দে ছিলাম। ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর হিংসাদ্বেষ তিলমাত্র ছিল না, সকলেই পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

বৈদিক সাধনার আভাস

এইরূপে ঋষি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে প্রথমে অব্যক্ত সৃষ্টির পরে ভোক্তৃ-ভোগ্যসৃষ্টির স্থূলবিবরণ দিয়া সর্ব্ববিশ্বের অধ্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ এক ঈশ্বরের অঙ্গীকার করিলেন। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তথাপি প্রলয়কালে তাঁহার যে নির্গুণ অবস্থা যে অবস্থায় গুণময়ী প্রকৃতি অভিন্নরূপে তাঁহাতে অবস্থিতা ও নিষ্ক্রিয়া, সেই অবস্থা হইতে একেবারে গুণময় জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জন্যই সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম স্তরে বিশ্বজননী তাঁহার গুণের লীলা প্রকটিত করিবার জন্য ব্রহ্ম হইতে যেন একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। "যেন" বলিবার কারণ এই যে এই সরিয়া দাঁড়ান যথার্থ সরিয়া দাঁড়ান নহে। দ্বৈতদৃষ্টি অজ্ঞানের দৃষ্টিমাত্র, অনির্ব্বচনীয় অথচ মিথ্যা কর্ম্মসংস্কারের মিথ্যা ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরন্তু দ্বৈতজগতে এই দ্বৈতভাব সম্পূর্ণ সত্য। কর্ম্মসংস্কারবদ্ধ জীবের পক্ষে দ্বৈতভাবের অস্বীকার করিতে যাওয়া আর মাত্রাস্পর্শের অধীন ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকে জগদ্ব্যাপী তেজঃপদার্থমাত্র বলিয়া তাহাতে হস্তপ্রবেশ করান সমান কথা। সৃষ্টিলীলা দ্বৈতলীলা, সুতরাং সৃষ্টির কথা বলিতে গেলে দ্বৈতভাবেরই ব্যাখ্যান করিতে হয়। এই জন্য ঋষি সৃষ্টিসৃক্তি অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিয়াও, জগতের অধ্যক্ষের অর্থাৎ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের অবতারণা করিয়াছেন। গুণ অবচ্ছেদক, সুতরাং সগুণ ঈশ্বর অবচ্ছিন্ন, শরীরী। সাধারণ জীব যেমন স্থূলদেহে অধিষ্ঠিত, তিনি তেমনি ব্যোমদেহে অধিষ্ঠিত।

৪র্থ ঋকে যে মূলপ্রকৃতিকে অসৎ বলা হইয়াছে, সেই মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্তকেই ৭ম ঋকে ব্যোম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "অব্যক্তং অব্যাকৃতাকাশাদি-নামবাচ্যং" (শঙ্করভাষ্য—কঠ ৩।১১)। অর্থাৎ অব্যক্তকে অব্যাকৃত, আকাশ প্রভৃতি নামে

অভিহিত করা হয়। পুরুষসূক্তে (ঋ-স ১০।৯০) ইহাকে বিরাট্ বলা হইয়াছে। এই বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডদেহকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ, অর্থাৎ পরমাত্মা, সগুণ ঈশ্বররূপে জাত হন (ঋ-স ১০।৯০।৫)। প্রজাপতিসূক্তে আবার (১০।১২১) এই বিরাড্‌দেহাভিমানী পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে। বিরাট পুরুষের অণ্ডস্বরূপ কারণ যেরূপ অণ্ডের মধ্যে জীবের উৎপত্তি হয়, তেমনি বিরাটের মধ্যে নিখিল জগতের উৎপত্তি হয়। বিরাট হিরণ্ময়, কারণ উহা প্রকাশস্বভাব। অতএব বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। এই বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভই জগতের স্রষ্টা এবং তিনিই প্রজাপতি অর্থাৎ জগতের অধ্যক্ষ; মায়াবেষ্টিত হইলেও তিনি মায়ার অধীন নহেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। প্রজাপতিসূক্তে বৈদিক ঋষি ইঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন। প্রজাপতি সূক্ত বা ক-সূক্ত:—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ
পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা
জগতো বভূব ॥
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ
স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ
দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভৈক্ষেতাং
মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥
আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা
জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা
জনয়ন্তীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা
দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি
পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম
পতয়ো রয়ীণাং ॥ ১০ ॥"

ঋ—স ১০।১২১

ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্য্য—

১। অগ্রে হিরণ্যগর্ভ জাত হন। জাত হইয়া তিনি ভৌতিক জগতের এক (অদ্বিতীয়) পতি অর্থাৎ ঈশ্বর হন। তিনি এই পৃথিবী

ও দ্যুলোক ধারণ করেন। কঃ দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যক্তরূপ হিরণ্ময় অণ্ডের গর্ভে দেব প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হন, সুতরাং হিরণ্যগর্ভের জন্ম হয় এ কথা নিরর্থক। ফলতঃ বিয়দাদি উপাধি সকলের উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহারা যাহার উপাধি তাঁহাতে এই উৎপত্তির অধ্যাস হইয়াছে।

প্রলয়ান্তে পরব্রহ্মের তপঃ হইতে বিয়দাদি ভূত সকলের সৃষ্টির পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব হয়। এই কথাও কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত" (কঠ ২।১।৬)।

কঃ, কিম্ শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচন। নিখিল জগতের ঈশ্বরের স্বরূপ মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে অনির্দ্দেশ্য বলিয়া তাঁহাকে ঋষি কঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ঋকে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ জগতের অদ্বিতীয় পতি বা ঈশ্বর ও ধারক।

২। যিনি আত্মা দান করেন ও বল দান করেন; যাঁহার প্রকৃষ্ট শাসন সকলে ভজনা করে, এমন কি দেবগণও ভজনা করেন; অমৃতত্ব যাঁহার ছায়া ও মৃত্যুও যাঁহার ছায়া সেই ক-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই দেব প্রজাপতি হইতে আত্মা সকল আবির্ভূত হয় যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল আবির্ভূত হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই জন্য ইঁহাকে সূত্রাত্মা বলা হইয়াছেন। ইঁহার শাসন অনুসারে সমগ্র বিশ্ব শাসিত হয়। "একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" (কঠ—২।২।১২)—এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর নিখিল জগতের শাসক ও সর্ব্বভূতের অন্তঃস্থিত আত্মা; তিনি এক হইয়াও আপনাকে বহু করেন। মৃত্যু ও অমৃতত্ব তাঁহার ছায়া, অর্থাৎ তিনি জীবের কর্ম্মফলদাতা। এই ঋকে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা নিখিল বিশ্বের শাসক ও কর্ম্মফলদাতা।

৩। যিনি মাহাত্ম্যহেতু প্রাণনক্রিয়াশীল ও নিমেষবিশিষ্ট জগতের এক অদ্বিতীয় রাজা; যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদবিশিষ্ট এই প্রাণিজগতের শাসক সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভদেবের শাসকত্ব বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। তিনি নিখিল প্রাণিজগতের রাজা।

৪। এই সকল হিমবান্ (পর্ব্বত) যাঁহার এবং নদীর সহিত সমুদ্র যাহার মাহাত্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং এই দিক্‌সকল যাঁহার বাহু সেই কঃ—দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—হিমবান্ পর্ব্বত ও নদী সহিত সমুদ্র দ্বারা সমগ্র জড়জগৎ উপলক্ষিত হইতেছে। ৩য় ঋকে প্রাণিজগতের কথা বলা হইয়াছে। এই ঋকে জড়জগতের কথা হইতেছে। কি প্রাণিজগৎ কি জড়জগৎ সকলেই তাঁহার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতেছে, কারণ তিনি তাহাদিগের স্রষ্টা এবং তাহারা তদ্রূপে অবস্থিত। শুধু তাহাই নহে, এমন কি শূন্যরূপী দিক্‌সকল তাঁহার বাহুস্বরূপ। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের বিরাটত্ব উক্ত হইল।

৫। যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ ও

পৃথিবী দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা সূর্য্য (স্বস্থানে, স্থানভ্রষ্ট না হয় এরূপভাবে) স্তব্ধীকৃত হইয়াছে; যিনি অন্তরীক্ষে রজের অর্থাৎ উদকের নির্মাতা, সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—হিরণ্যগর্ভ যে শুধু জগৎকে সৃষ্টি, ধারণ ও শাসন করেন তাহা নহে। যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জগৎ রক্ষিত হয়, তিনি সেই সকল নিয়মেরও বিধান করেন। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভকে জগতের রক্ষক বলা হইল।

৬। দীপ্তিশালিনী দ্যাবাপৃথিবী লোকরক্ষার্থ লব্ধস্থৈর্য্য হইয়া যাঁহাকে মনদ্বারা (আমাদের মহত্ত্বের ইনিই কারণ এইরূপ চিন্তা করিয়া) দর্শন করে; যাঁহাকে আধাররূপে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য উদিত হন ও আলোক বিস্তার করেন সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভকে ভূলোক ও দ্যুলোকের উপাস্য ও সূর্য্য প্রভৃতির আধার বলা হইয়াছে।

৭। মহতী, অগ্নির জনয়ন্তী অপ্ সকল যে গর্ভকে ধারণ করিয়া বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন সেই গর্ভ হইতে দেবগণের এক প্রাণ আবির্ভূত হয়। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—অপ্ শব্দে এখানে অব্যক্ত বা বিরাট বুঝিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রে ইহাকেই কারণ-বারি বলা হইয়াছে। এই অপ্ হইতে অগ্নি প্রভৃতি ভূতসকল উৎপন্ন হয়। ইহা প্রজাপতির শরীর। "বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন" এই কথা দ্বারা অপের বিরাটত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। পুরুষ প্রজাপতিরূপে ইঁহার গর্ভে অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি হইতে দেবগণের এক প্রাণের উৎপত্তি হয়। এক প্রাণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জগতে প্রাণপদার্থ এক। বিরাড্দেহী প্রজাপতির দেহে এক বিরাট প্রাণের আবির্ভাব হইল। এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়া দেবগণের উৎপত্তি হইল। কঠোপনিষদে এই কথাই উক্ত হইয়াছে!—

"যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী" (কঠ ২।১।৭) অর্থাৎ যে সর্ব্বদেবাত্মিকা অদিতি বা মূলপ্রকৃতি প্রাণরূপে আবির্ভূতা হন। পুনশ্চ, 'যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন" (কঠ ২।১।৯), অর্থাৎ যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হন ও যাহাতে অস্ত যান সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ অবস্থিত ইত্যাদি। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের বিরাড়ধিষ্ঠাতৃত্ব ও তাঁহা হইতে প্রাণের উৎপত্তি ও প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।

৮। যজ্ঞের জনয়ন্তী, দক্ষের ধারয়িত্রী অপ্ সকলকে যিনি মহিমাদ্বারা সম্যক্ দর্শন করেন, যিনি দেবগণের উপরে এক অদ্বিতীয় দেব, সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—বেদে জগৎ বা বিকারোৎপন্ন বিশ্ব যজ্ঞরূপে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে পুরুষসূক্ত (১০।৯০) ও সৃষ্টিসূক্ত (১০।১৩০) দ্রষ্টব্য। এই জগদ্রূপী যজ্ঞ অপ্ অর্থাৎ অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। দক্ষ প্রজাপতি। অপ্ তাঁহার ধারয়িত্রী অর্থাৎ

তাঁহার শরীর। প্রজাপতির শরীরভূত যে অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি। প্রজাপতি এই শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত দর্শন করেন। তিনি জগতের দ্রষ্টা, সাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞ। তিনি দেবগণেরও ঈশ্বর ও অদ্বিতীয়। এই ঋকে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব ও হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ঈশ্বরের সর্ব্বসাক্ষিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব উক্ত হইয়াছে।

৯। যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, সত্যধর্ম্মা যিনি দ্যুলোকের দ্রষ্টা, এবং যিনি মহতী উদক সকলের স্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের সর্ব্ব-স্রষ্টৃত্ব ও হিংসকত্ব বা বিনাশকত্ব উক্ত হইয়াছে।

১০। হে প্রজাপতি, তোমা ভিন্ন কেহ বর্ত্তমান সমস্ত বিশ্ব জানে না কিংবা তোমা ভিন্ন কেহ সর্ববিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে না। আমরা যে সকল কামনা করিয়া তোমাকে হবির্দান করিতেছি, আমাদিগের সেই সকল কামনা পূর্ণ হউক। আমরা যেন ধন সকলের পতি হইতে পারি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বাভীষ্টদাতৃত্ব উক্ত হইয়াছে।

সগুণ ঈশ্বরের যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, ঋষি তাহা এক এক করিয়া প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভে স্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহার বিরাট্ দেহে বিশ্বকে ধারণ করেন এবং সর্ব্বঘটে আত্মারূপে প্রকাশিত হন। তিনি জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা। নিখিল বিশ্বের তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি মায়াশরীরী হইলেও মায়ার অধীন নহেন,—তাঁহার দৃষ্টি অবিতথ, অপ্রতিহত। তিনি সত্যধর্ম্মা ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব কেহ জানে না, সুতরাং পূর্ব্বসূক্তে (১০।১২০।৭) যে জ্ঞাতা অধ্যক্ষের কথা ঋষি বলিয়াছেন এই প্রজাপতিই সেই অধ্যক্ষ। তাঁহা হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, যে প্রাণকে অবলম্বন করিয়া দেবগণ অবস্থান করেন। তিনি জীবের কর্ম্মফলদাতা। মৃত্যু ও অমৃত্যু উভয়েই ছায়ারূপে তাঁহার অনুগমন করে—উৎপত্তি ও বিনাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি দ্বন্দের তিনি অতীত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের যে নির্ণয় আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বেদের অনুগামী। যোগিগণ যে "ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ" (পাতঞ্জল দর্শন ১।২৪) ঈশ্বরের ধ্যান করেন বৈদিক ঋষিও সেই ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। এই ঈশ্বর বেদান্তের প্রত্যগাত্মা, সূত্রাত্মা, আনন্দময়। প্রকৃতিবিকার সুখ দুঃখ মোহের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের নাম আনন্দ। প্রজাপতি ঈশ্বর প্রকৃতির অধীন নহেন, সুতরাং আনন্দময়। "আত্মানন্দময়ঃ" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৫)।

(ক্রমশ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

বাঙ্গালা মাসিকপত্র

বোধ হয় লেখক ও পাঠকের তুলনায় বাঙ্গালা মাসিকপত্র অধিক হইয়াছে। ইহাতে দেশের শুভাশুভ বিচার না করিয়া পাঠকের পক্ষ হইতে দুই চারি কথা লিখিতেছি।

নির্ম্মাতা, বিক্রেতা ও ক্রেতা এই তিনের যোগে যেমন হাট; লেখক, সম্পাদক ও পাঠক এই তিনের সহকারিতায় তেমন মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা। ক্রেতা দেখিলে বিক্রেতা উপস্থিত হয়, বিক্রেতা নানা স্থানের নির্ম্মাতার উৎপন্ন দ্রব্যাদি একত্র করে। তবে আগে ক্রেতা, পরে অন্য দুই। কদাচিৎ নির্ম্মাতার উদয় আগে হয়, কদাচিৎ নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা একযোগে ক্রেতার উৎপত্তি করে।

জ্ঞানদান ও আনন্দদান মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য। জ্ঞানের সহিত আনন্দ জড়িত। জ্ঞানার্জ্জনের ফল আনন্দ,—যদি আবশ্যক জ্ঞান পাই, যদি অর্জ্জনে কষ্ট না হয়। সকলের অর্জ্জনের শক্তি এক নহে, সকলের জ্ঞানের প্রয়োজনও এক নহে। সে যখন দু'য়ের নানা ভেদ আছে, তখন মাসিকপত্রেরও নানা ভেদ থাকিতে পারে। যদি বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞান নামে জ্ঞানের দুই ভাগ করি, তবে মাসিকপত্রেরও দুই ভাগ করিতে পারি। কেহ ধর্ম্মের, দর্শনের, বিজ্ঞানের, এমন কি বাঙ্গালা ভাষার, দুরূহ তত্ত্ব জানিতে প্রয়াসী; তিনি সেই সেই বিষয়ের বিশেষ মাসিকপত্র পড়িতে ইচ্ছা করিবেন। কেহ অল্পায়াসে অথবা বিনা আয়াসে নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাধারণ মাসিকপত্রের গ্রাহক হইবেন। এইরূপ, পাঠকভেদে মাসিকপত্রের ভেদ অবশ্য ঘটিবে।

বিলাতে এইরূপ নানাশ্রেণীর মাসিকপত্র আছে। এদেশে দুই চারিটা ছাড়া আর সব এক শ্রেণীর বোধ হয় পাঠকের অভাবে বিশেষ মাসিকপত্রের অভাব। আরও বোধ হয় লেখকের অভাবে অথবা লেখার দোষে পাঠক হয় না। সমব্যবসায়ীর মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান নিমিত্ত ব্যবসায়সম্বন্ধীয় পত্রের জন্ম হয়; ইহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রদানের গুণে অন্যে সে ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয়। বাণিজ্যের মূলসূত্র একটা এই যে, পণ্য যাহা হউক, যেমন হউক, গ্রাহক আছে। বুদ্ধিমান বণিক গ্রাহক অন্বেষণ করে, পণ্যবিক্রয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে।

আমি হাটে বাজারে ব্যাপার করার সহিত মাসিকপত্র-চালনার তুলনা করিতেছি, ইহাতে হয় ত কোন কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক রুষ্ট হইবেন। তিনি হয় ত মনে করেন তিনি সাহিত্যসেবা করিতেছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কামনা করিয়া ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতেছেন। এক এক মাসিকপত্রের জন্মকালে প্রথমপত্রে এই ভাবের সূচনা থাকে। পড়িলে মনে হয়, দেশের কেবল কল্যাণ-কামনায় সম্পাদক মহাশয় অসম সাহসে দারুণ বোঝা ঘাড়ে লইতেছেন। দুষ্টলোকে বলে সম্পাদক সাজিবার সাধও একটা আছে, সাহিত্যসেবী নামে পরিচিত হইবার বাসনাও অল্প নহে।

অনেক দিনের একটা কথা বলি। এক পণ্ডিত দেখিলেন, সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে তেমন সমাদর পাওয়া যায় না, কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রচার হইতে পারে। তিনি সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে চমৎকার বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। বোধ হয় কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, দেশেরও হিত হইতে পারিত। কিন্তু জানি না, তাঁহাকে কি কারণে দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার অভাব রূপ 'ভূতে' পাইয়া বসিল। তিনি বিজ্ঞানের 'বি' জানিতেন না কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পাদক হইলেন। লেখক জোটাইলেন কলেজের পড়ুয়া। ইংরেজী বহির তর্জ্জমা করিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রবন্ধ যোগাইতে লাগিলেন। আজিকালি কলেজের ছাত্র বাঙ্গালা ভাষা কিছু কিছু শিখিতেছেন। সে কালে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষণীয় ছিল না। দুই এক জনমাত্র সহজ শুদ্ধ ভাষা লিখিতে পারিতেন। অধিকাংশ যাহা লিখিতেন তাহা অপাঠ্য হইত। সম্পাদক মহাশয় সে ভাষা যথাসাধ্য শোধিত করিয়া লইতেন কিন্তু সব দোষ সারিতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলে এবং বাঙ্গালা ভাষায় চিন্তা করিবার সুযোগ পাইলে যে সহজ ভাষ বাহির হয়, আঁধারে হাতড়াইলে সে ভাষা আসে না। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যোগাইতে লেখক ও সম্পাদক ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। এই হেতু ইংরেজী অক্ষরে ছাপা ইংরেজী শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সন্ধি সমাস চালাইতে হইল। যেন সে বিষয়টা জানিবার জন্য দেশের পাঠক উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন, না জানিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইত। এমন কিম্ভূত-কিমাকার পত্রেরও গ্রাহক জুটিল, দেশে নূতন উদ্যম বলিয়া বিজ্ঞজন ক্ষমাগুণে পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তথাপি পত্রের আয়ু ফুরাইয়া আসিল. লেখক জুটিল না।

এখনও এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক জনেরও হিত হইলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করেন। এ স্থলে তাঁহার দেশহিতৈষণার প্রশংসা করি, কিন্তু পরিশ্রম, সময় ও অর্থের অপব্যয়ে দুঃখও হয়।

বস্তুতঃ বিনা উদ্দেশ্যে কাজ হয় না। জানি না, কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ মাসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে। যদি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিতে পারি যে অপর সহস্র পণ্যের ন্যায় মাসিকপত্রকেও পণ্য স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে লেখক ও পাঠকের এবং সে সঙ্গে সম্পাদকের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। নূতন মাসিকপত্রের গৌরচন্দ্রিকায় আসল কথাটা প্রায়ই চাপা থাকে সাহিত্য-সেবার এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির যথাসাধ্য প্রয়াসী দেখিলে প্রথমে জানিতে ইচ্ছা হয় তুমি কে, তোমার কি যোগ্যতা আছে। কেহ কেহ যোগ্যতা বলিতে চান না, ক্রমে ফল দেখিয়া পরিচয় লইতে বলেন। কেহ কবি ছিলেন, অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎকালের মাসিকপত্রের সম্পাদক সে কবিতা অগ্রাহ্য করিতেন, প্রকাশের অযোগ্য মনে করিতেন। রোষে ও ক্ষোভে কবি স্বয়ং এক মাসিকপত্র প্রকাশে উদ্‌যোগী হইলেন, সম্পাদক হইয়া মনের সুখে নিজের ও বন্ধুজনের কবিতা একটা দুইটা তিনটা

করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল পদ্য ছাপাইলে মাসিকপত্র চলে না, গদ্যও প্রকাশিত হইতে লাগিল। গল্প যখন গদ্যে রচিত হয়, এবং গল্পের দৈর্ঘ্য যখন নির্দ্দিষ্ট নাই, তখন সুকুমার সাহিত্যের সেবা দিন কতক বেশ চলিয়াছিল।

গল্পলিখন-প্রবৃত্তির তাড়নাতেও দুই এক মাসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে। যে সে গল্প যখন মাসিক পত্রের সম্পাদক ছাপাইলেন না গল্প লেখক প্রতিজ্ঞা করিলেন স্বয়ং মাসিকপত্র সম্পাদন করিবেন। জনক বন্ধুবর্গ একত্র হইলেন, নূতন মাসিকপত্রের জন্ম হইল। পূর্ব্বে বাঙ্গালী শুধুই বকে বলিয়া একটা দুর্নাম ছিল; এখন বাঙ্গালী কিন্তু লিখিয়া বকিতে শিখিয়াছে। সব মাসিকপত্র দেখার ভাগ্য হয় নাই, কিন্তু যত দেখিয়াছি, গল্প নাই এমন সাধারণ মাসিক পত্র দেখি নাই। পত্রাঙ্ক অল্প হউক, পত্রের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, গল্প চাই। দেশে এত গল্পও ছিল!

গল্পের মতন গল্প পাইলে পাঠকের অসন্তোষের কারণ থাকিত না; নিজ-ব্যবসায়-কর্ম্মে ক্লান্ত মন গল্প পড়িয়া শ্রান্তি বোধ করিত। কিন্তু যে দেশে কথা ও গল্প, কথা ও কাহিনী, কথা ও উপন্যাস, কথা ও বাক্য, কথা ও বার্ত্তা একার্থবাচী হইয়াছে, সেদেশে মাসিকপত্রের গল্পের প্রকৃতি নিরূপণ করা দুরূহ। গল্প শব্দের বৃথা আড়ম্বরে নহে, কাহিনীর দৈর্ঘ্যেও নহে। অথচ ভাষার শব্দের গুণেও গল্প মনোহারী হইতে পারে। বস্তুতঃ আমরা যেমন মল্লকে তাহার যষ্টি সঞ্চালন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হই, লেখককে শব্দ লইয়া লীলা করিতে দেখিলেও বিস্মিত হই। আখ্যায়িকা গল্প নহে, অথচ আখ্যায়িকা থাকিলেও গল্প হইতে পারে। বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশও গল্প নহে, কিন্তু তেমন স্থানে সমাবেশই গল্পের প্রাণ হইতে পারে। কিসে গল্প সার্থক হয়, সরস হয় তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু জানি, নবক-নবতীর প্রেমাভিনয়, মানাভিমান ঈর্ষ দ্বেষ, অতৃপ্ত বাসনা প্রভৃতি না থাকিলেও চমৎকার গল্প হইতে পারে। একপ গল্প বাঙ্গালা ভাষায় রচিতও হইয়াছে। অবশ্য দুর্লভ হইয়া আছে। কারণ কবিত্বকলার ন্যায় গল্পরচনাও কলা বিশেষ। অল্প কথায় গল্পের নায়ক নায়িকার মনের একটা ভাব যিনি প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার আদর হইবেই।

ক্রেতার রুচি অনুসারে বিক্রেয় পণ্য উৎপন্ন হয়। গল্পের বাজারেও যদি এই নিয়ম থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালী পাঠকের কলাজ্ঞান মার্জিত হয় নাই। লব্ধ পণ্য অনুসারেও ক্রেতার রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যদি সম্পাদক মহাশয় কলার আদর্শ উচ্চে ধরিয়া রাখেন, তাঁহার পত্রের পাঠকেরও আদর্শ উচ্চ হইতে থাকিবে। আমি যে যাবতীয় মাসিকপত্রের গল্প সবই পড়িয়াছি এমন নহে। কিন্তু নূতন মাসিকপত্র পাইবামাত্র তাহার সূচীপত্রে চোখ বুলাইয়া দেখি, গল্প কবিতার দুই এক ছত্র পড়ি। ছেলে মেয়ে লইয়া কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, বিলাসবিভ্রমে 'চটুল' চাপল্যে দিনপাত হয় না। গল্প পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে, মাসিকপত্রে কবিতা পড়িয়া সে পত্র-প্রেরণ নিষেধ করিতে হইয়াছে। কেবল বর্ত্তমান লেখকের নহে, শুনিয়াছি আরও অনেক পাঠকের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। গল্প ও

কাব্যের নামে চিত্ত-বিক্ষেপের মাদকতায় হাব-ভাব-বিলাসের আলঙ্কারিক বর্ণনায় জীবন-যাত্রায় বিঘ্ন জন্মে।

আরও ভয়ানক হইয়াছে, বিজ্ঞাপন। ঔষধের বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতার প্রয়োজন থাকিতে পারেনা। কারণ রোগী রোগচিকিৎসা চায়, কুৎসিৎ রোগ লুকাইতে চায়; বাগী ঔষধ-বিক্রেতার নিকট রোগের নিদান বর্ণনা, চিত্রযোগে নিদান ও পরিণাম প্রদর্শন চায় কি? ভয় দেখাইয়া ঔষধবিক্রয় অসাধুতা। যাহা চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য, তাহা চিকিৎসাবিষয়ক মাসিকপত্রে গোপন সঙ্কেতে প্রকাশ কর। কেহ নিদান জানিতে চাহিলে তাহার নিকট বিজ্ঞাপন পাঠাইও। কিন্তু যে জানিতে চায় না, তাহার নিকট নির্লজ্জতার বিজ্ঞাপন প্রেরণ কেন? সুগন্ধি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনেও হত-ভাগ্য নির্লজ্জ বিক্রেতা বর্ণনার চটকে, পয়ারের জোরে, কুৎসিৎ নামকরণে গ্রাহক অন্বেষণ করিতেছে। যাহা বার-নারীর দ্বারেও উপস্থিত করিবার অযোগ্য, তাহা সরকারী ডাকের সাহায্যে ভদ্রপল্লীতে প্রেরণ করিতেছে।

মাসিকপত্রেও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বুঝি না, বিজ্ঞ সম্পাদক দোষ গুণ বিচার না করিয়া নিজের পত্রে যে সে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন কেন। যিনি পত্রের পৃষ্ঠা সুন্দর করিতে প্রয়াসী, যিনি প্রবন্ধগৌরবে নিজের পত্রের গুরুতাসম্পাদনে মনোযোগী, তিনি কেমন করিয়া পত্রের সঙ্গে কদাকার চিত্র এবং আকাশভেদী অতিশয়োক্তির বিজ্ঞাপনে শোভা কল্পনা করেন! চিত্রকলার নামে কাঠের পুতুলের কর্কশতা শোভা পায় কি? যিনি বিজ্ঞাপন দেন, তিনি কাঠের পুতুলও দেন; কিন্তু দেন বলিয়া নিজের কাগজে ছাপিতে হইবে কি?

পূর্ব্বে মাসিকপত্রে চিত্র থাকিত না। এখন প্রায় সকল পত্রে অন্ততঃ একটা দুইটা থাকে। কোন কোন সম্পাদক 'হাফটোন' চিত্র দিয়া, 'হাফটোন' চিত্রকে অপূর্ব্ব পদার্থ জ্ঞান করাইয়া পাঠক ভুলাইতে চান। কিন্তু এই ভারতবর্ষেও 'হাফটোন' চিত্র দুর্লভ কি? 'হাফটোন' নামের গুণ কিছুই নাই, চিত্রই আসল। তাহাও ব্লকের দোষে ছাপার দোষে শেষে কাঠের পুতুলে দাঁড়াইতে পারে। শিশু কাগজে কালী, লাল নীল রং মাথাইয়া মনে করে সুন্দর 'ছবি' করিয়াছে।

এদেশের চিত্রের রসগ্রহণ করিতে না কি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আবশ্যক। মানব-স্বভাবের উপরে উঠিয়া ছেলে ভুলানো হাত-পা-শূন্য কাঠের পুতুলে সৌন্দর্য্য দেখিতে হইবে। ঢাকের নাদে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তবে কি না যখন তখন যে-সে মানুষের কর্ণে সেটা হয় না। হয় না সত্য কথা। কেন হয় না, হওয়া উচিত, বলিলে পাঠক না-চার। তাই বলি, যদি রস গ্রহণই না হইল, তবে কষ্ট ও অর্থব্যয় কেন? ইহাতে শিল্পীর দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু জগতে দুঃখের কারণ অনেক আছে।

প্রবন্ধ নির্ব্বাচনেও অনেক সম্পাদক গুরু-লঘু জ্ঞানের অভাব দেখান। এই, দর্শনের কূটতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিভীষিকা, পাশেই তরল-মতির চাপল্য, পরে 'ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' (বস্তুতঃ বহু পৃষ্ঠা), সঙ্গে সঙ্গে বিল্বপুষ্করিণীর জলের অপচয়সংবাদ। প্রত্যেক পাঠক যে সব প্রবন্ধ পড়িবেন এমন কথা নাই। পাঠক

বিভিন্ন, প্রবন্ধও বিভিন্ন; তথাপি সাধারণ মাসিকপত্রে যাহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহাতে অধিকাংশ পাঠকের উপযোগী প্রবন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। লেখকবর্গ একটা কথা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়,—পুস্তকে যাহা চলে সাধারণ পাঠকের উপযোগী মাসিক-পত্রে তাহা প্রায়ই চলে না। গোড়া হইতে পড়িয়া গেলে হয় ত যাহা বোধগম্য হইবে, তাহার মাঝখান হইতে কিয়দংশ পৃথক্ করিয়া লইয়া পড়িলে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। এমন লিখিতে হইবে, যে, পাঠক সে বিষয় কিছু না জানিলেও তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন, আর যিনি জানেন, তিনিও সে বিষয়টা নূতন ধরণে দেখিতে পাইবেন। বিষয়বিশেষের পত্রে যাহা চলে, নানা বিষয়ের পত্রে তাহা না চলিবার কথা। প্রত্যেক প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইলে ভাল হয়; যদি এক প্রবন্ধে সম্পূর্ণ না হয়, দ্বিতীয় প্রবন্ধ এমন লিখিতে হইবে যেন তাহাই সম্পূর্ণ। অর্থাৎ একটা পড়িবার সময় অপরটাতে কি ছিল তাহা মনে রাখিতে না হয়। মাসিক-পত্রের প্রবন্ধের ইহাই বিশেষত্ব। একটা ভাব, একটা তত্ত্ব, একটা যা-কিছু, তাহা ধরিয়া রাখিতে হয়, ছাড়াইয়া গেলে পাঠকের ধৈর্য্য থাকে না। যদি উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি দীর্ঘ বিষয় মাসে মাসে প্রকাশ করিতে হয়, তবে প্রথমে কতদূর কি বলা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রবন্ধের আগে দেওয়া কর্ত্তব্য।

শুনিয়াছি, কলিকাতায় ভোজনের নিমন্ত্রণে ভোজন না করিলেও চলে, অন্নব্যঞ্জন পরিপূর্ণ পাত্র দৃষ্টি করিয়া আয়োজন উত্তম হইয়াছে বলিলে নিমন্ত্রণরক্ষা হয়, নিমন্ত্রণকর্ত্তাও কৃতার্থ হন। কিন্তু "উচ্চশ্রেণী"র এই সামাজিক ব্যবহার মধ্য ও নিম্নশ্রেণীতে পোষায় না। এই শ্রেণীর লোক ভোজনের নিমন্ত্রণে ভোজন করিতে চায়, দর্শনে কিংবা আঘ্রাণে তৃপ্ত হয় না। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পত্র বহুবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ করিয়া পাঠকের সমীপে প্রেরণ করিলেন, শাক হইতে মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত সবই উপস্থিত করিলেন, পাঠক উচ্চশ্রেণীর হইলে উত্তম হইয়াছে বলিয়া গাত্রোত্থান করেন, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর হইলে আসনে বসিয়া রীতিমত ভোজনে প্রবৃত্ত হন। সামাজিক ব্যবহারে অজ্ঞ বলিয়া কখন কখন মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলেন, এটা কাঁচা ওটা আলোনা। যেটায় দন্তস্ফুট না হয়, সেটায় কিন্তু নিজের দন্তের শিথিলতা কিংবা স্থূলতা অনুমান করেন। মানবচরিত্রের এ এক আশ্চর্য্য রহস্য! এই হেতু উৎকট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কঠিন শব্দরভাষা মাসিকপত্রে সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত প্রেরিত হইতেছে। জানি না, সম্পাদক মহাশয় পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন কি না,—আর কি চাই, ব্যঞ্জন উত্তম হইয়াছে ত? পাঠক নিমন্ত্রিত বটেন, কিন্তু মূল্য দিয়া ভোজ্য ক্রয় করেন, সম্পাদক মূল্য লইয়া ভোজ্য বিক্রয় করেন। কেহ কিছু দান করেন না, কেহ কিছু দান গ্রহণ করেন না। সুতরাং সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার সহানুভব থাকা স্বাভাবিক বোধ হয়। বিলাতে সাধারণ মাসিকপত্রের সম্পাদক পাঠককে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করেন, আর কি চাই, কেমন হইয়াছে। জিজ্ঞাসার নানা কৌশল

অবলম্বন করেন কখনও উন্নতর প্রস্তাব করিয়া অভিমত জানিতে চান, কখনও প্রস্তাব পাইবার নিমিত্ত পুরস্কার ঘোষণা করেন তিনি বুঝেন পুরাতন পাঠককে তুষ্ট রাখিলে ব্যবসায় স্থায়ী হয় পুরাতনের সাহায্যে নূতন পাঠক সংগৃহীত হয়। এদেশে নিঃসম্বলে মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে পারা যায়, সেদেশে মাসিকপত্র চালাইতে ধনাদির প্রয়োজন হয়। সেদিন দেখিতেছিলাম, বিলাতে মাসিকপত্রের এর একটা গল্প, দুই হাজার শব্দের গল্প– ৫০৲ টাকার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না। তাহাও প্রসিদ্ধ লেখকের নহে। চলনসই গল্প সহজে প্রশংসা করিবার বড় একটা কিছু থাকে না।

বিলাত ধনীর দেশ, কলা ও বিদ্যার দেশ। সে দেশের সহিত এদেশের তুলনা করা সাজে না। কিন্তু তুলনা হয় না বলিয়াই দেশের গণ্যমান্য পাঠক এদেশের মাসিকপত্রে পরিতোষ পান না। এমন পাঠকও আছেন যিনি ইংরেজী অক্ষরের মহিমায় মুগ্ধ হন, এবং এমন ইংরেজী গল্পও আছে যাহা পড়িতে আমাদের ভাল লাগে না সে সব বিষয় ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালাতে অনেক ভাল ভাল মাসিকপত্র ও ভাল ভাল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ইহা বলিতেই হইবে। প্রবন্ধ দেখাইয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব করিতে পারেন। সময়ে সময়ে যে ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা প্রবীণ সম্পাদকের অর্ব্বাচীন সহকারীর দোষে, কিম্বা অব্যবস্থার দোষে বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেক মাসিকপত্র অনেককাল চলিতেছে, সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকি কাজে পাকিয়াছেন। তবে, যেমন টক আম পাকিলেও টক থাকে, তেমন যিনি গোড়ায় কাচা ছিলেন, তাঁহার ভূয়োদর্শনে কাচার রং পাকার মতন হয় অন্য গুণ আসে না। পাকা ফুলে সাজি ভরানো সহজ, কিন্তু ফুল বাছা সহজ নহে।

বোধ হয়, এখন মাসিকপত্রের শ্রেণী বিভাগের সময় হইয়াছে। ইংরেজীতে Journal, Review, Magazine প্রভৃতি তিন শ্রেণীর মাসিক বা সাময়িক পত্র আছে। বাঙ্গালায় এইরূপ জাতিবাচক নামও হয় নাই, সব মাসিকপত্র, কোনটা বা মাসিক-পত্র ও সমালোচন। সাহিত্য। পরিষদের পত্রের নাম সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ইংরেজী Journal শব্দের অনুবাদ করিলে দিনিকা হয়। ইংরেজী Review শব্দের অনুবাদে সমালোচন অপেক্ষা সমীক্ষণা চলিতে পারে। ইংরেজী Magazine শব্দের মূলে আরবী, সে শব্দ আমাদের পরিচিত খাজনায় আছে। ইহার বাহ্যার্থ সঞ্চয়। বিশেষার্থে সঞ্চয়না বলা চলে। যে নামই হউক, প্রথম প্রথম নূতন ঠেকিবে। জাতি-বাচক নাম থাকিলে পাঠক নিজের আবশ্যক মাসিক-পত্র নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, সম্পাদকও নামের বাহিরে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। এখন কোন্ খানা কি তাহা সমস্ত পত্র না পড়িলে এবং দুই চারি মাস না পড়িলে বুঝিতে পারা যায় না। গল্প ও লঘু বিষয় না থাকিলে দুই একখানা সমীক্ষণা হইতে পারিত। ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক দুই একখানা সমীক্ষণা আছে। অধিকাংশ সঞ্চয়না। পত্রের সম্পাদক, এই নামও কি ভাল হইয়াছে? Secretary—সম্পাদক, Editor—সম্পাদক, Manager—কার্য্যাধ্যক্ষ। এই নামগুলা হইতে বুঝা যায়, ইহাদের কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট হয় নাই। এদেশের অন্যান্য প্রদেশে Editor সংশোধক নাম পাইয়াছেন। কমিটির Secretary আর আফিসের Manager কাজে প্রায় এক; সুতরাং ইহাদের নাম অধিকর্ম্মা থাকিলে মন্দ হইত না। আরও শব্দ আছে। মাসিকপত্রের ভাষায় দশম সংখ্যা

এখন অন্য দুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বোধ হয় চিত্রের স্থান করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন মাসিকপত্রকে প্রস্থে বড করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রস্থে বড হইলে ছয় মাসের কি বার মাসের অঙ্কগুলা একত্র একত্র বাঁধিলে পাটা হইতে পাতাগুলা ঝুলিয়া পড়ে ফলে ক্রমশঃ আলগা হইয়া খসিতে থাকে। বোধ হয়, ছাপার সুবিধা দেখিয়াও আকার বৃহৎ হইয়া থাকিবে কিন্তু অধিকাংশ মাসিকপত্রে দেখিতে পাই চারি পাতে এক ফর্ম্মা হয়। বাঁধিবার সময় ফলে দুই পাতা দুই পাতা করিয়া গাথিয়া যাইতে হয়। যদি প্রতি অঙ্কে দশ ফর্ম্মা থাকে, বৎসরে একশত কুড়ি ফর্ম্মা। গাঁথিতে কম সময় লাগে না। বিশেষ দোষ—দুই পাতার জোর কম সহজে ছিঁড়িয়া যায়। অন্ততঃ চারি পাতা লইয়া গাঁথিতে পারিলে এই দোষ থাকিত না, গাঁথার পরিশ্রমও অল্প হইত। সুবিধা থাকিতে অসুবিধায় পড়া মূর্খতা। মাসিকপত্র ধার-কাটা হইয়া পাঠকের নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে সুবিধা এই, পড়িবার সময় ছুরী খুঁজিতে হয় না; অসুবিধা এই, দফ্‌তরী নিজের পরিশ্রম বাঁচাইতে গিয়া নির্দ্দয় ভাবে ধার কাটে, পাশে শাদা কাগজ কম রাখে। আরও অসুবিধা, সব অঙ্ক সমান প্রমাণে কাটা হইয়া আসে না। কোন খানার উপরে কিংবা নীচে বেশী কাটা, কোন খানার পাশে বেশী কাটা। ফলে সব অঙ্ক বাঁধিতে গেলে ধার অসমান হয়। ধার কাটিয়া পাঠাইতে হইলে সব অঙ্ক এক প্রমাণে কাটিয়া পাঠান কর্ত্তব্য। যে কাজ একেবারে শেষ করিতে পারা যায়, সে কাজের জন্য পুনঃ পুনঃ সময় ব্যয় করিতে হইলে দীর্ঘ জীবন আবশ্যক হয়।

ব্যবসায়-হিসাবে বাঙ্গালা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের অধ্যক্ষের একটা ত্রুটি আছে। গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর নিমিত্ত তিনি ডাক-টিকিট কিংবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ড' চাহিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে ইনি ব্যবসায়-বুদ্ধি বুঝেন না, গ্রাহককে তুচ্ছ কারণে দূরে রাখিতে চান। ব্যবসায়-রীতি শিখিলে গ্রাহক ও অন্য সাধারণের জিজ্ঞাসা আকাঙ্ক্ষা করিবেন। ইহার আলস্যে গ্রাহকের আর এক অসুবিধার উৎপত্তি হইয়াছে। একবার এক মাসিকপত্র যথাসময়ে না পাওয়াতে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে সে পত্র পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। উত্তর আসিল, "আপনার গ্রাহক নং কত জানালে আমরা সহজে বুঝিতে পারি আপনাকে কাগজ পাঠান হইয়াছে কি না।' আমার গ্রাহক নং কত তাহা আমি কেমনে জানিব? কাগজের মোড়কে নং লেখা থাকে বটে, কিন্তু সেটা কি আমাকে মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইবে? হিসাবের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার খাতায় নম্বর দিতে পারেন, ছাপ মারিতে পারেন, লাল নীল সবুজ কালীর দাগ দিতে পারেন; কিন্তু সে সব আমার জানার প্রয়োজন কি? পঁচিশ খানা কাগজের গ্রাহক হইলে আমার পঁচিশটা নং মুখস্থ করিতে হইবে কি? অধ্যক্ষ মহাশয় আমার নাম

অর্থে দশ সংখ্যক পত্র। এখানে দশম অঙ্ক ঠিক হইত। কেহ কেহ ছবি শব্দটার অর্থবিকার ঘটাইতেছেন। ছবি শোভা দীপ্তি, এবং সাম্যজনও এই অর্থ মানে। বোধ হয় তসবির শব্দের সহিত গোল হইয়া চিত্র অর্থে ছবি হইয়াছে।

ও ধাম—দুইটা নং পাঠাইলেন; নামেও নাম ও সংজ্ঞা বা পদবী পাইলেন। অতএব আমার এই তিন নম্বরেই তাঁহার হিসাব দুরস্ত থাকিতে পারে। ফল কথা তাঁহার আলস্যের ও অজ্ঞতার মূল্য গ্রাহকের নিকট প্রার্থনা করা গর্হিত কাজ। ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্বন্ধ যাহাতে মধুর হয়, তাহা ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বুঝেন। উল্লিখিত অধ্যক্ষ মহাশয়ের এক সদাশয়তার প্রশংসা করি। আমি 'রিপ্লাই পোষ্টকার্ড' পাঠাই নাই; তিনি নিজের পোষ্টকার্ডে উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। এটা কম উন্নতি নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

"এষা"

করুণরসের অভিব্যক্তিতে "এষা"খানি, এক প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের বিরহগাথা ছাড়া বংলার আর সকল কবিতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। সচরাচর শোকের কবিতায় 'হা হতোহস্মি'রই বাহুল্য দেখিতে পাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার একটীবারও এরূপ হা হতোহস্মি করিয়া আপনার আর্ত্তনাদের ধ্বনি দিয়া তাঁর কবি-কল্পনার দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁর শোক সত্য, তাই সংযত; গভীর কিন্তু একান্ত বস্তুতন্ত্র। এইজন্য যে সকল সত্যকার ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া এ সংসারে লোকের শোক ক্রমে তীব্র ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহারই যেন এক একটী অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি আঁকিয়া এই কারুণ্যকে এমন অদ্ভুতভাবে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শোক যতই কঠোর হউক না কেন, বস্তুতঃ নিতান্ত নির্ম্মম নহে। নির্ম্মম হইলে মানুষ তার আঘাত সহিতে পারিত না। গম্ভীর শোকের শেল সর্ব্বদাই যেন একটু প্রবল অহিফেনসারসিক্ত হইয়া মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। এই জন্যই তার বেদনা যে কতটা ইহা মানুষ প্রথম বুঝিতেই পারে না। আমাদের শূন্যতা যখন অপরের দৈন্য-রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখনই শোকের স্বার্থপর আর্ত্তনাদের মধ্যে কোমল কারুণ্য জাগিয়া উঠে। আর এই ভাবেই অক্ষয়কুমারের 'এষা'তে এই অপূর্ব্ব কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ নিপুণতাটুকু টেনিসনের "ইন্ মেমোরিয়ামে" নাই; কালিদাসের "রতি-বিলাপে" নাই; বেহুলার গানে নাই; রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণে" নাই; আছে কেবল, কোথাও কোথাও বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদিগের দুর-বিরহ-বর্ণনে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে শ্রীবৃন্দাবনের কেবল ব্রজগোপ-গোপিনীগণের নহে, কিন্তু পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা-গুল্মাদিরও যে দীনতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে শ্রীমতীর দুর-বিরহব্যাধিকে মিলাইয়া দিয়া, বৈষ্ণবকবিকুলগুরুগণ এই নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। রসের যে একটা আলম্বন ও উদ্দীপন আছে, বৈষ্ণব

রসতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। রসকে তাঁরা কেবল আস্বাদন করিতেন না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধন করিতেন। এই জন্য প্রত্যেক রসের প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির নিয়ম তাঁহাদের নিকটে প্রত্যক্ষবৎ হইয়াছিল। জগতের আর কোনও কবিসম্প্রদায় এমন করিয়া প্রত্যেক রসের রূপের ও স্বরূপের সাধনা করিয়া এগুলির সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। সুতরাং বৈষ্ণবকবিগণের কাব্যে এ নিপুণতা আছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এই যুগে, এই দেশে জন্মিয়া অক্ষয়-কুমার যে এ নিপুণতাটুকু এমন করিয়া লাভ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

এইজন্য অক্ষয়কুমারের এই কবিতা-গ্রন্থকে কেবল কাব্য বলিলেই তার যথাযথ বর্ণনা হয় না। কারুণ্যরসের দ্বারা এই কবিতা গুলি গঠিত হইয়াছে বলিয়া, ইহারা রসাত্মক হইয়া প্রকৃত কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে। কাব্য হিসাবে এগুলি অতি উৎকৃষ্ট তো হইয়াছেই; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বা Psychologyর অভিব্যক্তিরূপেও এই কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অল্প নহে। এই বইখানি মানুষের শোকের, বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগবিধুর পতির মর্ম্মের স্তরে স্তরে যে বিরহের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তার একখানি পরিষ্কার, প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাস রূপেও অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধটা কেবল দুইটী মাত্র প্রাণকে জড়াইয়া গড়িয়া উঠে না। যতক্ষণ এই সম্বন্ধ কেবল দ্বিপাদ মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ পতি-পত্নী কেবল রমণ ও রমণী রূপেই পরস্পরকে প্রত্যক্ষ ও সম্ভোগ করেন। ততক্ষণ দাম্পত্য-সম্বন্ধ যতই গভীর হউক না কেন, কখনও প্রকৃতপক্ষে উদার হইতে পারে না। পতি যখন পত্নীর মাতৃত্বকে ও পত্নী যখন পতির পিতৃত্বকে ফুটাইয়া তোলেন, তখনই কেবল অভিনব বাৎসল্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মাধুর্য্যের মোহিনী চিরকল্যাণী হইয়া উঠে। দাম্পত্য-প্রেম তখন ছড়াইয়া পড়ে; দ্বিপাদ প্রেম ত্রিপাদে পূর্ণ হইয়া উঠে; * মাধুর্য্য তখন স্নেহসারে পরিণত হইয়া, বাৎসল্যকেও আপনার আলম্বন ও উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করে। স্নেহসারস্থিত এই দাম্পত্য প্রেম যখন মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তার শোক ও স্নেহ আশ্রয়হীন বাৎসল্যের দৈন্য দেখিয়াই প্রকৃত-পক্ষে আপনার তীব্রতা অনুভব করিতে থাকে। বাৎসল্যের সঙ্গে মাধুর্য্য তখন একই আঘাতে আহত হইয়া, অপূর্ব্ব ও গভীর কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ও জটিল কারুণ্যের ছবিটী এষাতে যেমন করিয়া ফুটিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ফলতঃ কবি এই গ্রন্থে কেবল তাঁর নিজের শোকদগ্ধ অন্তরের ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁর সমস্ত পরিবার পরি-জনের মর্ম্মবেদনাটা তাঁর শোকাহত হৃদয়ের ছিন্নতন্ত্রগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া যেন এই কবিতাগুলিতে বারম্বার মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এই কবিতা-গুলি যেন বিশ্বের সার্ব্বজনীন দাম্পত্য-বিরহের সাধারণ শোক-ছবিগুলিকে একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই জন্য এগুলি প্রত্যেক বিরহী জনের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ

* Faust.

করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ বিরহব্যাথাটাকে জাগাইয়া তোলে। এগুলি কবিতা নয়, এক একটী উজ্জ্বল চিত্রের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যু-শীর্ষক প্রথম স্তবকের ১ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ; অশৌচ-শীর্ষক দ্বিতীয় স্তবকের ১১শ এবং শোক-শীর্ষক তৃতীয় স্তবকের ৬ষ্ঠ ও ১০ম কবিতাগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায়। এগুলি কেবল কবিতা নয়, কেবল এক একটী ভাবের উচ্ছ্বাস নয়; কিন্তু যেন এক একটী উজ্জ্বল তৈল-চিত্র। এক একটী জীবন্ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মতন চক্ষের উপরে ভাসিয়া উঠে। এগুলি এক একটী অপূর্ব্ব কারুণ্য মূর্ত্তি লইয়া আমাদের চিত্তপটে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। এ ছবিগুলির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক বর্ণবৈচিত্র্য, প্রত্যেক অণুপরমাণু আমাদের অতি পুরাতন-পরিচিত বস্তু। চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এ শব্দ-চিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাণে যাহা ভুগিয়াছি তাহাই এখানে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে—পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন বিস্মৃত ভাবগুলি প্রাণের অন্তস্তলে নড়িয়া চড়িয়া উঠে। বাংলার বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রসচিত্র ছাড়া, আর কোথাও এমন বস্তুতন্ত্র কবিতা বেশি দেখি নাই।

তাহার উপর, কি আশ্চর্য্য নিপুণতা সহকারে কবি এ চিত্রগুলির সমাবেশ করিয়াছেন! কিন্তু এ নিপুণতা কৃত্রিম নহে, কষ্টসাধ্য নহে; নিতান্ত সহজসিদ্ধ। সাজাবার জন্য তিনি এগুলিকে এ ভাবে সাজান নাই। শোকার্ত্ত প্রাণের অভিজ্ঞতাগুলি যেমন একটার পর আর একটা ভাসিয়া আসিয়াছিল, সেই ধারাকে অনুকরণ করিয়াই কবির শোকাহত কল্পনা যেন ভাসিয়া চলিয়াছে, আর যখন যেরূপ বাহিরের আশ্রয় জুটিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়াই, মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই জন্য এই সব চিত্রগুলিই এমন অদ্ভুত স্বাভাবিকতায় ও সারল্যে পূর্ণ হইয়া আছে। মৃত্যু-শীর্ষক প্রথম স্তবকের ১ম ও ২য় কবিতাতে বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের একটা অপূর্ব্ব সংগ্রাম শোকভারে সংযত হইয়া, অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"বাবা,
মা কেন এত জপে কর আজ,
করে এত ঠাকুর প্রণাম ?"

এই কয়টী কথাতেই মুমূর্ষুর চরিত্রটী কেমন ফুটিয়াছে! সতী রোগযাতনার মধ্যেও ইষ্টনাম ছাড়েন নাই, কি জানি বিদায়কালে সে নাম ভুলিয়া যান, তারই জন্য ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরের পায়ে বারবার আপনাকে অর্পণ করিতেছেন, মনে মনে বলিতেছেন—দেখো যেন ভুলি না গো! কেবল তাহাই নহে, এই মৃত্যুর ছায়া আসিয়া কি পবিত্র জীবন ও সাধ্বী চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাও এই জপ-জপা ও প্রণামের ভিতর দিয়া ফুটিয়াছে। যে যেমন লোক সে তেমনি মরে। পরে, অন্যত্র অপর প্রসঙ্গে কবি যে সতীচরিত্রের পূর্ণ-চিত্র আঁকিয়াছেন, এই প্রথম কবিতার এই প্রথম চরণ দু'টীতে তাহারই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

জানু পাতি'—কৌষেয়-বসনা,
স্থির-নেত্রে যুক্তকরে, ঝর ঝর অশ্রুঝরে
তোমা-পানে চাহি' একমনা!
পড়ে কি না পড়ে শ্বাস, শিরশুক্ত [illegible]
শিথিল-অলকা, [illegible]

আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি'
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া, প্রণমিয়া
ফুরাত না তার ভক্তিরাশি।
প্রহর বহিয়া যায় ধ্যান তার না ফুরায়,—

এমনভাবে যিনি দৈনন্দিন জীবন কাটাইয়াছেন, তিনিই কেবল মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে ও এত কর-জপ ও এত ঠাকুর প্রণাম করিতে পারেন। তারপর কেবল মুমূর্ষুর চরিত্রের ছবিই যে এই কবিতাটীতে ফুটিয়াছে তাহা নহে। এখানে বাৎসল্যে ও মাধুর্য্যে এই দুই প্রবল রসের মধ্যে একটা নীরব নিষ্পন্দ দ্বন্দ্বও বাধিয়াছে। আর এই দ্বন্দ্বে বাৎসল্যই জয়লাভ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। আসন্নমাতৃবিয়োগ-ভয়বিহ্বলা কন্যার মুখ চাহিয়া আসন্নপত্নীবিয়োগ-ভীতিবিধুর পতির আপনার মর্ম্মন্তুদ শোকের সঙ্গে কি যে সংগ্রাম চলিয়াছে, প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু সন্তানের মুখ চাহিয়া সে শোকভয়ঝঞ্ঝাকে যে প্রাণপণে চাপিয়া রাখিতে হইতেছে, এই ক্ষুদ্র কবিতাটীতে

"তবে মা আমার—' ইচ্ছা বিধাতার,
এখনো ত রয়েছে জীবন।
যতক্ষণ শ্বাস— ততক্ষণ আশ,
ভক্তি ভরে ডাক নারায়ণ।
'ডাকি বার বার—'' কাঁদিও না আর,
যাও, তার পদধূলি লও।
বাছা, প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ করি,—
সাবি মত সতীলক্ষ্মী হও।

তাহাও বিশদভাবে ফুটিয়াছে। কাব্য এবং চিত্র এবং সঙ্গীত ও ভাস্কর্য্যাদি সর্ব্ববিধ ললিতকলারই উৎকর্ষের একটা অতি প্রধান লক্ষণ এই যে, এগুলি বাহিরে কথায় বা সুরে, প্রস্তরে বা চিত্রপটে কোনও রসবিশেষের যতটুকু ফুটাইয়া থাকে, কেবল ইঙ্গিতমাত্রে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের মর্ম্মস্থলে, নিগূঢ় আন্তরিক অনুভূতিতে তার শতগুণ বেশী জাগাইয়া তোলে। এষার প্রত্যেক কবিতাতে এই লক্ষণটা খুবই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২ একটী দুটী কথায় একটা বিশাল রস-রাজ্য পাঠকের মানসচক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন। এই মৃত্যুশীর্ষক স্তবকের ২য় কবিতাটীতেও

(১) "বাবা,
মা—কেন এত জপে কর আজ,
করে এত ঠাকুর প্রণাম?'
কাছে যা, বাছারে, শুনা গে তাহারে
জনমের মত হরি নাম।
"বড় ভয় করে, তুমি এস ঘরে
এলোমেলো কি বলে কেবল!''
গঙ্গা-মৃত্তিকায় লেপে দাও গায়,
দাও গিয়া মুখে গঙ্গাজল।
"চোখ বড় রাঙ্গা, গলা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা,
[illegible] মা বড় কাঁদে!"
[illegible] ঘুমাবে এখন
[illegible] মায়া-ফাঁদে।

পত্রবাহী ডাকে,— "চিঠি আছে।"
দেখি পত্র খুলি'—
কর্ম্মস্থল হ'তে আসিয়াছে
শুষ্ক তিক্ত বুলি।
অমরের চিঠি?— ভাল আছে?"
মুমূর্ষু জিজ্ঞাসে।
(সংবাদ দেইনি পুত্র কাছে—)
কি ভুল হতাশে।
অশ্রু ভরা কাতর নয়ন
এক দৃষ্টে চায়;
নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,
উত্তর আশায়।

হে দেবতা, লই তব নাম
এই মিথ্যা শেষ,—
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম,
পড়িতেছে বেশ।'
বক্ষ হ'তে নেমে গেল ভার
গভীর নিশ্বাস
ম্লান মুখে ফুটিল আবার
ধীর স্থির হাস।
শান্ত—তৃপ্ত কৃতজ্ঞতা ভাবে
উজ্জ্বল নয়ন।
শান্ত-তৃপ্ত ধীরে পার্শ্ব দিবে
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন।

তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতৃস্নেহের কি অপূর্ব্ব ছবিই এখানে কবি কি অসাধারণ নিপুণতা সহকারে ফুট'ইয়া তুলিয়াছেন। সন্তানের মঙ্গল কামনা মা'র সংসারবন্ধনের চরম তন্তুটী হইয়া, এ সংসারে তাঁর প্রাণটাকে বাঁধিয়া রাখে। এ সংসারে মৃত্যু সর্ব্বজয়ী হইয়াও কেবল এই অকৈতব বাৎসল্যের নিকটে পরাজয় মানে—কবি এই ক্ষুদ্র কবিতায় এই বিশ্বজনীন তত্ত্বটীকে ফুটাইয়া দিয়াছেন।

তারপর এই প্রথম স্তবকের ষষ্ঠ কবিতায়

ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জ্বালা না জুড়ায়।
নহে দূর নহে দূর
ওই মরণের পুর।
আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।
উথলি' উছলি' দুলি' চলে জলরাশ
হৃদয় শ্মশান খুলে'
ধরণী পড়িয়া কূলে;
নিকটে এসেছে নেমে বিষণ্ণ আকাশ।
নাহি তারা, নাহি তরী, জলদ ঘনায়;
ঘুরে ঢেউ আশে পাশে,
কত কল কল ভাষে,
ঝাপায়ে পড়িয়া বুকে তলাইতে চায়।
হৃদয় উদাস অতি, নয়ন উদাস;
সম্মুখে গভীর বারি
ডাকে দীর্ঘ বাহু নাড়ি',
মনে পড়ে দূর গৃহ—পড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
এই ত জগতে সুখ, এই ত জীবন।
সহে না নিমেষ ভর,
মরণেরি নামান্তর!
দেখি না—দেখি না তবে মরণ কেমন।
নাহি আশা, নাহি তৃষা জীবন যন্ত্রণা,
ম রয়া জুড়াতে চাই
মরিতে সাহস নাই।
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।

অশৌচ-শীর্ষক দ্বিতীয় স্তবকের একাদশ

সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
বসি কুশাসনে,
গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘ শ্বাস,
পড়ে মন্ত্র গাঢ়-স্বরে' স্খলিত বচনে।
কনিষ্ঠে লইয়া কোলে জ্যেষ্ঠা কন্যা বসি',
গলে বস্ত্র দিয়া,
শুনে মন্ত্র এক মনে, মুছে অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে শূন্যপানে দেখিছে চাহিয়া।
গায়ে গায়ে আছে বসি' ক্ষুদ্র কন্যা দু'টি,
মলিন বদনে,
কভু ধীরে অশ্রু ঝরে, কভু চায় পরস্পরে,
কভু দু'জনার চক্ষু মুছায় দু'জনে।
চঞ্চল অবোধ শিশু হতেছে চঞ্চল,
চারিদিকে চায়,
সবাই কাঁদিছে কেন? ভয়ে সে আড়ষ্ট যেন,
বারেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায়!
উজাড়ি সমস্ত গৃহ আনিছেন মাতা,
কিসে স্বর্গ পায়!
কভু কাঁদি উচ্চরোলে, করেন আমারে কোলে,
বলেন কাঁদিয়া কভু,—জীর্থ রেখে আয়!
'যে জীবা অনলদগ্ধা' পড়ে পুরোহিত'
কণ্ঠ শোকাকুল।

তাহার তৃপ্তির তরে দিতেছি যতন ভরে
তৈজস, তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল।
কি অদেয় তারে আজ? তেমনি হাসিয়া
সে কি লবে আর?
সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার।
পিতা নাই, মাতা নাই, পতি পুত্র নাই
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা 'ফেরে
অনলে, অনিলে, শূন্যে কোথায়—কোথায়!
কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী।
আমি আজ ধরাতলে, সভক্তি নয়ন জলে
মাগিতেছি মুক্তি তার, দুই কর জুড়ি।

এবং তৃতীয় স্তবকের ষষ্ঠ ও দশম কবিতাতে,

অজয়ে জিজ্ঞাসে দাসী—'কোথা মা তোমার?'
মুখ পানে চেয়ে রয়,
মনে যেন হয়—হয়
"মা—মা—আমা(র) মা"—বলে বার বার।
যেন ক্রমে ক্রমে বোঝে
আঁখি চারিদিকে খোঁজে,
ক্রমে ফুলে' ওঠে ঠোঁট, আঁখি ছল ছল।
'গিয়াছে মামার বাড়ী?'
সায় দেয় মাথা নাড়'
আঁচল ধরিয়া বলে,—চ(ল্)—চ(ল্)—চ(ল্)।
'কোথা যাবে? অন্ধকার—"
মানা নাহি মানে আর,
লুটায়ে—লুটায়ে ভূমে কাঁদে অবিরল।

প্রভাত প্রশান্ত স্থির,
সম্মুখে বিহগ নীড়
বিহগী পড়িয়া তরুমূলে,
খোলা চোখ, আধ্‌খোলা পাখা দু'টা তুলে'।
অন্ধক শাবকগুলি,
জিহ্বা মেলি' মুখ তুলি',
নড়ে, চড়ে, চীৎকারে কাতরে—
প্রভাতবায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্ম্মরে।
হৃদয় কেমন করে—
শিশুগুলি মনে পড়ে।
আশঙ্কায় ঘরে ছুটে যাই,
চাপিয়া—চাপিয়া বুকে মুখে চুমো খাই।
মরেছে তাহার দেহ,
মরেনি ত প্রেম স্নেহ—
রেখে যেন গেছে সমুদয়।
সেই সাধ সুখ দুখ আশা তৃষা ভয়।
তারি হৃদি হৃদে ধরি'
তা'র গৃহকার্য্য করি,
প্রতি কার্য্যে স্মরি অনুক্ষণ,
মরমে মরমে কাঁদি, মুছি দু'নয়ন।
সদা কাছে কাছে রই
কত হাসি, কত কই,
রাখি চোখে চোখে, কোলে কোলে;
কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে।
তেমনি পাতিয়া কোল
দিতেছি আদর দোল—
কত সুরে করি গুণ গুণ্!
দিন দিন আমি কত স্নেহে সুনিপুণ!
ভালবাসি বুকে পুরে,
তবু—তারা দূরে দূরে।
প্রাণ ভরে' তেমন না হাসে,
ঘুমায়ে—ঘুমায়ে তারে খোঁজে আশে-পাশে!
বকাবকি ঘুষাঘুষি—
আমি যদি কভু রুষি,
এক জোটে সবে ওঠে কাঁদি।
আমি শেষে অপরাধী—জনে জনে সাধি!

যে কারুণ্যছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী, একই সঙ্গে অতি সুন্দর ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছে। বস্তুগুলি আপাততঃ অতি ছোট বলিয়া মনে হইতে বা পারে।

দৃশ্যগুলি অতি সাধারণ—যেখানে শোক সেইখানেই এগুলি অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপকরণ সামান্য হইলেও এই কবিতাকয়টীর উপজীব্য যে করুণা ইহাদের মধ্যে ফুটিয়াছে তাহা অলোকসামান্য। এই সামান্য উপকরণ লইয়া কবি যে এমন গভীর উজ্জ্বল রসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, ইহাতেও তাঁর কবিকল্পনার অলোকসামান্য কুশলতার পরিচয় দান করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

"ন চ দৈবাৎ—"

১

দেবেন্দ্রনাথের মাথা ধরিয়াছিল। কথাটা এমন কিছু নয়, রমণীমহলে এবং নারীভাব-সুলভ যুবকদলে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবে, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এটা নূতন,—এ পর্য্যন্ত তাহাকে মাথা ব্যথা বা অন্য কোন ব্যথা অনুভব করিতে হয় নাই। তাই একটু ব্যস্ত হইয়াই অপরাহ্ণে সে তাহাদের গৃহ-চিকিৎসক হরেন্দ্র ডাক্তারের শরণাপন্ন হইল।

ডাক্তার সাহেব তখন বাড়ীতে ছিলেন না। দেবেন্দ্র নিজের গাড়ীতেই আসিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাঁর আফিস বা consulting rooms-এর দিকে ছুটিল। ডাক্তার তখন কাগজপত্র গুছাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বলিলেন—"খুব এসে পড়েছেন,—আমি এখনই একটা ডাকে শ্রীরামপুর যাচ্ছিলাম। মাথা ধরেছে? তা ধরবেই ত!—গুরু-ভোজন, মাদক-সেবন, রাত্রিজাগরণ—এ সব ত আপনারা ছাড়বেন না,—কাজেই তার ফল ভোগ করতে হয়।—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বলিল, —"গতস্য শোচনা নাস্তি।' কিন্তু এখন যে আমি মরি একটা ওষুধ দিন।"

"নেহাতই ছাড়বেন না ত এই নিন—" বলিয়া ডাক্তার একবার ঘড়ির দিকে চাহিলেন; তরপর তাড়াতাড়ি একটা প্রেস্‌ক্রপ্‌সন লিখিয়া দিয়া রোগীর নাম-তালিকায় তার নামটা টুকিয়া, আফিস বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রও প্রেস্‌ক্রপসনটা হাতে করিয়া প্রথম যে ডাক্তারখানা পাইল তাহাতেই ঢুকিয়া পড়িল। সেটা সেনগুপ্ত কোম্পানীর ডাক্তারখানা। দেবেন্দ্রের নিতান্ত গ্রহের ফের, তাই সে সময় সেখানে ঢুকিল; কেন, তাই বলিতেছি।

২

সেনগুপ্ত কোম্পানীর দুইজন অংশীদার—এক রতন সেন, অপর ললিত গুপ্ত। দুইজনে সহতীর্থ। উভয়ে কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া সমান অংশে এই ডাক্তারখানা খোলে। স্কুলে এবং কলেজে কতকটা "ডাক্তারি" [illegible]

একটু বেশীমাত্রায় স্ফূর্ত্তিবাজ বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। ব্যবসায়ে বসিয়াও কলেজের সে আমোদ-প্রবণতা তাহাদের বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। প্রমাণ—পূর্ব্বরজনীর অভিনয় দর্শন সম্ভোগ।

থিয়েটারওয়ালাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা এবং মিউনিসিপাল আইন প্রহসনে যতদিন না যবনিকা পড়িতেছে ততদিন বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনয়-দর্শকবৃন্দের এ দুর্ভাগ্য ঘুচিবার উপায় নাই। তাই প্রতি রবিবার এবং সোমবার প্রাতঃকালে বিবর্ণমুখ কোটরগতাক্ষি, সুদীর্ঘ রজনীর ঘর্ম্মসিক্তবেশা থিয়েটার যাত্রীর দলকে, সুদীর্ঘকালের আসামীর ন্যায়, অভিনয় কারা হইতে একে একে বাহির হইয়া আসিতে দেখি। স্বাস্থ্যের বিনিময়ে অভিনয় সম্ভোগ এ একমাত্র আমাদের মত হতভাগ্য দেশেই সম্ভবপর। কথাটা নেহাৎ 'ধান ভানিতে শিবের গীত' নয় আমার এ গল্পের সহিত ইহার একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, এটা একটু বেশী করিয়া বলিতে হইল।

সে দিন প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া দুই বন্ধু যখন আসিয়া ডাক্তারখানা খুলিল তখন তাহাদের উভয়েরই অবস্থা সমান,—শরীর অবসন্ন, চক্ষু নিদ্রাতুর। তার উপর, কম্পাউণ্ডারও সেদিন দিন বুঝিয়া, অসুস্থ বলিয়া রিপোর্ট করিয়া কাজে আসে নাই। কাজেই সে দিনের দোকানের সব ভার রতনের স্কন্ধে পড়িল; লজ্জিত থাকিতে পারিল না,—ভবানীপুরে ডাক্তারখানাসংক্রান্ত একটা জরুরী কাজে [illegible] ছুটিতে হইল।

[illegible] পড়িল। আফিসের ছোঁড়া কালীচরণটাকে ডাকিয়া লইয়া কাজের একটু সুসার করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে একটা অজ্ঞ যব-চূর্ণ, ঔষধ-চূর্ণাদি লইয়া আহার্য্য বিশেষে রূপান্তরিত করিবার উপক্রম করিল; কাজেই ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া রতন নিজেই সব কাজ করিতে লাগিল। বেলা যখন চারিটা, এখনও কাজের ভীড়ে তার জলযোগ করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই,—এদিকে ঘুমের ঘোরও তখন তাহাকে বেশ চাপিয়া ধরিতেছিল। তারপরও একঘণ্টা কাটিয়া গেল—রতন শিবনেত্রে তন্দ্রাবিষ্টের মত কোন রকমে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। ৫টার সময় আর সে চক্ষু মেলিতে পারিল না,—রক্তমাংসের শরীরে আর কত সয়?—হাত পা ছড়াইয়া অবসন্নভাবে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িবে—এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ তার প্রেস্‌কৃপ্‌সনখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—"ওষুধটা আমি নিয়েই যাব। একটু না হয় বসছি" বলিয়া, একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া, কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

রতনের তখনকার মনের ভাব সহজেই অনুমেয়। তবু সে প্রেস্‌কৃপ্‌সনখানা ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া, ল্যাবোরেটারীতে ঢুকিয়া ঘুম-বিজড়িত নেত্রে বহুকষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিল। ঔষধের রকমারী বেশী ছিল না—এক সোডিয়ম ছাড়া হাতের কাছেই সবগুলা ছিল। সোডিয়মটা দেয়ালে আঁটা লম্বা তক্তার উপর, অন্যান্য ঔষধের বোতলের সঙ্গে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো ছিল; তার এক পার্শ্বে সিলিসিয়ম (Silicium) এবং অপর পার্শ্বে ষ্ট্রীক্‌নিনের (Strychnine) বোতল ছিল।

সে রকম ভাবে পাশাপাশি ঔষধ দু'টা রাখা অবশ্য ঠিক হয় নাই। তবু ষ্ট্রীক্‌নিনের বোতলের গায়ে লাল কাগজে মোটা অক্ষরে "বিষ" "সাবধান" বলিয়া যে লেখা ছিল তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছি। রতন দুই বার হাই তুলিয়া, তিনবার আলস্য ভাঙ্গিয়া, চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে সোডিয়মের বোতলটার আবিষ্কার করিল, তারপর টুলের উপর দাঁড়াইয়া তাহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিল,—নামাইয়া আনিল কিন্তু ষ্ট্রীক্‌নিনের বোতলটা।

দেবেন্দ্র তখন চেয়ারে বসিয়া মাথার যন্ত্রণায় ঝিমাইতেছিল।

বোতলটা নামাইয়া রতন তাহা হইতে ওজন করিয়া ১৫ গ্রেণ ঔষধ বাহির করিল, তারপর বাকী ঔষধগুলার সহিত মিশাইয়া একে একে ছয়টা পুরিয়া করিল, তারপর একটা রঙ্গীণ ছোট কাগজের বাক্সে পুরিয়াগুলি রাখিয়া, ঘুমের ঘোরে ডবল দাম চার্জ্জ করিয়া বসিল।—দেবেন্দ্র তখন যন্ত্রণায় অস্থির, সে তৎক্ষণাৎ দাম চুকাইয়া দিয়া ঔষধ লইয়া, গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিল। কোচম্যানকে হাঁকিয়া বলিল—"চলো—বাড়ী।"

৩

ঔষধের দামটা বাক্সে তুলিয়া রতন, বোতল খুলিয়া, আউন্স খানেক কি একটা রঙ্গীণ পানীয় গলাধঃকরণ করিল। ফলে, তাহার হস্তপদের শিথিলভাব কতকটা অপসৃত হইল, এবং তাহার শিব-নেত্র কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তখন সে একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—টেবিলের উপর কতকগুলা ছিন্ন কাগজ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ৮।১০ টা শিশি, আর ঢাকা খোলা একটা বোতল—গায়ে মোটা মোটা লাল অক্ষরে—ও কি?—'ষ্ট্রীক—!" রতন চক্ষু রগড়াইয়া দুইবার তিনবার অক্ষরগুলা পড়িল তারপর দেওয়ালে আঁটা তক্তাটার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল—সোডিয়মের বোতলট ত নড়চড় হয়নি, তবে।—

সদ্যঃ সর্পদষ্টের ন্যায় রতন একলম্ফে টেবিল টপ্‌কাইয়া ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল। কোথায় তখন রোগী, আর কোথায় সে ঔষধ। বিশাল জনস্রোত বহুক্ষণ উভয়কেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

রতন কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। একটা গভীর বিপদাশঙ্কায় তাহার হস্তপদ অসাড় হইয়া গেল। ক্ষণপরে কি ভাবিয়া, ফিরিয়া, প্রেসক্রুপ্‌সনখানা একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। নামের স্থানে দেখিল, শুধু—"রায়" লেখা রহিয়াছে। রায়! কোন্ রায়? ডিরেক্টরী খুলিয়া দেখিল—তিন কলম "রায়'। তবে এক। কথা, প্রেসক্রুপ্‌সনখানা ত হরেন্দ্র ডাক্তারের, তিনি হয় ত তাকে জানিতে পারেন। ডাক্তারখানায় টেলিফোন ছিল—রতন প্রাণপণে হাতল ঘুরাইতে লাগিল।

"কোন্ নম্বর?"

"বলছি মশাই,—বলছি"—বলিতে বলিতে সে ক্রমাগত নম্বর কেতাবের পাতা উল্টাইতে লাগিল ডাক্তারের 'ফোন'-নম্বর তার জানা ছিল না। টেলিফোনওয়ালারা ৪।৫ বার প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে সে হাঁকিল—"৫১৬"

"ডাক্তার হরেন্দ্র বোস ? আমি ডাক্তার বোসকে চাই, এখনই—"

অপরদিক্ হইতে বামাকণ্ঠে উত্তর হইল—"আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। মুখটা বুঝি যন্ত্রের খুব কাছে নিয়ে এসেছেন ? একটু সরিয়ে নেবেন।"

রতন যন্ত্রটা ঠিক করিয়া ধরিল, বলিল—"ডাক্তার সাহেব বাড়ী আছেন ?"

"তিনি কতক্ষণ হ'ল একটা 'কল' পেয়ে মফঃস্বল গেছেন। কি চান আপনি ?—

রতন হতাশভাবে অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

"আমি তাঁর স্ত্রী। আমার দ্বারা যদি আপনার কিছু—"

"দোহাই আপনার, 'রায়' বলে তাঁর কোন রোগীকে আপনি জানেন ?"

"রায় ! রায় !—তাই ত, শুধু 'রায়' বলে কি করে বুঝব ? কত রায় আছে !—"

*   *   *

তখন দেবেন্দ্রের গাড়ী রাস্তার ভীড় ঠেলিয়া বাড়ীর দিকে মোড় ফিরিতেছিল।

৪

রতনের সমস্ত রক্ত তখন মাথায় উঠিতেছিল। তীব্র কণ্ঠে সে বলিল—"ভাবুন, মনে করে দেখুন—ছোকরা কোন রায়কে আজ আপনার স্বামীর কাছে আসতে দেখেছেন কি না।—আমি তাকে বিষ খাইয়েছি !—'

'বিষ ?—"

"হাঁ—ভুলক্রমে। আমি ডাক্তারখানার লোক, তাকে ভুল ওষুধ দিয়ে ফেলেছি। তার ঠিকানা চাই,—তাকে বাঁচাতে চাই,—[illegible]—"

"সর্ব্বনাশ ! কি ভয়ানক কথা !—আপনি এখনি ডাক্তার সাহেবের আফিসে যান—তাঁর খাতাপত্র সেখানেই থাকে—সেখানে গেলে হয়ত সন্ধান পেতে পারেন।"

"তাঁর ঘরের চাবি ?—"

"তাই ত, আমি ত চাবি রাখি না। তবে, দরোয়ানের কাছে হয় ত চাবি থাকতে পারে,—আপনি যান,—আমিও—"

রতনের আর শেষ কথা শোনা হইল না। তিন লাফে সদর রাস্তায় পড়িয়া, ডাক্তারের আফিসের দিকে সে উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল—টেলিফোনের রিসিভারটা হুকের গায়ে সবেগে দুলিতে লাগিল।

ছুটিতে ছুটিতে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় যখন রতন ডাক্তার বোসের আফিসে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দ্বারবান লছমন সিং, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া আপনার ক্ষুদ্র কুঠারীতে বসিয়া, মৃৎপ্রদীপালোকে, সুর করিয়া করিয়া, ভাবের আতিশয্যে গাঢ়কণ্ঠস্বরে "হো রামা—আ-আ" পড়িতেছিল। সদর দরজার উপর প্রচণ্ড করাঘাতে তাহার ভাবস্রোতে বাধা পড়িল। বিরক্ত হইয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া সে উত্তর করিল—"আতে হেঁ।"

সে স্বর রতনের কর্ণে প্রবেশ করিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু সে প্রচণ্ড করাঘাতের বিরাম ঘটিল না। লছমন দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—"আরে শশুরাণ, ইয়ে ডাকু না কোন্ হ্যায় ! ঠারিয়ে জী ঠারিয়ে,—আতে হেঁ। আরে কে'য়ারি তোড়্যো মৎ—" বলিতে বলিতে দ্বার খুলিয়া, সম্মুখে সম্পূর্ণ অপরিচিত ধূলিধূসরিত স্বেদসিক্ত এক

মূর্ত্তি দেখিয়াই তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল; ভাবটা তখনই তাহাকে দূর করিয়া দেয়। রতন, তাহা বুঝিয়াই, তাহাকে ঠেলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"হাম ডাক্তার সাহেবকো আফিস ঘরকা ভিতর যানে মাঙ্‌তা। আভি উসকা কেওয়ারি খোল দেও।"

"কাহে জী? সাব আভি নেহি হ্যায়।"

"আরে সে ত হামি জানে। একঠো আদমী বিষ খায়া হ্যায়—মরণে বৈঠা হ্যায় উস্‌কা ঠিকানা হাম মাঙ্‌তা।"

"কিস্‌কো ঠিকানা?"—লছমন আগন্তুকের প্রতি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

* * *

এদিকে দেবেন্দ্র তখন ঔষধ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া, আপন শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

* *

"কিস্‌কো ঠিকানা, জী?"

"আরে, ওই আদমীকো—"

"শুনিয়ে বাবু সাহেব। ডাঙ্‌তার সা'ব বাহির গয়ে হেঁ, আপকো ভি হম নেহি পছনতে হেঁ। তব্‌ উন্‌কা কামরা হম ক্যায়সে খোল দেঁ?"

"আরে জাহান্নামকে দাও তোমার ক্যায়সে। আরে ভাই তোম্‌ খুন করোগে? তোমকো ভি হামারা সাথ যে লটক্‌ যানে হোগা।—আরে খোল দেও, খোলো,—খোলো—" রতন উন্মত্তের ন্যায় আফিস কক্ষের দরজায় প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল।—"আরে খোল দেও, মেমসাহেব ভি হাম্‌কো বোল্‌ দিয়া।—"

লছমনের মেজাজ ক্রমশই চড়িয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—"উস্‌কা কোন্‌ ঠিকানা হ্যায়? খালি আপকো জবানীমে হাম কভি ইস্‌ কামরা খোল্‌নে নেহি শকতে হেঁ। বিশ বরষ হিঁয়া হাম নকরীমে হ্যায়, বিশ—"

সহসা সে রঙ্গমঞ্চে এক মহিলার আবির্ভাব হইল। উভয়ের বচসার কথা বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে কতকটা তাঁর কর্ণগোচর হইয়াছিল।—

"সে কি?—আপনি এখনও ঘর খোলেন নি?—আপনিই ত আমাকে—"

"এই হতভাগাটা—" রতনের সর্ব্বশরীর তখন ক্রোধে উৎকণ্ঠায় কাঁপিতেছিল,—"এই—"

"লছমন, এখনি ডাক্তার সাহেবের ঘর খুলে দাও।"

লছমন প্রভুপত্নীর সে আদেশ অন্যথা করিতে সাহস করিল না। তবু তালা খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিল—"বিশ বরষ হিঁয়া হাম—"

* *

দেবেন্দ্র তখন জুতাজামা ছাড়িয়া, সেনগুপ্ত কোং'র সে সুদৃশ্য পুরিয়ার বাক্সটা খুলিয়া তাহা হইতে সযত্নে একটা পুরিয়া বাহির করিয়া গলাধঃকরণ করিবার অভিপ্রায়ে সুরুই হইতে এক গ্লাস জল গড়াইতেছিল।

* *

তাড়াতাড়িতে দরজা খুলিতে গিয়া, লছমন চাবিটা তালার সহিত বেকায়দায় আটকাইয়া ফেলিল; রতন ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া তার গলা চাপিয়া ধরিল, মিসেস বসু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এমন সময় হঠাৎ সে রঙ্গমঞ্চে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব

হইল,—ইনি ডাঃ সেন—ডাক্তার বসুর সহকারী বা আসিষ্টাণ্ট। মিসেস বসু বলিলেন—"দোহাই ডাঃ সেন। আগে দরজাটা খুলুন, সব বলছি পরে।"

অল্প চেষ্টাতেই তালা খুলিল। রোগীদের লিষ্টটা টেবিলের উপরই ছিল, রতন তাড়াতাড়ি যাইয়া দেখিল, সব শেষে পেন্সিলে লেখা একটা নাম—"দেবেন্দ্র রায়, কলুটোলা—নং।"

*   *

দেবেন্দ্র ততক্ষণে ঔষধের গ্লাসে জল মাপিয়া তাহাতে এক পুরিয়া ঔষধ ঢালিয়া ছিল, তারপর আরাম কেদারায় শুইয়া, গ্লাসটা—   *   *   *

৫

মিসেস বসু চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বাইরে আমার গাড়ী রয়েছে, আপনারা দু'জনে শীঘ্র গাড়ীখানা ছুটিয়ে নিয়ে যান। আমিও দেখি টেলিফোনে তাঁকে পাই কি না।"

অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর মিসেস বসু একটা নম্বর পাইলেন—'যদুনাথ রায়—কলুটোলা।'

"দেবেন্দ্র বাবু এ বাড়ীতে থাকেন?"

"আজ্ঞে হাঁ। আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?"

"আমি ডাক্তার হরেন্দ্র বসুর স্ত্রী। দেবেন্দ্র বাবু বাড়ী আছেন ত? এখনই একবার ডেকে দিন, বিশেষ জরুরী।"

মিনিট খানেক পর অপর দিক্ হইতে প্রশ্ন হইল—"আপনি দেবেন্দ্র রায়কে খুঁজছেন? আমিই দেবেন্দ্র। কি চান আপনি?—"

"দোহাই দেবেন্দ্র বাবু, সেটা খাবেন না।"

"আজ্ঞে?—"

"সেটা খাবেন না, খাবেন না—এখনও খাননি ত?"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না। আপনি টেলিফোনের নম্বর উলটাপালটা করে ফেলেন নি ত?"

"সেই পুরিয়াটা—মাথাধরার ঔষধটা খাননি ত এখনো?—"

"কেন, কি হয়েছে? এইমাত্র যে আমি একটা পুরিয়া খেলাম।—ব্যাপার কি?"

কিন্তু দেবেন্দ্র আর তার উত্তর পাইল না। যন্ত্রটাকে কোনমতে হুকে আটকাইয়া ভীত-চকিত নেত্রে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে মিসেস বসু ততক্ষণ সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া রিসিভারটা তুলিয়া রাখিল। আপন মনে বলিল—'কে এ? পাগল না কি?"

দেবেন্দ্রের বাড়ীর দরজায় গাড়ি লাগিতে না লাগিতে রতন এবং ডাক্তার সেন লাফাইয়া পড়িয়া ঝড়ের মত একেবারে বাড়ির মধ্যে গিয়া পড়িলেন। চাকরটা আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় ছুটিয়া আসিতেছিল—তাহার উপর উভয়ের যুগপৎ প্রশ্ন বর্ষিত হইল—"বাবু বেচে আছেন ত?"

হল-ঘরে কিসের একটা গোলমাল শুনিয়া দেবেন্দ্র আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেই রতন ছুটিয়া যাইয়া তার হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি বেঁচে আছেন!—রাখে কৃষ্ণ মারে কে?—"

"কেন, —কি হয়েছে ?"

সহসা কক্ষমধ্যস্থ টেবিলের উপর ঔষধের খালি গ্লাসটার উপর ডাক্তার সেনের দৃষ্টি পড়িল। তিনি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—"আপনি ওষধ খেয়েছেন ?"

"কোন্ ওষুধ ? পুরিয়াটা ? হাঁ খেয়েছি, কেন ? এইমাত্র খেয়ে শুয়ে ছিলাম।"

"হা ভগবান্!"—বলিয়া রতন মাথায় করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।—"এত করেও আটকাতে পারলাম না।" তার পর উন্মাদের ন্যায় কক্ষমধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বলিতে লাগিল "মাষ্টার্ড—পাম্প—জিঙ্ক সালফেট,—কে কোথায় আছ, শীঘ্র আন, শীঘ্র নিয়ে এস।"

দেবেন্দ্র কতকটা দমিয়া গেল।—"মাষ্টার্ড—পাম্প—জিঙ্ক সালফেট!—কেন, কিসের জন্য ?"

রতন পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"না না,—বলুন আপনি সত্যি সেটা খাননি!—বলুন আপনি ভুল বলেছেন।"

"বিলক্ষণ, ভুল হবে কেন?—ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না? দোহাই আপনাদের—"

এমন সময় মিসেস বসু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"ওঃ হো! ষ্ট্রীকনিন—আপনাকে আমি ষ্ট্রীকনিন খাইয়েছি!—" বলিয়া রতন আপন মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল।

আঁ্যা!—ষ্ট্রীক—নিন!—দেবেন্দ্রের মুখমণ্ডল সহসা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু কপালে উঠিল, নিমিষের মধ্যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে কক্ষতলে পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া চোখে মুখে নাকে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। ডাক্তার সেন উত্তেজিত হইয়া রতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আর হাঁ করে ভাবছেন কি?—এখনি ছুটে আপনার ডাক্তারখানায় যান, পাম্প ফাম্প যা পান নিয়ে আসুন,—মুহূর্ত্তের বিলম্বে সব নষ্ট হবে। এখনও উপায় আছে—যান চলে যান।"

রতনের মাথায় তখন রক্ত চন্ চন্ করিতেছিল। নক্ষত্রবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিয়া সে হাঁকিল—"দশ টাকা—বিশ টাকা—যা চাও বক্‌সিস দেবো, যত জোর আছে চালাও।"

জনসংঘ ভেদ করিয়া, কত লোককে চাপা দিতে দিতে সামলাইয়া গিয়া, মোটরখানা ডিস্পেন্সারীতে আসিয়া পৌঁছিল। একটা ছোকরা অনেকক্ষণ হইতে রতনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে আসিতেই তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—"ললিত বাবু দিয়েছেন,—বলেছেন—খুব জরুরী; এখনই খুলে দেখতে!" "নিপাত যাও!" বলিয়া রতন তাহার হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া পকেটে পুরিল। তার পর তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া, মাষ্টার্ড পাম্প প্রভৃতি যা পাইল একটা ব্যাগে পুরিয়া তালা বন্ধ করিয়া গাড়িতে আসিয়া উঠিল। সফারকে বলিল—"ছোটো ছোটো,—এক মুহূর্ত্তের দেরিতে একটা জীবন যাবে, প্রাণপণে চালাও—"

৬

হঠাৎ ললিতের চিঠির কথা রতনের মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়িয়া দু'চার ছত্র পড়িতেই, তার পর উত্তেজনা

থামিয়া গেল। আরও দুইবার ভাল করিয়া সে পত্রখানা পড়িল। তার পর অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—ষ্টুপিড্—ছোঁড়াটা,—বাস্কেল! কি ভোগানটাই না মিছামিছি ভোগালে!

পত্রখানা এই :—

"ভাই রতন,

সোডিয়মের বোতলটা নেড়ো না—সেটা ষ্ট্রীকনিনে ভরা। ষ্ট্রীকনিনটার বোতলের সবটাতেই সোডিয়ম পোরা আছে। আজ সকালবেলা তন্দ্রার ঝোঁকে ওলটপালট করে ফেলেছি, ভেবেছিলাম পরে লেবেল দুটো বদ্‌লে দেবো, আস্‌বার সময় ভুলে এসেছি; এখানে এসে এই কতক্ষণ মনে হল। এটা হচ্ছে—'বিভ্রমস্তন্দ্রাকালে চূর্ণস্থানবিপর্য্যয়ঃ।' যাই হোক কাল ঠিক করে নেয়া যাবে এখন। এটা একটা গভীর মনস্তত্ত্বের কথা,—পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

দিনটা চালালে কেমন?

তোমার

"ললিত।"

*　　*

"হতভাগাটা!"—বলিয়া রতন শুধু হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র তখন শয্যায় পড়িয়া গোঙাইতেছিল। ডাক্তার সেন পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাতের নাড়ি টিপিয়া ধরিয়া পকেট ঘড়িটার কাঁটার দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিলেন। মিসেস বসু তার নাকে মুখে জল দিতেছিলেন। রতনকে শুধু হাতে আসিতে দেখিয়া ডাক্তার সেন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। রতন হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে এবং ঈষৎ অপ্রস্তুতের ভাবে বলিল—"আঃ বাঁচা গেছে। সব ভুল! ভগবান্ বাঁচিয়েছেন!"

"কি রকম?"—উভয়ে সোৎকণ্ঠে যুগপৎ প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন।

"এই দেখুন, আমার বন্ধু ও সহকারী ললিত গুপ্তের চিঠি—" বলিয়া সে চিঠিখানা পড়িয়া সকলকে শুনাইল।

"অ্যাঁ?" দেবেন্দ্র এতক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। "তবে আমি বিষ খাইনি?"

"আজ্ঞে না।"

"সত্যি?"

"সত্যি বই কি এই চিঠিই তাহার প্রমাণ।"

"তাই ত! তবে আর আমার কোন ভয়ের কারণ নেই?—আপনারা ঠিক বলছেন? আমি ত তাই ভাবছিলাম—" বলিয়া দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিল।

মিসেস্ বসু ধীরে ধীরে জলের পাত্রটা ঠেলিয়া রাখিলেন; ডাঃ সেন চশমা মুছিতে মুছিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িলেন; দাস-দাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। তারপর সকলে একে একে নীরবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

যাই হউক, দেবেন্দ্রের মাথা-ব্যাথাটা কিন্তু ছাড়িয়া গিয়াছিল।*

* কোন ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

র‍্যাডিয়ার্ড কিপলিং ও রবীন্দ্রনাথ

বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ ডারুইন যখন তাঁহার অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন বলিতে গেলে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের কেবল একটা দিকই বেশী দেখিয়াছিলেন। জীবজগতের বিকাশে, "জীবন-সংগ্রাম" ও "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন"—এই দুইটীই তিনি প্রধান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। সৃষ্টি-পর্য্যায়ে যে আরও একটী নিয়ম কার্য্য করিতেছে ('জীবন-সংগ্রাম'' অপেক্ষা প্রবলতর ভাবেই কার্য্য করিতেছে), তাহার দিকে তিনি তেমন মন দেন নাই।

ডারুইনের এই মতবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু চিন্তারাজ্যে সুফলের সঙ্গে সঙ্গে এমন সকল কুফলও ইহা উৎপন্ন করিয়াছে, যাহা ডারুইন স্বয়ং কল্পনাও হয়ত করেন নাই। তাঁহার শিষ্য ও সতীর্থেরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বজ্রগম্ভীর রবে প্রচার করিলেন যে, সংগ্রামই জীবজগতের একমাত্র নীতি; দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, প্রবল প্রতিযোগিতা, ইহা ছাড়া সেখানে অন্য কোন নিয়ম খাটিতে পারে না। এই কঠোর যুদ্ধে, যে বলী সেই জয়ী হইবে; —দুর্ব্বল, অযোগ্য এই নিয়মের চক্রে পিষিয়া মরিবে। আধুনিক একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদের কথায়—

"They made modern literature resound with the war-cry of "woe" to the vanquished", as if it were the last word of modern biology. They raised the "pitiless" struggle for personal advantages to the height of a biological principle which man must submit to as well, under the menace of otherwise succumbing in a world based upon mutual extermination" (Prince Kropotkin's Mutual aid")

ক্রমশঃ এই নিষ্ঠুর নীতি রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্য—সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সংগ্রাম-নীতির রক্ত-রেখাঙ্কিত ভিত্তির উপরেই ইউরোপীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। রাষ্ট্র ব্যাপারে এই নীতি Imperialism মূর্ত্তি ধারণ করিল। অক্টোপোসের মত এই ভীষণ Imperialism তাহার সর্ব্বতঃ প্রসারিত বাহুদ্বারা, দুর্ব্বলকে, অসহায়কে, ক্ষুদ্রকে টানিয়া তাহার মরণের জালে ফেলিতে লাগিল। সমাজে ইহা সহানুভূতির বীজ নষ্ট করিয়া প্রতিযোগিতাকে বাড়াইয়া তুলিল। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতাকে ডাকিয়া আনিল। সাহিত্যে ইহা অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও বর্ণ-বিদ্বেষের বহ্নি জ্বালাইয়া দিল। ইহারই পরোক্ষ ফল স্বরূপ নিহিলিষ্ট ও "প্রগল্‌ভা রমণীদলের" সৃষ্টি হইল। এই যে আজও চক্ষের সম্মুখে বল্কান-সমরে নিষ্ঠুর পৈশাচিক লীলা, নরশোণিতের হোলি-উৎসব দেখিতেছি; এই যে লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণ ও কোটী কোটী দরিদ্রের অর্থ উড়িয়া যাইতেছে;—ইহা সেই জীবন-সংগ্রাম-নীতিমূলক সভ্যতারই পরিণাম!

কিন্তু জীবজগতে সৃষ্টির বিকাশে আরও একটা নিয়ম কার্য্য করিতেছে। তাহার প্রভাব এই সংগ্রাম-নীতি অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে ;—বরং অনেকস্থলে তাহার কার্য্যই প্রবলতর বোধ হয়। তাহাকে বলা যাইতে পারে—সহানুভূতি ও প্রেম, পরস্পরের সাহায্য ও মৈত্রী। অতি নিম্নতম কীট পতঙ্গজাতীয় জীব হইতে সভ্যতম মনুষ্য সমাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই সহানুভূতি ও মৈত্রীর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, মানুষের ধর্ম্ম ও নীতি সকলই এই নিয়মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে * প্রিন্স ক্রপটকিন এই তত্ত্বটী অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা প্রধানতঃ এই সহানুভূতি, প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মানুষে মানুষে এই যে বিরোধ এই যে সংগ্রাম তাহা অনিবার্য্য হইলেও, এই নীতিকে সে যথা সম্ভব দূরেই রাখিতে পারিয়াছিল। প্রকৃতির মধ্যে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের যে প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, তাহা সে অতি পূর্ব্বকালেই অনুভব করিয়াছিল। তাহার শান্ত নির্জ্জন তপোবন হইতে উপনিষদের যে উদাত্ত সঙ্গীত উঠিয়াছিল, তাহাতে এই ত্যাগ ও প্রেমের সুরই ধ্বনিত হইয়াছিল। এই খানেই "হিমাচল পাদমূলে, শৈলজা রোহিণীকূলে" যে 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী বিঘোষিত হইয়াছিল, "আজিও অর্দ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চিত্তে" তাহা শুনিতেছে। এই পরম সাম্যের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।
(গীতা—৬।৩২)

এই মহা মিলন মন্দিরেই আর্য্য ও অনার্য্য, শক ও হূণ, তাতার ও তুর্কী সকলেই সমভাবে আলিঙ্গিত হইয়াছিল। কেবল এইখানেই রাষ্ট্র-নীতিতে অসির পরিবর্ত্তে প্রেমের ব্যবহার প্রথম দেখা গিয়াছিল ; সম্রাট্ অশোক প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে মৈত্রীর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। এই ভারতীয় সাহিত্যেই স্বার্থ ও বিলাসিতার পরিবর্ত্তে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আনন্দ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের (পরবর্ত্তী কালের জাতিভেদ নয়।) প্রতিষ্ঠা দ্বারা উচ্চ নীচ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অধিকার-সাম্যের চেষ্টা করা হইয়াছিল আজ—কেবল আজ কেন বহুদিন হইতেই—সে আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই,—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কেবল প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই যে "সংগ্রামনীতি": —"যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে"র আদর্শ, তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, ইংলণ্ডের আধুনিক প্রধান কবি রাডিয়ার্ড কিপলিং-এ কিপলিং Imperialism এর মুখপাত্র—সর্ব্বপ্রধান প্রবক্তা বলিলেই হয়। তাঁহার গান ও কবিতায় তিনি মানুষের এই সংগ্রামবৃত্তি—প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। রাষ্ট্রের জিগীষা ও ক্ষমতা-বিস্তারকেই রমণীয় আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সাম্যের আদর্শ সর্ব্ববিধ সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির মূল-

* P. Kropotkin's "Mutual aid—a factor of Evolution."

সূত্র—তিনি তাহার উত্তরসাধক নহেন; যে আত্মম্ভরিতা ও স্বাজাত্যের অহঙ্কার জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, পরজাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাঁহার গানে তাহারই সুর বাজিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আজ যে এই ছাড়াছাড়ি ভাব—কৃষ্ণের প্রতি শ্বেতের এই যে ঘৃণা—যাহার প্রভাব অষ্ট্রেলিয়া, কালিফোর্ণিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা সর্বত্রই আমরা দেখিতে পাইতেছি,—কিপলিং তাহার পরিপুষ্টির জন্য কম সাহায্য করেন নাই। তিনিই প্রথমে গাহিয়াছিলেন,—

"The East is East, and West is West
Never the twain shall meet."

তাঁহার এই বাণী যে মানব-সভ্যতার কত অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা হয়ত তিনি জানেন না। তাঁহারই গল্পে কাহিনীতে তিনি ভারত-বর্ষীয়দিগকে এমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহারা পাশ্চাত্যজাতির চক্ষে অত্যন্ত হীন ও বর্ব্বর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "Plain Tales from the Hills"-এর উল্লেখ করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত বিকাশ হয় সাহিত্যে ও কবিতায়। জন-সাধারণ বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা কবির বাণীতেই বেশী অনুপ্রাণিত হয়। তাই ডারুইন ও হাক্সলি অপেক্ষা, তাঁহাদের গায়ক কিপলিংই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

অপরপক্ষে ভারতবর্ষের সেই বিস্মৃতপ্রায় সত্যটীর—সহানুভূতির ও প্রেমের—বিশ্বমৈত্রীর ও ভালবাসার সেই পুরাতন আদর্শের, বিশেষ বিকাশ হইয়াছে আমাদের রবীন্দ্রনাথে। ভারতমাতার মন্দিরে হোম-ভস্মের মধ্যে যে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত ছিল, তিনিই আজ তাহাকে ভাল করিয়া জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী তাঁহার প্রাণে বাজিয়াছে; তাই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে সংগ্রামের ও বিরোধের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও সংঘর্ষের কোলাহল উঠিতেছে, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া, সেই সকল সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যেই যে প্রেম ও মৈত্রীর মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ আপনার বীণা সেই সুরেই বাঁধিয়াছেন। কিপলিংএর গান শুনিয়াছেন; এইবার রবীন্দ্র-নাথ কি গাহিতেছেন শুনুন—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে;
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নর দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।

* * * *

রণ ধারা বাহি, জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে,
ভেদি মরুপথ, গিরিপর্ব্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

* * * *

এসহে আর্য্য, এস অনার্য্য হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এস এস খৃষ্টান,
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত কর অপনীত
সব অপমান ভার।

কোন্ সাহসে কবি এই গান গাহিতেছেন?

"তোমারে জানিলে, নাহি কেহ পর
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

যাঁহাকে জানিলে সকলকেই জানা হয়—সকলকেই আপনার বোধ হয়, ভারতীয় সাধনার পুণ্যফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাই এই গান গাহিতে পারিয়াছেন। এ গান শুধু ভারতের গান নহে এ জগতের গান—বিশ্বমানবের গান।

সংগ্রাম ও সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় হইলেও সৃষ্টির একমাত্র নিয়ম নহে। মৈত্রী ও প্রেমই সৃষ্টি-চক্রের উচ্চতর নীতি। প্রবলের জয়, 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে' স্বার্থের পরিপুষ্টি হইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি প্রেম অসহায়ের প্রতি প্রীতিতেই মানবত্বের পরিতৃপ্তি হয়। তাই সংগ্রাম ও সংঘর্ষে—স্বার্থের প্রতিযোগিতাতে মানব-সমাজ কখন তৃপ্ত হইতে পারে না। তাহাতে সুরাপানের উত্তেজনা আনিতে পারে, অস্বাভাবিক উন্মাদনার উৎসাহ জন্মাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ে শান্তি দিতে পারে না। সুরাপানান্তে অবসাদের ন্যায় কালে এমন একটা অবসাদ উপস্থিত হয় যে সেই সব আর ভাল লাগে না। তখন প্রাণ মহত্তর, উন্নততর, পবিত্রতর কিছু চায়। ইউরোপের আজ প্রায় সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপ তাহার সভ্যতার কর্কশ কোলাহল, জীবন-সংগ্রামের ভীষণ সঙ্গীত, বিলাস-লালসার সেই তীব্র হলাহল আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। তাহার অন্তরের অন্তরস্থল প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর, ত্যাগ ও আনন্দের গান শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ আজ সেই গান লইয়া ইউরোপের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। এই জন্যই বুঝি বিধাতা তাঁহাকে স্বাজাত্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের রাজ্যের মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই রবীন্দ্রনাথকে দিয়া বাণার তার নূতন সুরে বাধাইয়াছেন। পরিশ্রান্ত ইউরোপ তাঁহার গান বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে। যেটী সে চায়, তাঁহার মধ্যে সেইটীরই যেন সে আভাস পাইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া পাশ্চাত্যের এত আনন্দ—রবীন্দ্রনাথের সেখানে এত সম্বর্দ্ধনা।

বিশ্বরাজ্যে কিছুই নষ্ট হয় না—কিছুরই অপব্যয় নাই। একদিন যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মুখে যে সকল মহাসত্য প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা লুপ্তপ্রায়, বিস্মৃতপ্রায় হইলেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিধাতা তাহাকে গড়িয়া উঠিতে দিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সাধন সে করিবেই। মানব-সভ্যতায় তাহার নূতন দান যাহা দিবার আছে, তাহা না দিয়া তাহার ফিরিবার উপায় নাই। সেই নূতন দান—সংগ্রামের স্থানে প্রেম, প্রতিযোগিতার স্থানে সহানুভূতি, ভোগ ও বিলাসের স্থানে ত্যাগ ও বৈরাগ্য, জাতি-সংঘর্ষের স্থানে বিশ্বমৈত্রী। ভারতের রবীন্দ্রনাথ আজ পাশ্চাত্য মানব-সভায় সেই গানই শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব, ইহাতেই ভারতের গৌরব। আর ইহার জন্য শুধু ভারতবাসী কেন সমগ্র মানব-সমাজের তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(ভাদ্রের বঙ্গদর্শনের ৩৬৮ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

আযৌবন ব্রাহ্ম-সমাজে থাকিয়া, আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, আমার পূর্ব্বকার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্ম সাধনকে ভ্রান্তিবোধে পরিহার করিতেছি, এমন নহে। আমি যদি খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান্ হইতাম, তাহা হইলে, আমার খৃষ্টীয়ানী বা মুসলমানী বিশ্বাসকে পরিত্যাগ না করিয়া, কোনও মতেই বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বা বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিতে পারিতাম না। কারণ খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্ম্মের সঙ্গে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মের নহে, কিন্তু জগতের অপর সকল ধর্ম্মেরই একটা আত্যন্তিক বিরোধ আছে। বাইবেলের অতিরিক্ত কোনও সত্য শাস্ত্র আছে, কিম্বা খৃষ্টীয়পন্থা ব্যতীত জীবের মুক্তির আর কোনও পন্থা আছে, খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম ইহা স্বীকার করে না। মুসলমান্ ধর্ম্ম ও কোরাণ শরীফ এবং হজরত মোহম্মদকে জগতের এক মাত্র তত্ত্বগ্রন্থ ও আখেরী নবী বা প্রবক্তা বলিয়া মনে করে, এগুলিকে ছাড়িয়া এখন আর কেহ সত্যলাভ বা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যিশুখৃষ্ট ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বা পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে, খৃষ্টীয়ানের ধর্ম্মহানি হয়। কোরাণ ও হজরতের সিদ্ধান্তের বা সাধনের বাহিরে কোনও সিদ্ধান্ত বা সাধন অবলম্বন করিলে, মুসলমান্ কাফের হইয়া যায়। খৃষ্টীয়ানের চক্ষে বাইবেল ও যিশুখৃষ্ট, মুসলমানের চক্ষে কোরাণ শরীফ এবং হজরত মোহম্মদ—এ জগতে সত্যের এক মাত্র প্রামাণ্য ও মুক্তির অনন্য পন্থা। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এরূপ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র বা অতিমানুষ অবতার কি পয়গম্বর নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবের সহজ জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মগণ কোনও ঐশ্বরিক শাস্ত্র মানেন না, কোনও ঐশ্বরিক অবতারে বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধন সকলই একমাত্র স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর এই স্বানুভূতি সকলের সমান নয়। এই স্বানুভূতি সত্যের একদিক্ মাত্র দেখে, একাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। স্বানুভূতিগ্রাহ্য সত্যের বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সর্ব্বদাই অসত্য ও ভ্রান্তি মিশিয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই ব্রাহ্মগণ কোনও শাস্ত্র বা গুরুকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আর ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে সর্ব্বপ্রকারের প্রামাণ্যমর্য্যাদাচ্যুত করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, ব্যষ্টিভাবে বা সমষ্টিভাবে আপনাদের স্বাভিমতকে কখনই অভ্রান্ত সত্য ও আখেরী পন্থা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। ব্রাহ্মগণ আজ সত্যের ও সাধনের যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন, তার বাহিরে

উপরে আর সত্য বা সাধন নাই, এ কথা বলিলে ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ এ কথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন ; তাঁদের ধর্ম্ম শুদ্ধ স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠ নহে। এই জন্য খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান্ ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্বের একটা স্বাভাবিক ও আত্যন্তিক বিরোধ আছে ; ব্রহ্মসিদ্ধান্তের বা ব্রাহ্মসাধনের সঙ্গে সেরূপ কোনও বিরোধ নাই। খৃষ্টীয়ান্ খৃষ্টীয়সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ না করিয়া, কদাপি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। মুসলমানও স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকে তাহা পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মের ধর্ম্মহানি হয় না। ব্রাহ্ম-সমাজের জনসাধারণে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে আপনাদের দলের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া গোস্বামী মহাশয় আপনি কোনও দিন আপনার সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত ও সাধনের বিরোধী বা বহির্ভূত মনে করেন নাই।

অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব মনে করিতেছি বলিয়া আমি যে আজ আমার পূর্ব্বকার সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ভুল বলিয়া পরিহার করিতেছি, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। সেগুলিকে একটু ছাড়াইয়া উঠিতেছি, ইহা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনও পুরাতন অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া, আর অসত্য বলিয়া কোনও সাধন সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করা, এক কথা নহে। [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতাম না। দেশ-প্রচলিত কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত গতানুগতিক বৈষ্ণবধর্ম্মে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। এই কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-বস্তুই যে তত্ত্ববস্তু, এখনও ইহা বুঝি নাই। দুনিয়ায় খৃষ্টীয়ান্ অসংখ্য, কিন্তু খৃষ্টতত্ত্বের সন্ধান, কয়জনেই বা পাইয়াছে? সেইরূপ এদেশে কৃষ্ণপন্থীও অসংখ্য, কিন্তু ইহাদের কয়জনেই বা তত্ত্ববস্তু যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবস্তু সে কথা বোঝেন বা বুঝিতে চা'ন,—সে জিজ্ঞাসারই উদয় হইয়াছে কৈ? জগতের কোথাও গতানুগতিক পন্থায় অনুসরণ করিয়া কেহ তত্ত্ববস্তু লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত, মুমুক্ষু সাধকই কেবল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন। এরূপ সাধক সকল সম্প্রদায়েই—লাখে না মিলয়ে এক। সুতরাং গতানুগতিক বৈষ্ণবসমাজে প্রাকৃতজনে যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন, এবং আজিও করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকৃত তত্ত্ববস্তুরূপে প্রকাশিত হন নাই ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই কিম্বদন্তি-মাত্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া আসা, আর শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে বর্জ্জন করাও, এক কথা নহে। যাহাকে জানি নাই, যাহাকে পরখ করিয়া দেখি নাই, দেখিবার প্রেরণা বা অবসরও পাই নাই, তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। সুতরাং যে কৃষ্ণতত্ত্বকে বা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে অসত্য ও ভ্রান্ত বলিয়া বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহাকেই আবার সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, এমন বলা যায় না। তবে প্রথম যৌবনে যে ব্রহ্মসিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াছিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেছি, এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত

নাই। কিন্তু সে সিদ্ধান্তের কোনও বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি এমনটা মনে করি না। আমি আজ যাহা বিশ্বাস করিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না, ইহা জানি। কিন্তু আর দশজনে কোনও মত বা সিদ্ধান্তকে সত্য মনে করে বলিয়া, তাহাদের কথায় আমি কোনও দিনই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। লোকমতের মুখাপেক্ষী হইয়া, প্রচলিত সংস্কারের আনুগত্য স্বীকার করিবার শক্তি বিধাতা আমায় দেন নাই। সে সাধন আমার নাই। এ শক্তি ও এ সাধন থাকিলে, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হইয়া, প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, সারাজীবন স্রোতের শেয়ালার মতন ভাসিয়া বেড়াইতাম না। যৌবনাবধি আপনার স্বাভিমতের উপরে নির্ভর করিয়াই নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার স্বাভিমত যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তখনকার ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মতামত ও মতিগতির সঙ্গে তার ঐক্য দেখিয়াই, ব্রাহ্মসমাজে আসি, দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্র, শিবনাথ বা অপর কাহারো আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের মুখ চাহিয়া, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হই নাই। যে স্বানুভূতির স্বাধীনতার খাতিরে পিতার কথা মানি নাই, স্বজনগণের অনুরোধ শুনি নাই, ব্রাহ্মসমাজের নানাদিগ্‌দেশাগত সদ্যঃপরিচিত সভ্যগণের বা আচার্য্যগণের অনুমত বা অনুগত হইয়া চলিবার সুবুদ্ধি সাধন করিয়া, সে স্বানুভূতিকে বিসর্জ্জন দিতে কোনও দিনই পারি নাই। এই জন্য আমার ব্রাহ্মধর্ম্মটা চিরদিনই আমার নিজস্ব বস্তু ছিল, আজিও তাহা আমারই নিজের অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়া আছে।

আর ইহাই তো খাঁটি স্বানুভূতির পথ। ব্রাহ্মধর্ম্মে আগম-নিগমের প্রতিষ্ঠা নাই, শাস্ত্র গুরুর প্রামাণ্য নাই; আছে কেবল এক আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি। কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরে সত্যের প্রামাণ্য বা সাধনের নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রের উপরেও এই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর গুরু-শাস্ত্রমাত্র-প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠা বালির বাঁধের মতন, অতিশয় দুর্ব্বল; সামান্য সন্দেহের বাত্যামুখে উড়িয়া গুড়িয়া যায়। ইহাতেও প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠে না। ইহা মন্দ এই কোমল শ্রদ্ধাতে লোককে আচারবান্ করিতে পারে মাত্র, কিন্তু সাধক করিতে পারে না। শাস্ত্র যখন তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশের দ্বারা সার্থক হইয়া, স্বানুভূতির দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনই তাহা প্রামাণ্য-মর্য্যাদা লাভ করে। এই জন্যই শাস্ত্র, গুরু ও স্বানুভূতি—এই তিনের একবাক্যতাকেই সত্যের প্রকৃত প্রামাণ্য বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত এই প্রামাণ্যের উপরে আপনার ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। রাজা রামমোহন এ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রকৃতপক্ষে কেবল স্বানুভূতির উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত আমিও কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছিলাম—এখনও সে আশ্রয় পরিত্যাগ করি নাই। স্বাভিমতের হাত ধরিয়া বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধানেই প্রথমে ব্রাহ্ম-

সমাজে আসিয়াছিলাম। কোনও দিনই ব্রাহ্ম-সমাজের লোকমতকে সেই সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করি নাই। দেবেন্দ্রনাথের মতকে সংকীর্ণ ও কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্যকে কল্পিত বলিয়া ছাড়িয়া আসিয়া বিদ্যা-বয়স-সাধন-ও-চরিত্র-গত উৎকর্ষাপকর্ষ-নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্যের মতামতকে সত্যের প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করাতে, আর কারো ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা পাইতে যদি পারে পারুক আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা পায় বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রথম যৌবনে স্বানুভূতির খাতিরে সনাতন শ্রুতি ও প্রাচীন স্মৃতির প্রামাণ্যকে বর্জ্জন করিয়াছিলাম। আজ শাস্ত্র ও স্বানুভূতি উভয়কে ভাসাইয়া দিয়া, পঞ্চাশ ষাট-বৎসরের স্মৃতিকে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্য-রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যাঁরা এ পথে, এই ভাবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শুদ্ধতা রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদেরই হাতে রাম-মোহন-প্রবর্ত্তিত সমাজের অপঘাতমৃত্যু ঘটিতেছে। এ মরণকে যে আলিঙ্গন করিতে চাহে না সেই যে ব্রাহ্মসমাজকে বর্জ্জন করিতেছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। যেখানে জীবন, সেইখানেই গতি ও বৃদ্ধি। যেখানে বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি, সেইখানেই পরি-বর্ত্তন। সুতরাং পরিবর্ত্তনকে ভয় করিলে, মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে হয়, অমৃতের পথে চলা যায় না। স্বাভিমতের হাত ধরিয়া, স্বাধীনতার ও সত্যের সন্ধানে, প্রথমযৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। ক্রমে শুদ্ধ স্বানু-ভূতির উপরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, সদ্গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া, তাঁরই কৃপায়, ধীরে ধীরে সার্থক শাস্ত্রেরও আশ্রয়লাভ করিতেছি। একদিন ভাবিয়াছিলাম কেবল আমি যাহাকে সত্য ভাবি, তাহাই বুঝি সত্য। এখন দেখিতেছি, আমার স্বাভিমত সত্যের একদিক্ মাত্র প্রকাশিত করে। আমার স্বাভিমতের সত্যাসত্যের কষ্টিপাথর বিশ্বজনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতারই নামা-ন্তর শাস্ত্র। আর এই শাস্ত্রেরও সত্যাসত্যের কষ্টিপাথর আছে। সে কষ্টিপাথর সাধনা-ভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু। এই তিনের কেহই স্বতন্ত্র ও স্বপর্য্যাপ্ত নহেন। শাস্ত্র গুরুবাক্যকে সপ্রমাণ করে। গুরু শাস্ত্র-বাক্যকে সার্থক করেন। আর স্বাভিমত শাস্ত্র ও গুরু উভয়কে সপ্রমাণ করে। গুরু গ্রহণ করিয়া স্বাভিমতকে বর্জ্জন করি নাই, তাহাকে সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। শাস্ত্রকে মর্য্যাদা দিয়া গুরু এবং স্বানুভূতির প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করি নাই, বরং দৃঢ় করিয়াছি। যে, পথ ধরিয়া প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া-ছিলাম, সেই পথেই গুরু পাইয়াছি, শাস্ত্র পাইতেছি। কুলগুরু ছাড়িয়া সদ্গুরু পাইয়াছি। কুশাস্ত্র ছাড়িয়া সুশাস্ত্র পাইয়াছি। মানস-কল্পনাকে ছাড়িয়া বিশুদ্ধ স্বানুভূতির সন্ধান পাইতেছি। কিম্বদন্তিপ্রতিষ্ঠিত, প্রাণহীন ব্রহ্মোপাসনা ছাড়িয়া, গুরুকৃপায়, অতি অকিঞ্চন এবং অকৃতি হইয়াও, ধীরে ধীরে পরমতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্বের আভাস পাইতেছি। জীবন মাত্রেই গতিশীল। গতিমাত্রেই পরি-বর্ত্তন আনে। বাঁচিয়া থাকিলেই চলিতে হয়। চলিতে গেলেই ঘাটীর পর ঘাটী পার হইয়া যাইতে হয়। নিতান্ত জড়ত্ব প্রাপ্তি না হইলে, জীবনের প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তন-স্রোতের বাহিরে পড়িয়া থাকা সম্ভব হয় না। জীবনে যত

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আরো কত পরিবর্ত্তন ঘটিবে। জন্মে জন্মে কতভাবে এমনি করিয়া বিবর্ত্তিত হইয়া ফুটিয়া উঠিব। ইহাতে ভয় করি না। ইহাতে লজ্জার বা দুঃখের কথাও কিছুই নাই। তবে যেন খেই হারাইয়া না যাই, কেবল একটিমাত্র চাই।

আর, এক সময়ে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করিতাম, আজ কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধানে ফিরিতেছি বলিয়া যে খেই হারাইয়াছি এমনও বলা যায় না। কি করিয়া এ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই, তাহারও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের মূলসূত্রটী ধরিয়া বিচার করিলেই ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে যে এই কৃষ্ণতত্ত্বের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেশ-প্রচলিত পূজা-পদ্ধতিতে বহুবিধ সাকার দেবমূর্ত্তির বহুল প্রতিষ্ঠা দেখিয়াই, আমাদের বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, মানুষ আপনার হাতে তাঁহার কোনও প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এই সাকারোপাসনার বিরুদ্ধেই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা হয়। তত্ত্ববস্তুর সন্ধানে যাইয়া, ব্রাহ্মসাধারণে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন নাই; সাকারোপাসনার প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই, ইহাকে অবলম্বন করেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের মূল নিরাকারবাদ, প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। দেশপ্রচলিত উপাসনার দেবমূর্ত্তি সকল ঈশ্বর-মূর্ত্তি নহে, কেবল ইষ্ট মূর্ত্তি মাত্র, এ কথাটা আমরা তখন বুঝি নাই। এখনও অনেকে ইহা জানেন না। ঈশ্বর-তত্ত্ব যে নিরাকার তত্ত্ব জগতের স্রষ্টা পাতা যিনি, তাঁর যে কোনও হাত পা নাই, হিন্দু এ কথা চিরদিনই জানেন ও বুঝেন। তিনি কখনও ঈশ্বরমূর্ত্তি রচনা করেন নাই। যে মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া হিন্দু পূজা অর্চ্চনাদি করেন, তাহা তাঁর ইষ্ট মূর্ত্তি মাত্র, বিশ্বনিয়ন্তার প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিচ্ছবি নহে। রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টীয়ানের যিশুমূর্ত্তি বাস্তবিকই ঈশ্বরমূর্ত্তিজ্ঞানে পূজিত হন। এইজন্য এই সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানেরা নিজেরা মূর্ত্তিপূজা করিয়াও, অপর সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিপূজাতে ঈশ্বরের অবমাননা হয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসকেরা ঈশ্বরের অবমাননা করেন, হিন্দু শিবোপাসক কদাপি এরূপ বলেন না। তাঁরা নিজেরাই শিবলিঙ্গের পূজা করেন কিন্তু তাই বলিয়া যারা অন্য মূর্ত্তির ভজনা করেন, তাঁরা অধর্ম্ম করিতেছেন এমন কখনও ভাবেন না। হিন্দুর উপাসনার বিভিন্ন মূর্ত্তিসকল, ঈশ্বরমূর্ত্তি নহে, ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অন্তরে প্রকাশিত, তাঁর বিশিষ্ট সাধনার সিদ্ধমূর্ত্তি মাত্র। এ সকল ইষ্ট মূর্ত্তি মূলে ও আদিতে সাধকবিশেষের সমাধির অবস্থায় তাঁহাদের অপরোক্ষানুভূতিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মূর্ত্তি অতিন্দ্রীয়, চিন্ময়, তার বাহিরে কোনও রূপরসাদি থাকে না। সাধক এই অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে, সাধনসৌকর্য্যার্থে, আপনার মানসপটে ধরিয়া রাখিবার জন্য, প্রথমে তার অনুরূপ শব্দাত্মিকা ধ্যানমূর্ত্তি রচনা করেন; এবং ক্রমে তাহাকে আপনার সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিবার জন্য, সাকার দেবমূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তোলেন। ইহাই আমাদের দেশের

প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার ভিতরকার কথা। ইহারই অর্থ—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।" এই "রূপ" একজন আর একজনের জন্য গড়িয়া দিতে পারে না। সাধকেরা নিজে আপনাদের সাধনসৌকর্য্যার্থে আপন আপন ইষ্টদেবতার এ সকল মানস-মূর্ত্তি রচনা করেন। এ সকল ঈশ্বরমূর্ত্তি নহে—ইষ্টমূর্ত্তি মাত্র। কিন্তু গতানুগতিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া যাঁরা এই সকল মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাঁরা এ তত্ত্ব জানেন না। আমরা'ও ইহা জানিতাম না। এই জন্যই এই সকল বাহ্য-পূজার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, এই সাকারোপাসনার প্রতিকূলে, নিরাকারোপাসনা প্রবর্ত্তিত করি। অর্থাৎ দেশপ্রচলিত সাকা-রোপাসনার বিরুদ্ধে আমরা একটা নিরাকার-বাদেরই প্রতিষ্ঠা করি মাত্র, প্রকৃতপক্ষে কোনও নিরাকারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করি নাই।

ফলতঃ শঙ্করবেদান্ত-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতত্ত্বই একমাত্র সত্য নিরাকার তত্ত্ব। সে তত্ত্ব নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। কেবলমাত্র ব্রহ্মা-ত্মৈকত্বানুভূতির দ্বারা সে নিরাকার তত্ত্বকে ধরিতে পারা যায়। কোষপঞ্চক যতক্ষণ না ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এই জন্য ব্রহ্মের স্বরূপো-পাসনাকেই শঙ্করসিদ্ধান্ত একমাত্র সত্য উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল ইন্দ্রিয়-চেষ্টা একান্ত নিরস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, এ উপাসনা সম্ভব হয় না। সমাধির অবস্থা লাভ করিলে পরেই কেবল সাধক স্বরূপো-পাসনার অধিকারী হন। এ অবস্থা অতি দুর্লভ। যতদিন না এ অবস্থালাভ হইয়াছে, ততদিন জীব ভিন্ন অধিকারের সাধন ভজন করিবে। নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে শঙ্করসিদ্ধান্ত প্রতীকোপাসনার এবং মধ্যম অধিকারীর জন্য সম্পদুপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাস-জনিত উপাসনা বলে। 'অন্যত্র দৃষ্ট পরত্রাব-ভাসঃ—'কে অধ্যাস বলে। অন্য দেশে ও অন্যকালে যে বস্তু-বিশেষ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, যে দেশে ও যে সময়ে সেই বস্তু উপস্থিত নাই, সেখানে ও সেকালে অন্য বস্তুতে তার আরোপ করার নাম অধ্যাস। একদিন বনে সর্প দেখা গিয়াছিল। গৃহপ্রাঙ্গণে যে রজ্জু পড়িয়া আছে, তাহাতে সেই সর্পের জ্ঞান আরোপ করিয়া, এই রজ্জুকে সেই সর্প মনে করার নাম অধ্যাস। অন্তরে কোনও দিন ইষ্টদেবতার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে যে কাষ্ঠলোষ্ট্রে তাহা বস্তুতঃ নাই, তাহাতে আরোপ করাই এই প্রতীকোপা-সনার লক্ষণ। শঙ্করবেদান্ত মতে দেশ-প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা এই প্রতীকোপাসনারই অন্তর্গত। নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে ইহাই বিহিত। মধ্যমাধিকারীর পক্ষে বেদান্ত সম্পদুপাসনার বিধান দিয়াছেন। সম্পদুপাসনা সম্পদ-জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দুই বস্তুর মধ্যে কোনও সামান্য ধর্ম্ম দেখিয়া, ক্ষুদ্রতর ও আয়ত্তাধীন বস্তুর সাহায্যে বৃহত্তর ও অনায়ত্ত বস্তুর যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকেই সম্পদ্‌জ্ঞান কহে। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতন গোল —এই ভৌগোলিক জ্ঞানকে সম্পদ্‌জ্ঞান বলা যাইতে পারে। যেমন পৃথিবীর ও কমলালেবুর মধ্যে একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুরও একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ—আর কিছুর দ্বারা সূর্য্যকে

দেখা যায় না। আর সূর্য্য জগৎপ্রকাশক—আপনি প্রকাশিত হইতে যাইয়াই জগৎকে প্রকাশিত করেন, জগৎকে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই আপনিও প্রকাশিত হয়েন। স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব সূর্য্যের ধর্ম্ম। ইহা ব্রহ্মেরও ধর্ম্ম। চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মও স্বপ্রকাশ ও জগৎপ্রকাশক। সুতরাং সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মের এই সামান্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ সূর্য্য গ্রহের ধ্যানযোগে ব্রহ্মোপাসনা করা সম্পদুপাসনা। মধ্যম অধিকারীর জন্য বেদান্ত এই জাতীয় উপাসনারই বিধান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকে স্বরূপ উপাসনা বলা যায় না। স্বরূপ-উপাসনায় সকল ইন্দ্রিয়-চেষ্টা একান্তভাবে নিরস্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় তাহা হয় না। বাক্য এই উপাসনার বাহন। উপমান ও অনুমান এই উপাসনার প্রাণ। উপমান ও অনুমান সম্পদ্‌জ্ঞানেরই আশ্রয়, স্বরূপজ্ঞানের ভিত্তি নহে। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনাকে সম্পদুপাসনাই বলা যায়। এই উপাসনায় ইষ্ট দেবতার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচিত হয় না বটে, কিন্তু বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব অবাঙ্‌মনসোগোচর। সে তত্ত্বকে বাক্যমনের গোচরীভূত করিতে গেলেই আর তার নিরাকারত্ব থাকে না। ব্রহ্ম-সমাজের বাঙ্ময়ী উপাসনা ও নিরাকার ব্রহ্মেতে মানসধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে অধ্যাসও আছে। এ-ও সত্য-উপাসনা নহে। প্রচলিত তথাকথিত সাকারোপাসনার আশ্রয় ইষ্টদেবতার চক্ষুগ্রাহ্যরূপ, প্রচলিত তথাকথিত নিরাকারোপাসনার উপজীব্য রূপ নহে, কিন্তু রূপক। রূপ আর রূপকে ভেদ, পার্থক্য, হিন্দুসমাজের মূর্ত্তিপূজাতে আর ব্রাহ্মসমাজের মামুলী নিরাকার উপাসনায় সেই পার্থক্য মাত্র রহিয়াছে। মূলে দু'এর মধ্যেই অধ্যাস অর্থাৎ যাহা উপস্থিত নাই, তার আরোপ আছে।

প্রকৃত নিরাকারতত্ত্ব আর নির্গুণতত্ত্ব একই কথা। যাহা নিরাকার, তাহাই নির্গুণ, তাহাই নির্ব্বিশেষ। ভেদপ্রতিষ্ঠা করাই, আকারের মুখ্য ধর্ম্ম। আকাশবস্তু ত নিরাকার। কিন্তু যখনই এই আকাশ ভিন্ন ভিন্ন আধারে আবদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করে, তখনই তাহা ঘটাকাশ, পটাকাশরূপে সাকার হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্রহ্মবস্তু যখনই জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন, তখনই বিশিষ্ট হইয়া, নিরাকারধর্ম্ম হারাইয়া ফেলেন। ব্রহ্ম যদি আমা হইতে একান্ত ভিন্ন হন, তাহা হইলে, আমার আমিত্বের সীমাই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ ও সাকার করিয়া তোলে। কোনও বিশিষ্ট গুণ আরোপ করিলেও অপর বিরুদ্ধগুণ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া, সেই সকল বিরুদ্ধগুণের দ্বারাই তিনি পরিচ্ছিন্ন ও সাকার হইয়া পড়েন। এই জন্যই, এ সকল অনর্থ নিরাকৃত করিতে যাইয়া, বেদান্ত ব্রহ্মবস্তুর নিরাকারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নির্গুণত্ব, নির্ব্বিশেষত্ব এবং অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শঙ্করসিদ্ধান্তের এই অদ্বৈততত্ত্বই একমাত্র সাচ্চা নিরাকার-তত্ত্ব। অপর যাবতীয় নিরাকারবাদ আছে, তাহা সত্য নয়, সত্যাভাস মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদও তাহাই। বিশুদ্ধ নিরাকারতত্ত্বের অনুশীলন করিতে ব্রাহ্মসাধককে পরিণামে [illegible]

দ্বৈত সিদ্ধান্তে যাইয়া পৌঁছিতে হয়। আর আপনার সম্প্রদায়ের এই নিরাকারতত্ত্বের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, ভক্তি-পন্থার অনুসরণ করিলে, তাঁহাকে পরিণামে বৈষ্ণববেদান্তের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে যাইয়া সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া ব্রাহ্ম সাধকের সম্মুখে আর তৃতীয় গতি নাই। ব্রাহ্মসমাজের মূল সিদ্ধান্ত ও সাধনার সঙ্গে একদিকে শঙ্করসিদ্ধান্তের অন্য দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের উভয়েরই কোনও ঐকান্তিক বিরোধ বা প্রকৃত অসঙ্গতি নাই। জ্ঞানপ্রধান ব্রাহ্ম সাধককে শঙ্কর-বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। ভাবপ্রধান ও ভক্তিপ্রবণ ব্রাহ্ম সাধককে সেইরূপ বৈষ্ণব-বেদান্তের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। আযৌবন যে ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের ও ব্রাহ্মসাধনের অনুসরণ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে প্রকৃত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনার কোনও ঐকান্তিক বিরোধ আছে বলিয়া বুঝি না। বরং ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া, লোকমতের মুখাপেক্ষী না হইয়া, যে ব্রাহ্মই আপনার সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসাধন করিবেন, তাঁহাকেই ইহ জনমে না হউক আর জনমে, কৃষ্ণতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাইয়া, কৃষ্ণভজনা করিতেই হইবে, এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে যতটুক খাঁটি সত্য আছে, তার সঙ্গে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই ও থাকিতেই পারে না।

ফলতঃ এ জগতে সত্যে সত্যে কোথাও কোনও বিরোধ নাই। কখনও কোনও বিরোধ সম্ভবে না। যাহা আছে তাহাই সত্য, এ সত্যের দুই পক্ষ, এক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, আর এক অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষানুভূতি। এ ছাড়া সত্যলাভের আর তৃতীয় পন্থা নাই। ব্যবহারিক সত্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের, আর পারমার্থিক সত্য আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দুই জাতীয় সত্যই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। আমাদের এই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাধীনে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কদাপি অসত্য হইতে পারে না। অসত্যটা সর্ব্বত্রই কল্পনার সৃষ্টি, যেখানে যে বস্তু বা যে ভাব নাই, কেবল কল্পনাই সেখানে তাহার আরোপ করিয়া অসত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই কল্পনা আমাদের মনোবৃত্তিকে নিয়তই আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা যাহা দেখি, সর্ব্বদাই তার চাইতে ঢের বেশী ভাবিয়া লই। যতটুকু সত্য বা বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বা আত্মসাক্ষাৎ-কারের বিষয়ীভূত হয়; আমরা সর্ব্বদাই আমাদের এই কল্পনাবলে তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া আপন আপন মনগড়া সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। আর আমাদের এইরূপ মনগড়া সিদ্ধান্ত সকলই দুনিয়ায় যত গোল বাধাইয়া তোলে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের "অন্ধের হস্তি-দর্শন ন্যায়"—এই কথাটাকেই অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। হাতী জন্তুটা কেমন, এই কথাটা জানিবার জন্য অন্ধেরা হাতীর নিকট যাইয়া প্রত্যেকে তার একটা একটা অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া আসিল। একজন হাতীর কান ধরিয়া আসিল, আর একজন তার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া আসিল, আর একজন তার পায়ে ধরিয়া আসিল। হাতীর

কানটা যে কুলার মতন, শুঁড়টা যে অজগর সাপের মতন, পা' টা যে থামের মতন, ইহা মিথ্যা নয়। কিন্তু কান, শুঁড়, পা তো আর গোটা হাতী নয়। অন্ধেরা সে গোটা হাতীকে তো জানিতেও পারে নাই। তারা তার কেবল একটা একটা অঙ্গের জ্ঞানই লাভ করিয়াছিল, অথচ আপন আপন কল্পনা-বলে সেই অঙ্গকেই অঙ্গী ভাবিয়া লইয়া পর স্পরের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা বাধাইয়া দিল। যত-টুকু ইহারা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু যতটুকু কল্পনা করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহারা যদি কেবল আপন আপন প্রত্যক্ষ সত্যটুকুরই প্রতিষ্ঠা করিতে যাইত, কোনও গোলই বাধিত না। হাতীর কানটা কুলার মতন বলিয়া তার শুঁড়টা যে অজগরের মতন বা তার পা'টা যে থামের মতন নয় বা হইতে পারে না, —এমন কোনও কথা নাই। ইহারা যতটুকু নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। বিরোধ বাধিয়া উঠিল, তাদের কল্পিত মনগড়া হাতীগুলোকে লইয়া। আপন আপন কল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই ইহারা পরস্পরের সঙ্গে এই মারামারিটা বাধাইয়াছিল।

মানুষ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসাধন লইয়া এ জগতে যে মারামারি কাটাকাটি করে, তাহাও এই অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়েরই মতন। ধর্ম্মবস্তু বিরাট, ভূমা অনন্ত। এ বস্তু সার্ব্বভৌমিক, বহুমুখী। বহুভাগ্যবলে মানুষ এই বিরাট তত্ত্বের কণামাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ কণামাত্র ধর্ম্মকেই সে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া অপর সকলের উপরে জাহির করিতে যায়। ইহাতেই যত গোল বাধে। আর বস্তু-বিশেষের অংশ বা অঙ্গ মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অংশ বা অঙ্গকেই সম্পূর্ণ অংশী বা অঙ্গিরূপে গ্রহণ করা মানস-কল্পনারই ধর্ম্ম। ধর্ম্মজগতে এই সকল মনগড়া সিদ্ধান্ত ও মানস-কল্পনা লইয়াই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে এত বাক্‌বিতণ্ডা ও মারামারি কাটাকাটি করিয়া থাকে। ফলতঃ কি ব্যবহারিক জগতে কি পারমার্থিক রাজ্যে কোথাও প্রকৃত সত্যে সত্যে কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই—থাকিতেই পারে না।

অতএব আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্তে যতটুকু খাঁটি সত্য আছে, অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তের যেটুকু ব্রাহ্মগণের নিজেদের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতা হইতে জন্মিয়াছে,—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের খাঁটি সত্যের ও বৈষ্ণব-সাধনার প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার ভেদ থাকা সম্ভব, বিরোধ হওয়া অসাধ্য। কিন্তু ভেদ আর বিরোধ যে একই কথা নয়, এ কথাটাও আমরা সকল সময় মনে করিয়া রাখি না।

ব্রাহ্মসমাজের মতের কতকগুলি ভাবাত্মক আর কতকগুলি অভাবাত্মক। ব্রহ্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত লক্ষণ আছে; আর কতকগুলি লক্ষণ, অপরাপর ধর্ম্মের সিদ্ধান্তে ও সাধনে যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নাই ও থাকিতে পারে না;—ব্রাহ্মগণ ইহাই বিশ্বাস করেন। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলিকে ভাবাত্মক বা "হাঁ"-বাচক বলা যাইতে পারে; শেষোক্ত লক্ষণ-গুলি অভাবাত্মক বা "না"-বাচক। ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের "হাঁ" বাচক কথাগুলি এই:—

(১) ঈশ্বর আছেন। এই ঈশ্বর বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্ম; তিনি অমৃতনিকেতন, শান্তস্বভাব, মঙ্গলসংকল্প, নিষ্কাম, অপাপবিদ্ধ, এবং একমেবাদ্বিতীয়।

(২) এই ঈশ্বর জীবের অন্তরে বাস করেন, তিনি অন্তর্য্যামী পুরুষ এবং জীবের নিত্য-উপাস্য।

(৩) মৃত্যুতে মানুষের দেহই নষ্ট হয়, কিন্তু তার আত্মবস্তু অবিনশ্বর ও অমর।

(৪) এই ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব উভয় তত্ত্বই মানবের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অর্থাৎ তাহার সহজজ্ঞান বা ইনটুইসনের দ্বারাই মানুষ এ সকল তত্ত্বকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারে।

এই গুলিই ব্রাহ্মসমাজের ভাবাত্মক বা হাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মসাধক ও আচার্য্যগণ এগুলিকে আপনাদের আন্তরিক অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা সাধনবলে পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে এ সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যকে আপন আপন বুদ্ধিবিচার সম্মত দেখিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল মত জগতের উন্নত ধর্ম্মমাত্রেই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, শাক্ত, বৈষ্ণব ইহুদী, প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ই এ সকল মতে বিশ্বাস করেন। এমন কি এগুলিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট মতও বলা যায় না। এগুলির দ্বারা অপরাপর ধর্ম্মসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের "হাঁ"-বাচক বা ভাবাত্মক কোনও বিশিষ্ট মত নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাস খৃষ্টীয়ানের বিশেষত্ব নহে; যিশুখৃষ্টে বিশ্বাসই খৃষ্টীয়ান্‌কে বিশিষ্ট করিয়াছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস মুসলমানেরও বিশেষত্ব নহে; হজরত মোহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রবক্তারূপে গ্রহণ করিয়াই, মুসলমান্ আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ কোনও "হাঁ"-বাচক বা ভাবাত্মক সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া, জগতের ধর্ম্মসমাজে কোনও প্রকারের বিশিষ্টতা লাভ করেন নাই। অভাবাত্মক প্রত্যয়ে, "না"-বাচক সিদ্ধান্তেই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মসমাজের "না" বাচক মত ও বিশ্বাসগুলি এই :—

(১) ঈশ্বরের কোনও অবতার নাই।

(২) কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র ভ্রান্তিশূন্য কিম্বা সত্যের একমাত্র ও অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য নহে।

(৩) কোনও ধর্ম্মোপদেষ্টা বা গুরু ঈশ্বরের শক্তি ও স্বভাবসম্পন্ন এবং ভ্রান্তিশূন্য হইতে পারেন না।

(৪) দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি হইতে পারে না।

(৫) কোনও মানুষকে বা অপর কোন সৃষ্টপদার্থকে, কিম্বা মানবহস্তরচিত কোনও পট বা মূর্ত্তি প্রভৃতিকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভজনা করা কর্ত্তব্য নহে।

এই অভাবাত্মক মতগুলিতেই, বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব। এইগুলির দ্বারাই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে ব্রাহ্মসম্প্রদায় বিশিষ্ট হইয়াছেন। আর অভাবাত্মক সিদ্ধান্ত মাত্রেই দ্বিবিধ ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিতে পারে; কতকগুলি "না"-বাচক সিদ্ধান্ত মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই প্রকাশিত হয়। মানবজ্ঞানের এই মূল প্রকৃতিকে ইংরেজিতে necessity of thought বলে। এই neces-

sity of thought হইতে যে সকল অভাবাত্মক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। যেমন যাহা সান্ত তাহা অনন্ত হইতেই পারে না। যাহা দেশে আবদ্ধ তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদিধর্ম্ম বা extension থাকিবেই থাকিবে। যাহা কালেতে প্রকাশিত তার পৌর্ব্বাপর্য্য বা succession না থাকিয়াই পারে না। এই "না"-বাচক সিদ্ধান্তগুলি মানব-জ্ঞানের মূল প্রকৃতির বা necessity of thought-এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব হইলেও, এ সকলের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষবৎই প্রবল। এ ছাড়া আর যত কিছু অভাবাত্মক বা "না"-বাচক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় তৎসমুদায়ই অনুমানের উপরে গড়িয়া উঠে। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা হইতে যুক্তিপরম্পরা আশ্রয় করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ হয় নাই, তার সম্বন্ধে কোনও সত্য মিথ্যা ধারণা করিয়া লওয়াই অনুমানের কাজ। অনুমান সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষের বাহিরে চলিয়া যায়। অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায় এই অনুমানের প্রভাবই প্রচার করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক বা "না"-বাচক মতামতগুলি হয় necessity of thought-এর উপরে প্রতিষ্ঠিত, না হয় কেবল অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। Necessity of thought-এর উপরে প্রতিষ্ঠিত, অপ্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তও প্রত্যক্ষবৎ প্রবল হয়। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধেরই মতন। এগুলিকে বর্জ্জন করা অসাধ্য।

ব্রাহ্মসমাজের "না"-বাচক সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌গুলি necessity of thought এর উপরে প্রতিষ্ঠিত আর কোন্‌গুলি কেবল অনুমান-প্রতিষ্ঠ; ইহার বিচার করিলেই, শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের বিরোধী কি না, আর বিরোধী হইলে, কোন্ স্থানে, কি বিষয়ে বাস্তবিক এ বিরোধ বাধে, এ সকল কথা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

বারান্তরে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(৭)

গভীর রাত্রে জীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এইখানে জীন ভ্যালজীনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। জীন ব্রাই গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে; বাল্যে লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই, বড় হইয়া সে কাঠুরিয়ার ব্যবসা অবলম্বন করে। স্নেহপ্রবণচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় সে কতকটা ভাবুক গোছের ছিল। তবে তাহার মুখভাবে অসাধারণত্ব কিছু প্রকাশ পাইত না। শৈশবেই তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়—মাতা চিকিৎসাবিভ্রাটে সূতিকাগারে মারা যান, পিতা কাঠুরিয়া ছিলেন—বৃক্ষ হইতে পতনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সংসারে থাকিবার মধ্যে তার একমাত্র ভগ্নী ছিল। স্বামীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সে তাহাকে "মানুষ" করে;

স্বামীর মৃত্যুর পর কিন্তু সাতটি পুত্র-কন্যা লইয়া সে ভ্রাতার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। ছেলে-মেয়েরা সবাই ছোট বড়টি আট বৎসরের, সর্ব্ব-কনিষ্ঠটি একবৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু। জীনের বয়স তখন পঁচিশ। কর্ত্তব্যের খাতিরে সে নিরাশ্রয়া বিধবা ভগ্নীর ভার গ্রহণ করিল। এপর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই,—যৌবনকাল তাহার কঠোর পরিশ্রমে অতি কষ্টে কাটিতে-ছিল, তাহার মধ্যে প্রেমের অবকাশ ছিল না, প্রণয়িনীও তাহার কেহ ছিল না।

সমস্তদিন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর অবসন্ন-ভাবে গৃহে ফিরিয়া কাহারও সহিত কথা না কহিয়া সে সকলের সহিত একত্রে আহারে বসিত। ভগ্নী প্রায়ই তাহার খাবারের উৎকৃষ্ট-তম অংশ আপন পুত্রকন্যাদের বণ্টন করিয়া দিতেন,—ঝোলের আলু, মাছের মুড়া প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে তাহার থালি হইতে অন্ত-র্হিত হইত—জীন দেখিয়াও দেখিত না, থালির সহিত মুখ গুঁজিয়া একমনে আহার করিয়া যাইত। কিন্তু তবুও সে বুভুক্ষু শিশুদের ক্ষুধা মিটিত না; খাবারের জন্য সর্ব্বদাই তাহারা চীৎকার করিত—জীনের বাড়ী হইতে কতকদূরে এক গোয়ালাবাড়ী ছিল—সেইখানে যাইয়া তাহারা জননীর নাম করিয়া দুগ্ধ চাহিয়া লইত, তারপর পথিমধ্যে আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া সে দুগ্ধ কতক পান করিত,—কতক ফেলিয়া দিত ভগ্নী এ কথা জানিলে কিপর্য্যয়-কাণ্ড বাধাইবে ভাবিয়া জীন তাহার অজ্ঞাত-সারে গোয়ালিনীকে সে দুগ্ধের দাম দিয়া দিত, —ছেলেমেয়েরাও জননীর ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাইত। এইরূপে বৎসর দুই চলিল।

কাজ যখন ভাল চলিত তখন সে প্রত্যহ ১৮ স্যুস করিয়া উপার্জ্জন করিত, অন্য সময়ে মোটঘাট বহিয়া, কৃষাণদের সহিত মাঠে খাটিয়া কোনরূপে চালাইত। কিন্তু তাহাতে আর কত আসে?—তার সে সামান্য উপার্জ্জনে একা সে নয়জনের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি কি করিয়া করে? দিনে দিনে দুর্দ্দশার চরমসীমায় তাহারা উপ-নীত হইতে লাগিল। তার উপর প্রচণ্ড শীত আসিয়া পড়িল;—কাজ আর মেলে না। ঘটিবাটি যাহা ছিল একে একে বিক্রয় করিয়া কয়দিন চলিল,—শেষে একদিন একেবারে অচল হইয়া পড়িল; তৈজসপত্রও কিছুই নাই, ঘরে একটুকরা খাবার নাই, প্রাতঃকাল হইতে সাতটি শিশু অনাহারে চীৎকার করিতে লাগিল। সমস্তদিন ধরিয়া জীন সে বুভুক্ষুর কাতর আর্ত্তনাদ শুনিল, শেষে সন্ধ্যার সময় উন্মত্তের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

রুটিওয়ালা মাবার্ট ইসাবু সমস্তদিনের খরিদ-বিক্রয়ের হিসাবপত্র মিলাইয়া ভিতর হইতে দোকান বন্ধ করিয়া শুইতে যাইবে—এমন সময় হঠাৎ বাহিরের জানালার কাঁচখানা ঝন্-ঝন্ শব্দে ভাঙিয়া গেল; তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দোকানঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল ভাঙা কাঁচের মধ্য দিয়া একখানা হাত টেবিলের উপরে সাজানো রুটীর স্তূপ হইতে একখানা রুটি লইয়া অন্তর্হিত হইতেছে। চোর চোর বলিয়া সে শব্দায়মান হইল; চোরও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, কিন্তু অবশেষে ধরা পড়িল; রুটিখানা আসিতে আসিতে পথে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেও, তাহার হাত হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। সে চোর—জীন ভ্যালজিন!

সে ঘটনা ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে। 'রবিবার'-রাত্রে ডাকাতি করার অভিযোগে অভি-

যুক্ত হইয়া জীন দায়রাসোপর্দ্দ হইল। বিচারে, পাঁচ বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমের সহিত তাহার কারাদণ্ডাজ্ঞা হইল।

নির্ম্মম শাসন-পাশ,—সভ্যতার পরিহাস!—কি যে ভয়ানক ক্ষণ, যখন দণ্ডবিধি আইন বৈতরণীর অতল জলে মানবতরণীখানি ডুবাইয়া দেয়! কি সে শোচনীয় মুহূর্ত্ত, যখন সমাজ, ভাবচিন্তাপূর্ণ মানববিশেষকে চিরদিনের মত আপনার ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়!

১৭৯৬ খৃঃ ২২ শে এপ্রিল তারিখে যেদিন সমগ্র প্যারিসবাসী নেপোলিয়নের মনটেণ্ট নামক যুদ্ধজয়ের সম্বাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল,—সেই দিন বহুসংখ্যক আসামী পরস্পর সংযুক্ত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গ্যালি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। জীনও তাহার মধ্যে ছিল। কামার যখন তাহার লৌহ গলাবন্ধটা পশ্চাদ্দিকে স্ক্রেক দিয়া আঁটিতেছিল, তখন হতভাগ্য দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকারিয়া উঠিল—"ওরে আমি ত চোর নই, আমি যে কাঠুরে জীন রে!"— তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া ধীরে ধীরে সাতবার নামাইয়া, যেন সাতটি অসম মস্তক স্পর্শ করিল। লোকে বুঝিল,—সাতটি শিশুর পোষণের জন্যই তার যা কিছু অপরাধ!

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল। ভবিষ্যতের ভীষণ ছবি তাহার মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে কাতর করিয়া তুলিতে লাগিল। নিরক্ষর অশিক্ষিত সে, অপরাধের অনুপাতে দণ্ড গুরুতর হইয়াছে বলিয়াই যদি সে ভাবে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না।

সাতাইশ দিন গো-যানে শৃঙ্খলের ভার বহন করিয়া অবশেষে জীন তুলঁতে আনীত হইল। সেখানে বন্দীদের লাল কোর্ত্তা পরিয়া সংসারের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার পরিচয়জ্ঞাপক নাম পর্য্যন্ত রহিল না,—এখন হইতে তার নূতন পরিচয়—নং ২৪৬০১ মাত্র। তাহার ভগ্নী কোথায় রহিল? সে সাতটি শিশুর কি হইল? কে তাহার সন্ধান রাখে? তরুর মূল যখন কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়, তখন তাহার মুষ্টিমেয় পত্রগুলির পরিণাম সন্ধান কে করিয়া থাকে?

সেই পুরাতন কাহিনী!—'ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু' ভগবানের সে জীব কয়টি একে একে আপনাপন অদৃষ্ট-তমসার মাঝে ডুবিয়া গেল। একমাত্র কোলের শিশুটি লইয়া জননী এক দপ্তরীর বাড়ীতে সামান্য কাজ জুটাইয়া অতিকষ্টে উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন করিতে লাগিল। শেষরাত্রি হইতেই তাহাকে কার্য্যে যোগ দিতে হইত, পুত্র বাহিরে পড়িয়া থাকিত; অধ্যক্ষ বলিতেন—"ছেলে নিয়ে কি কাজ হয় বাছা! তা হলে অন্য জায়গা দেখ।" তীব্র হিমে বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিশু কাঁপিতে থাকিত, তারপর বেলা সাতটার সময় পাঠশালা খুলিলে সেখানে যাইয়া বসিত।—নূতন এক কয়েদীর মুখে জীন একদিন এ সব শুনিল। তাহার প্রিয়ধনগুলিকে অন্তর্হিত করিয়া যে যবনিকা পতিত ছিল, সহসা মুহূর্ত্তের জন্য তাহা অপসৃত করিয়া তাহাদের ভাগ্যলেখা-চিত্র কে যেন তাহাকে দেখাইয়া দিল। তারপর পুনরায় সব অন্ধকারে আবৃত হইল;—ইহজীবনে জীন আর সে যবনিকার অন্তরাল দেখিতে পায় নাই।। কারা-

বাসের চতুর্থ বৎসরের শেষে একদিন তাহার পলায়ন সুযোগ ঘটিল। কয়েদীদের মধ্যে এ বিষয়ে পরস্পর সহানুভূতি খুব বেশী থাকে; অন্য কয়েদীদের সাহায্যে পলাইয়া, জীন দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া স্বাধীনভাবে বনে বনে ঘুরিল। কিন্তু সে কি স্বাধীনতা!—বন্যপশুর ন্যায় বন হইতে বনান্তরে বিতাড়িত হওয়া, 'পততিপতত্রে বিচলিতপত্রে' নিত্য সশঙ্কিত হইয়া ওঠা; পথিকের পদশব্দে, কুকুরের ডাকে, প্রতি বনে কণ্টকগুল্মে অনুসরণকারীর কথা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠা—ইহাকে যদি স্বাধীনতা বল তবে সে দুইদিনের জন্য সে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত, অবসন্নশরীর জীন পরদিন ধৃত হইল,—তখনও তার উদরে বিন্দুপরিমাণ জলও যায় নাই। বিচারে তাহার আরও তিন বৎসর কারাদণ্ড হইল। ষষ্ঠবর্ষের শেষে পুনরায় সে পলাইল,—প্রহরীরা একটা জাহাজের তক্তার তলদেশ হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিল,—প্রাণপণ শক্তিতে তাহাদের সহিত যুঝিয়াও সে উদ্ধার পাইল না। এবার অপরাধ গুরুতর—পলায়ন ও প্রহরীদের বাধাপ্রদান।—দণ্ডের কাল আরও পাঁচবৎসর বৃদ্ধি পাইল,—তন্মধ্যে ডবল শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় দুই বৎসর। দশ বৎসরের শেষে, পুনরায় পলায়ন চেষ্টার ফলে আরও তিন বৎসর। এই ১৬ বৎসর। আরও একবার সে পলাইয়া ঘণ্টা চারেক পরে ধৃত হয়; সেই চারি ঘণ্টার জন্য পুনরায় তিন বৎসর। একুনে ১৯ বৎসর। ১৮১৫ খৃঃঅব্দে সে কারামুক্তি পায়, ১৭৯৬ খৃঃ একখানি রুটী চুরির অপরাধে সে প্রথম কারাপ্রবেশ করে।

এইখানে বলিয়া রাখি, এ ঘটনা কাল্পনিক নহে,—ইহা বাস্তব; জীবন্ত সত্য। অহরহঃই ইহা ঘটিতেছে। দণ্ডবিধি আইন সম্বন্ধে আলোচনার ফলে গ্রন্থকার আরও একস্থলে আর এক হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঠিক ইহারই প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছিলেন। ইংরাজী অপরাধীদিগের সম্বন্ধে আলোচনার ফলে জানা যায় যে ইংলণ্ডে শতকরা আশিটা চুরি খাদ্যাভাবেই ঘটিয়া থাকে।

দারুণ নিরাশায় অশ্রুসিক্ত চক্ষে জীন গ্যালিতে প্রবেশ করিয়াছিল; ১৯ বৎসর পরে যখন সে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার অন্তঃকরণ—নীরস, কঠোর, দয়ামায়ার লেশমাত্র বর্জ্জিত।

৮

জীনের প্রকৃতি যথার্থ কি ছিল?

দুর্ভাগ্যের বিষয় সমাজ এদিকে চাহিয়া দেখে না, অথচ এ সবই তাহারই কীর্ত্তি।

জীন লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই সত্য, কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে গণ্ডমূর্খ বলা যায় না;—যে সহজাত বুদ্ধি মানবের সাধারণ সম্পত্তি, তাহা তাহারও ছিল। দুর্দ্দিনের শিক্ষায় তাহা বরং ক্রমশই ফুটিয়া উঠিতেছিল। বেত্রাঘাতে, শৃঙ্খলের বন্ধনে, নির্জ্জন কারাবাসে, প্রখর সূর্য্যোত্তাপে, শাস্তিবহনে, পরিশ্রান্তিতে, কাষ্ঠ শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া,—সব সময়েই সে আপন অন্তরের প্রতি চাহিত,—আর ভাবিত।

সে যেন বিচারক—আপনার অপরাধের পুনর্ব্বিচার করিতেছে। সে যে দোষী, বিনাপরাধে যে তার শাস্তি হয় নাই—সে কথা সে মানিত। চাহিলে হয়ত রুটিখানা সে পাইতে পারিত; অন্ততঃ অপর কোন কাজকর্ম্মের বা কাহারও দয়ার প্রতীক্ষা সে করিতে

পারিত।—অনাহারে মরিবার সময় ত তখনও তাহাদের হয় নাই, বিশেষতঃ, বহুদিন ধরিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলেও সহজে মানুষের মৃত্যু হয় না;—সুতরাং সব দিক দেখিয়া তাহার ধৈর্য্যধারণ করা উচিত ছিল,—সকল পক্ষেই তাহা হইলে ভাল হইত; তাহার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সমাজের উপর টেক্কা দিতে যাওয়া ভাল হয় নাই। চুরি করিয়া দুঃখ ঘোচে না, অন্ততঃ, অন্নের অভাব অতিক্রম করিতে গিয়া যেখানে কলঙ্কের পঙ্কিল খাদে পড়িতে হয়, সে পথ অবলম্বন না করাই ভাল:—ইত্যাদি!—মোটের উপর জীন আপনার দোষ প্রমাণ করিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল—এই দুর্দ্দশার জন্য কি একাই সে দায়ী?—কে সে? একজন মজুর মাত্র; পরিশ্রমে ত সে পরাঙ্মুখ নয়, তবে সে কাজ পায় না কেন? আহার্য্য পায় না কেন?—সেটা কার অপরাধ? তার উপর,—না হয় সে-ই দোষী, কিন্তু অপরাধের অনুপাতে তার দণ্ড কি গুরুতর হয় নাই? বিচারের তুলাদণ্ডে দণ্ডের দিকটাই কি ঝুঁকিয়া পড়ে নাই? এ কঠোর দণ্ড না দিলেও কি তার অপরাধ ক্ষালন হইত না? দণ্ডের অত্যাচার কি তার স্বেচ্ছাচারের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায় নাই? অপরাধীকে বন্যপশুর ন্যায় বাঁধিয়া পিষিয়া, প্রতিহিংসা সাধন করিয়া, দণ্ডের মর্য্যাদা কি খর্ব্ব হয় নাই? তার উপর কয়বার তার পলায়নচেষ্টার জন্য এই যে অবশিষ্ট চতুর্দ্দশবৎসরের কারাদণ্ড—এটা কি দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার নয়? ব্যষ্টির উপর সমষ্টির অন্যায় প্রভুত্ব নয়?—এমন কি তার পাপ যে ১৯ বৎসর ধরিয়া তাহাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়?

সমাজ?—সমাজের কি অধিকার যে, সে একই ঘটনার জন্য একজনকে নির্ম্মমভাবে দলিয়া পিষিয়া মারিবে, অথচ জনবিশেষের অপরাধ দেখিয়াও দেখিতে চাহিবে না?—কি তার অধিকার যে অন্নসংস্থানের কোন উপায় না করিয়া দিয়া, নির্ম্মম শাসনপাশে সে মানুষকে বাঁধিতে আসে? অদৃষ্টের বশে যাহারা দীনদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা করুণার পাত্র; কিন্তু তাহাদের জন্যই কি যত আইনের কঠোরতা?—জীন অনেক বিচার বিতর্ক করিয়া অবশেষে সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করিল, এবং প্রতিহিংসাসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল; সে বুঝিল তাহার দণ্ড—অবিচার না হোক্, অত্যাচার বটে। ক্রোধটা অনেক সময়ে 'বোকামি' মাত্র,—দোষী লোকেও ধরা পড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে; তবুও এটা ঠিক যে, অন্যায় বিচারের ভাবটা মনে মনে না থাকিলে কেহ কখন নিজেকে নির্য্যাতিত ভাবে না। জীন ভ্যালজিন আপনাকে নির্য্যাতিত বলিয়াই মনে করিতেছিল।

সমাজ তাহার জন্য কি করিয়াছে?—কিছুই নয়। অন্যান্য হতভাগ্যের ন্যায়, শুধু তার তথা-কথিত ন্যায় বিচারের প্রচণ্ড মূর্ত্তিটাই সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যথার্থ করুণা লইয়া কেহ তাহার কাছে আসে নাই, যে কেহ কাছে আসিয়াছে সেই তাহাকে আঘাতই করিয়াছে। শৈশবের পর হইতে, এক ভগ্নীর নিকট ব্যতীত কোন যত্ন বা স্নেহ কাহারও নিকট হইতে সে পায় নাই। দুর্দ্দশার পর দুর্দ্দশায়, তাহার মনে অবশেষে এই ধারণা

দাঁড়াইয়াছিল যে জীবনটা সংগ্রামমাত্র, আর সে সংগ্রামে সে-ই নিত্য পরাজিত। ঘৃণাই শেষে তাহার একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ হইল; সেই অস্ত্র গ্যালির নির্য্যাতন-শাণযন্ত্রে ক্ষুরধার করিয়া লইয়া কারামুক্তির দিন হইতে সংসারের সহিত যুঝিতে সে কৃতসংকল্প হইল। তুলঁতে কয়েদীদের জন্য বিদ্যালয় ছিল, ইচ্ছা করিলে যে-কোন কয়েদী সেখানে মোটামুটি ধরণে শিক্ষালাভ করিতে পারিত; জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা তাহার প্রতিহিংসাসাধনের পথ প্রশস্ত হইবে ভাবিয়া, চল্লিশ বর্ষ বয়সে জাঁন সেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। সময়ে সময়ে শিক্ষা ও সভ্যতাই যত পাপের আকর হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজের বিচার শেষ করিয়া জাঁন সমাজ-কর্ত্তা ভগবানের বিচার করিতে বসিল, এবং অবশেষে তাঁহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিল।

এইরূপে ১৯ বৎসর কারাবাসের মধ্যে তাহার জীবন আলো-অন্ধকারের বিচিত্র মিশ্রণে কাটিতেছিল।

আসলে তাহাকে পাপস্বভাব বলা যায় না। গ্যালিতে প্রথম প্রবেশ কালে তাহার প্রকৃতি তোমার আমার মতই ছিল। সেখানে, নির্য্যাতনের ফলে, সে যখন সমাজের উপর খড়্গহস্ত হইল, তখন তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিল; ভগবানের ন্যায় বিচারে যখন সে সন্দিহান হইল, তখনি তাহার মন পাপপঙ্কিল হইল।

কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত।

মানব-প্রকৃতি কি সম্পূর্ণভাবে এতই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? ভগবানের সৃষ্ট মানুষকে কি মানুষে এত দীন করিতে পারে? আত্মা কি কর্ম্মফলাধীন হইয়া, মন্দ গ্রহের ফেরে, আপনি কলঙ্কিত হইতে পারে? বিশাল মস্তিষ্কের ভারে মেরুদণ্ডের ন্যায়, মানুষের চিত্ত কি স্তূপীকৃত দুঃখযন্ত্রণার ভারে প্রপীড়িত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে? প্রত্যেক মানবের আত্মায়, জাঁন ভ্যালজীনের আত্মায়, —এমন কি কোন সহজাত অপাপ অনন্তের দিব্য বিভা নাই বা ছিল না, সৎকার্য্যের প্রতিফলিতালোকে যাহা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে এবং পাপে যাহাকে কখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না?

গ্যালির কর্ম্মের অবসরকালে এই সব কথাই তাহার মনে হইত। নীরব ভাবুকতার ছায়াপাত সে সব সময়ে তাহার মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

অবশ্য আমরা যে ভাবে ক্রমপর্য্যায়ে তাহার চিন্তার বিকাশ দেখাইয়াছি, সে ভাবে হয়ত জাঁন আপনার চিত্তকে দেখে নাই,—সে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার ক্ষমতাও হয়ত তাহার ছিল না। কিন্তু এটা সত্য যে যেখানে সংশোধন অপেক্ষা শাস্তি-প্রদানের আগ্রহই অধিক পরিস্ফুট, সে বিচার মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে একে একে পদদলিত করিয়া মানুষকে পশুবৎ করিয়াই তোলে। জাঁনের উপর্য্যুপরি পলায়ন-চেষ্টাই তাহার প্রমাণ।—সে ব্যর্থ চেষ্টা মূর্খতা বই আর কিছু নয় তাহা ত সে জানিত; তত্রাচ সুযোগ পাইলেই, উন্মুক্ত পিঞ্জর হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায়, সে ছুটিয়া পলাইয়াছে.—পরিণাম বা শাস্তির কথা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই।—কেন? তাহার সহজাতবুদ্ধি যেন তাহাকে বলিয়া দিত—'পালাও'; তাহার বুদ্ধি-বিচার তাহাকে বলিত—"থাক।" কিন্তু এমন একটা প্রলোভনের কাছে তাহার

সহজাত ভাবেরই জয় হইত, তাহার পশুভাবই প্রবল হইত। তার পর, ধৃত হওয়ার পর নূতন শাস্তির ভার তাহার চিত্তের অন্ধকার গাঢ়তর করিয়াই তুলিত।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। শারীরিক সামর্থ্যে জীনের সমতুল্য লোক গ্যালিতে তখন কেহ ছিল না। কঠোর-শ্রমসাধ্য কার্য্যে একা সে চারিজনের সমতুল্য ছিল; পৃষ্ঠের উপর অনায়াসে সে বিশাল ভার বহন করিতে পারিত। কিন্তু শারীরিক শক্তি অপেক্ষা তাহার কৌশল অনেক বেশী ছিল। সুদীর্ঘকালের জন্য দণ্ডিত অপরাধীরা পলায়নোদ্দেশে প্রায়ই প্রতিদিন, সুযোগমত নিয়মিত-ভাবে শক্তি ও কৌশলের সাধনা করে। জীন সে বিষয়ে একজন পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছিল। যে-কোন প্রাচীর উল্লম্ফন করা, ক্ষুদ্রতম কার্ণিশের উপর স্বচ্ছন্দে দণ্ডায়মান থাকা, তাহার পক্ষে কৌতুকমাত্র ছিল। পৃষ্ঠদেশ ও হাঁটু দিয়া কনুই এবং হস্তের সাহায্যে দেওয়ালের কোণ বাহিয়া অনায়াসে সে ত্রিতল পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইত;—এইরূপে কতবার গ্যালির ছাদ পর্য্যন্ত সে উঠিয়াছে।

কথা সে কহিত কম, গ্যালিতে কখনও কেহ তাহাকে হাসিতে দেখে নাই। সে যেন সর্ব্বদাই কি একটা গুরুতর চিন্তার মাঝে মগ্ন হইয়া থাকিত।

তাহার অসম্পূর্ণ প্রকৃতির ভ্রান্ত অনুভব-শক্তির বশে সে বুঝিত কি যেন একটা বিশাল ভার তাহার স্কন্ধে চাপিয়া আছে। জীবনের অস্পষ্ট অন্ধকারে যেদিকে সে চাহিত সেই দিকেই দেখিত,—আইনের বন্ধন, মানবের পক্ষপাতিত্ব, এবং সভ্যতার বিশাল স্তূপ যেন চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিতেছে। তাহার মধ্যে,—কখনো সম্মুখে, কখনো দূরে, কখনো বহু ঊর্দ্ধে—এখানে অনুচর সহ কারাধ্যক্ষ, ওখানে তরবারি হস্তে যমদূতসম প্রহরী, দূরে করধৃতদণ্ড প্রধান পুরোহিত, আর ঊর্দ্ধে আলোকের মাঝে হেমমুকুটধারী নৃপতি—আরও কত কি সে যেন দেখিত! কি এক দুর্জ্ঞেয় গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহারা যেন সব তাহাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইত,—তাহাদের সে নির্ব্বেদ নিষ্ঠুরতা এবং চির উপেক্ষার ভারে প্রতিদিন সে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিত!—সম্ভাবিত দুর্দ্দশার অতলজলে মগ্ন শাসন কশাহত হতভাগ্যের শিরেই, মানব-সমাজের যত দুঃসহ বিশাল ভার আসিয়া চাপিয়া বসে; জীনেরও তখন সেই অবস্থা। সে কি ভাবিত?—পেষণযন্ত্র-মধ্যগত যবখণ্ডকে প্রশ্ন কর। তাহার যে চিন্তা, জীনেরও তাই।

এই কায়া ও ছায়া, সত্য ও কুহকের অদ্ভুত মিশ্রণের মধ্যে পড়িয়া মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত,—অতীত, বর্ত্তমান সবই বুদ্ধি বা ভ্রান্তি, সবই বুঝি একটা স্বপ্নের ঘোর মাত্র! কাজ করিতে করিতে, থামিয়া, কারা-প্রহরীর প্রতি চাহিয়া সে ভাবিত—কে এ, ছায়ামূর্ত্তি! কিন্তু মুহূর্ত্তে সে ছায়ামূর্ত্তি হইতে তাহার পৃষ্ঠে সজোরে বেত্রাঘাত বর্ষিত হইত; চমকিত হইয়া, জীনের চিত্ত পুনবায় বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিত; জীন আবার কার্য্যে মন দিত।

বহির্জগতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না—সূর্য্যের কিরণ, বসন্তের প্রভাত, বিচিত্রবর্ণাভ আকাশের ছবি, সবই যেন

তাহা হইতে দূরে দূরে ছিল। শুধু একটা অতি ক্ষীণ আলো চিত্তের অদ্ধোন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া আসিয়া, যেন তাহার অন্তর্জীবনে প্রবেশ লাভ করিত মাত্র।

মোট কথা,—ফ্যাবেবোল পলীব সে নিরীহ কাঠুরিয়া তুলঁতে আসিয়া ভীষণ কয়েদীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। গ্যালির শিক্ষার ফলে দুইটি জিনিসে সে খুব অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল ;—প্রথমতঃ, তাহার নির্য্যাতনের প্রতিহিংসাস্বরূপ একটা প্রতিসন্ধি তীব্র আকস্মিক উত্তেজনায়, দ্বিতীয়তঃ, তাহার আপন বিবেক-বিচারানুমোদিত ভ্রান্ত চিন্তাপ্রসূত পূর্ব্বচিন্তা কার্য্যানুষ্ঠানে। জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও একগুঁয়েমি, এই তিন লইয়া তাহার পূর্ব্বচিন্তা গঠিত হইত, এবং স্বাভাবিক বিদ্বেষ, আত্মার অন্ধকার, নির্য্যাতনের স্মৃতি ও প্রতিহিংসার ভাব (তাহাতে সাধু অসাধুর বিচার ছিল না)—এই কয়টি ভাবই তাহার কার্য্যের একমাত্র কারণস্বরূপ ছিল। কিন্তু মানবের রচিত আইনকানুনের প্রতি একটা বিজাতীয় বিদ্বেষই তাহার সকল চিন্তার মূলে অহরহঃ জাগিতে থাকিত। এই বিদ্বেষ-ভাব, সময়ে দৈবঘটনায় নিয়ন্ত্রিত না হইলে, কালে, স্বাভাবিক নিয়মের বশে, সমাজের প্রতি, পরে সমগ্র মানব-জাতির প্রতি, তার পর সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের প্রতি, বিস্তৃত হইয়া পড়ে ; মানুষ তখন কেবলি পরের অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে।—ছাড়-পত্রে, জীনকে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়।

দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে তাহার প্রাণ-ধারা শুষ্ক হইতেছিল। ১৯ বৎসর পরে, বিশুষ্ক হৃদয়ে শুষ্ক নেত্রে জীন পুনরায় সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করিল।

(৮)

অন্ধকার লবণাম্বুরাশি ভেদ করিয়া নক্ষত্র-বেগে পোত ছুটিতেছিল। সহসা এক যাত্রী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল।

একবার উঠিয়া, একবার ডুবিয়া, চীৎকার করিয়া সকলকে সে ডাকিতে লাগিল।—কে সে চীৎকার শুনিবে? সমুদ্রবক্ষে তখন ঝটিকা উঠিয়াছে, নাবিকেরা এবং সহযাত্রি-বৃন্দ পালের বসারাস লইয়াই ব্যস্ত—তাহার আর্ত্তনাদ তাহাদের কাণে পৌঁছিল না। উত্তাল তরঙ্গমালার উপর হতভাগ্যের দেহ বিন্দুবৎ ভাসিতে লাগিল।

নিমিষে নিমিষে সে পোত দূর হইতে দূরান্তগত হইতেছিল। উহারই মধ্যে সে ত এই কতক্ষণ ছিল ; আর সবারই মত সেও ত উহারই একজন যাত্রী ছিল, আর সবারই মত সেও ত একদিন উহারই ক্রোড়ে সকলের সহিত একত্রে বসিয়া, সূর্য্যের আলো এবং সমীরণ-সঞ্চার উপভোগ করিয়াছে। কিন্তু এখন?—মুহূর্ত্তের পদস্খলন, মুহূর্ত্তের ভুল—তাহারই ফলে চিরদিনের মত পতন,—সেইখানেই তার জীবন নাট্যের পরিসমাপ্তি!

চারিদিকে বীচি-বিক্ষোভ, পদতলে তরল বারিরাশির প্রাণসংহারিণী লীলা; বাত্যাসংক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিরাশি আছাড়িয়া আছাড়িয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া অন্ধকার সমুদ্রতলের দিকে তাহাকে দূর করিয়া দিতে চাহিতেছে! তরঙ্গের পর তরঙ্গ, জনসংঘের ন্যায়, তাহার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছে, এক একবার

তরঙ্গের তাড়নে নিমজ্জিত হইয়া সে দেখিতেছে,—চারিদিক্ হইতে হাঙ্গর কুম্ভীর সরীসৃপ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, সমুদ্রগর্ভস্থ লতাগুল্ম যেন তাহাকে মৃত্যু-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবার জন্য প্রসারিত হস্তে ছুটিয়া আসিতেছে!—ভয়ে শিহরিয়া, চক্ষু মুদিয়া, অভাগা প্রাণপণে জীবনের মায়ায় যুঝিতে লাগিল।

কোথায় সে পোত? দূরে—বহুদূরে—অন্ধকার দিক্‌চক্রবালের সীমারেখায়!—আর স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না!

দেখিতে দেখিতে তুফান উঠিল। চতুর্দ্দিকে—পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ; উর্দ্ধে—পাটলান্ধকার আকাশের নির্ম্মম ভ্রূকুটি। সর্ব্বত্র যেন উন্মত্ত দানবের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা!—সে ভীষণ শব্দ, যেন নরকের প্রতিধ্বনিত নির্ঘোষ!—কি সে যন্ত্রণা!—অভাগা উন্মাদ-গ্রস্ত হইল।

আকাশে বিহঙ্গম আছে, মানবের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করিতে দেবতারাও আছেন।—কই, তাহাকে ত কেহ উদ্ধার করে না! পাখীরা ঝড়ের মুখে উড়িতে উড়িতে গান করিতে লাগিল; নীচে সে অভাগা মৃত্যুর সহিত যুঝিতে লাগিল।—সে অনন্ত সমুদ্র এবং অনন্ত আকাশ—যেন তাহারই কবরের অনুরূপ; একটি তাহার কবর,—অপরটি তাহার আচ্ছাদনী।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুঝিতে যুঝিতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে;—পোতও আর দৃষ্টিগোচর হয় না।—গভীর অন্ধকারে সে একা! ডুবিতে ডুবিতে চারিদিক হইতে প্রেতচ্ছবি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—অভাগা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মানুষ ত তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। ভগবান্, তুমি কোথায়?

"—কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর!—"

দিক্‌চক্রবালে, আকাশে,—কোথাও কিছু নাই, কেহ নাই।

আকাশ, তরঙ্গ, পর্ব্বতশৃঙ্গ—সবই বধির! বাত্যাও অনন্তের আদেশই পালন করিতেছিল।

চারিদিকে—ঘনীভূত অন্ধকার, বাত্যা, নির্জ্জনতা, দানবী-ভ্রূকুটি, উন্মত্ত তরঙ্গের মুহুর্মুহু উত্থান-পতন; পদতলে—তারল্যের রসাতল; অন্তরে—শ্রান্তি, বিভীষিকা! কোথায় আশ্রয়?—আশ্রয় নাই! তীব্র হিমে দেখিতে দেখিতে তাহার হস্তপদ অসাড় হইয়া আসিল; উন্মত্তের ন্যায় আকাশ বাতাস নক্ষত্র তরঙ্গ ঘূর্ণাবর্ত্ত সবই যেন সে অন্তিম আবেগে ধরিতে লাগিল!—হায়,—শূন্য মুষ্টি,—বিফল প্রয়াস!

দারুণ নিরাশাভারপ্রপীড়িত হইয়া তখন সে সব চেষ্টা ত্যাগ করিল।—পরাজিত নির্য্যাতিত হতভাগ্য গভীরতম অন্ধকারের অতল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল!

হায় রে গতিশীল সমাজ! মানবের এবং মানবাত্মার অধোগতি চিহ্ন এমনি ভাবে তুমি অঙ্কিত করিয়া যাও! তোমার শাসন-নীতি এমনই ভাবে মানুষকে অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তার উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও এমনি ভাবেই কাড়িয়া লয়,—চির দুর্দ্দশার মাঝে তাকে এমনি ভাবেই দূর করিয়া দেয়! হায়, এ নৈতিক মৃত্যুর হস্ত হইতে কে হতভাগ্য মানবকে উদ্ধার করিবে?

(৯)

সে দিন প্রাতঃকালে কারাধ্যক্ষ যখন আসিয়া তাহাকে জানাইল—"আজ তুমি মুক্ত," তখন জীন প্রথমতঃ সে কথা বিশ্বাসই করিতে পারিল না;—সেটা যেন এমনই অসম্ভব,—এতই অপ্রাকৃত! তারপর, সহসা একটা তীব্র জ্যোতিঃ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? মুক্তির কথায় তাহার মনে একটা নব জীবনের ছবি জাগিয়া উঠিত। কিন্তু দুদিন যাইতে না যাইতেই সে বুঝিল, হরিদ্রাভ ছাড়-পত্র সহ মুক্তি অর্থে কি?

তারপর আরও কথা ছিল। জীন হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, এই ১৯ বৎসরের পারিশ্রমিক হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার ১৭১ ফ্রাঙ্ক মোট পাওনা হইয়াছিল; অবশ্য রবিবার ছুটিছাটা, ও অন্যান্য বাবদে তাহা হইতে কিছু বাদ যাইবার কথা,—কিন্তু জীন তাহা বুঝিল না, তাই কর্তৃপক্ষ যখন তাহাকে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯ ফ্রাঙ্ক ১৫ স্যুস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন সে সেটা অপহরণের নামান্তর বলিয়াই মনে করিল।

মুক্তির পর দিন, চলিতে চলিতে পথে একটা আঙ্গুরের কারখানায় তার দিন মজুরি জুটিল। সে অসাধারণ পরিশ্রমী,—খুব উৎসাহে কাজ করিতে লাগিল। একটা চৌকিদার সেখান দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া সন্দিগ্ধভাবে তাহার ছাড়পত্র চাহিল,—কাজেই তখন সে হরিদ্রাভ ছাড়পত্র তাহাকে বাহির করিতে হইল। চৌকীদার চলিয়া গেল, লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল, জীন পুনরায় আপন কাজে মন দিল। সন্ধ্যার সময় সে যখন তাহার প্রাপ্য আনিতে গেল, মেট তাহাকে মাত্র ১৫ স্যুস দিল।

সেখানে দৈনিক মজুরের রোজ ৩০ স্যুস; জীন অপর এক মজুরকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিল। তাই সে বিস্মিত হইয়া বলিল,—

"কি রকম?"

"কি রকম আবার কি?—তুই আবার এর বেশী কি চাস্?"

"কেন, ৩০ স্যুস? সবাই যা পেয়ে থাকে।"

মেট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"সাবধান, কোন বদ কথা বল্‌বি ত পুলিশে দেবো।"

জীন নিরুত্তর হইয়া ফিরিল। ভাবিল—এ-ও দিনে ডাকাতি।

সমাজ—কর্তৃপক্ষ—তাহার উদ্বৃত্ত অর্থের হ্রাস করিয়া 'পাইকারি' ডাকাতি করিয়াছে মানুষ এখন জীন জীন 'খুচরা' ডাকাতি আরম্ভ করিতেছে। ভাল!

জীন বুঝিল—মুক্তি অর্থেই উদ্ধার নয়, কয়েদী কারাগার ত্যাগ করিয়া আসে বটে, কিন্তু ঘৃণা ও দণ্ডের হাত হইতে কখনো পরিত্রাণ পায় না—ডি-তেও সে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

(১০)

জীনের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিতেছে! প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিছানায় সে শোয় নাই; আজ এ কোমল শয্যায় নিদ্রা হওয়াই যে তাহার পক্ষে বিচিত্র!

চারি ঘণ্টা নিদ্রা তাহার ক্লান্তি অপনোদনের পক্ষে যথেষ্ট—বেশীক্ষণ নিদ্রা যাওয়া

তাহার অভ্যাস ছিল না—তবু একবার চক্ষু মেলিয়া অন্ধকারে সে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর পুনরায় চক্ষু মুদিত করিল। কিন্তু দিবাভাগে নানাঘটনা-সংঘাতে যার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহার পক্ষে রাত্রে, দ্বিতীয়বার নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব সহজে ঘটে না। জীনেরও তাহাই হইল। ঘুমাইতে না পারিয়া সে ভাবিতে বসিল। সে চিন্তাও নানা ভাব সংঘাতের অদ্ভুত মিশ্রণ।—অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের কথা একত্রে মিলিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন ঢুকে চুরি খেলতে লাগিল কত অদ্ভুত আকৃতি ধরিয়া, কত সম্ভবকে অসম্ভব, অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তরিত করিয়া আবার নিমেষে যেন কোন পঙ্কিল স্রোতে মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সব চিন্তা সব ভাবের মধ্যে একটি মাত্র চিন্তা তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। কি তাহা, বলিতেছি—

সেই ছয় থানা রূপার থাল—ম্যাগলোয়ার যে গুলিকে আলমারির উপর তুলিয়া রাখিতেছিল—তাহারা যেন সজীব হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতেছিল। যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের মূল্য ২০০ ফ্রাঙ্কের কম নয়—উনিশ বৎসর ধরিয়া খাটিয়া সে যাহা পাইয়াছে প্রায় তার ডবল দাম! অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ অবিচার না করিলে সে আরও কিছু বেশী পাইত? তা যাউক সে কথা।

পূর্ণ এক ঘণ্টা ধরিয়া নানা বিরোধী ভাবের মধ্যে পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল।

ঢং—ঢং—ঢং—। তিনটা!

জীন চকিতে উঠিয়া বসিল, হাত বাড়াইয়া দেখিল বিছানার পাশে তার গাঁঠরিটা ঠিক আছে কি না?—তারপর, জুতা খুলিয়া রাখিয়া, পুনরায় শয্যার উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

কি সে ভাবনা?—কেমন করিয়া বলিব? সে ভাবনার কোন সামঞ্জস্য নাই, স্থিরতা নাই; তাহা একবার আসে আবার মিলায়, আবার আসে আবার যায়।—কি যেন তাহার উপর চাপিয়া বসিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে কয়েদী ব্রেভেটের কথা তার মনে পড়িল,—তার ছক্‌কাঠা সূতার গাটারটা যেন তাহার চক্ষের উপর জাগিতে লাগিল। এই ভাবে হয় ত তার সমস্ত রাত্রি কাটিত, কিন্তু অকস্মাৎ গির্জ্জার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল—ঢং! আরও অৰ্দ্ধ ঘণ্টা!—সে শব্দ যেন তাহাকে বলিয়া দিল—"উঠ, ভাবছ কি?"

জীন চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোক জানালার খড়খড়ির মধ্য দিয়া কক্ষে আসিয়া পড়িতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য একবার ইতস্ততঃ করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালার গরাদে ছিল না,—নীচেই বাগান; তাহাতে অনতি-উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনী, বাগানের পরই নাতিহ্রস্ব বৃক্ষের সারি—সম্ভবতঃ সেটা একটা রাজপথ। চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকে জীন ভাল করিয়া একবার সব দেখিয়া লইল; তারপর, জানালা বন্ধ করিয়া, স্থির পাদক্ষেপে ফিরিয়া আসিয়া, গাঁঠরি হইতে শিকের মত কি একটা বাহির করিল। তারপর, জুতা জোড়া পকেটে পুরিয়া, থলিটা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া, চোখের

উপর টুপিটা টানিয়া আনিয়া, সেই জানালার পার্শ্বে লাঠি রাখিয়া, লৌহশিকহস্তে ধীরে ধীরে পার্শ্বের কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইল। মিরিয়েল আপন কক্ষ অর্গলাবদ্ধ করেন নাই, দ্বার উন্মুক্তই ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(৩)

(ভাদের বঙ্গদর্শনের ৩৭১ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ফলতঃ সাধারণ লোক প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মধ্যে যে বিরোধ ও ব্যবধান আছে বলিয়া মনে করে, তাহা সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ধরিতে পারা যায়, তাহাই প্রাকৃত। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ধারণা হয় না, তাহাই অপ্রাকৃত। কিন্তু লোকে ইহা বিচার করিয়া দেখে না যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে জানি না ও জানিতে পারি না, তাহাকেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া ধরিতে হয়, তার আর অন্য পথ নাই। ইন্দ্রিয়ের অতীত যে একটা বিশাল জ্ঞানরাজ্য পড়িয়া আছে, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য হইতেই আমরা তাহা জানিতে পারি, আমাদের অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া যায় মাত্র, বর্জ্জন করিয়া জন্মে না, জন্মিতে পারে না। যাহা দেখি ও শুনি তারই মধ্যে যাহা দেখা যায় না ও শোনা যায় না, তাহার সঙ্কেত ও সন্ধান পাওয়া যায়। আর এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে ইন্দ্রিয়ের ভিতরকার অতীন্দ্রিয় সঙ্কেতটী সকলে ধরিতে পারে না। সে জন্য সাধন আবশ্যক। সে সাধনের নাম ভূতশুদ্ধি বা দেহশুদ্ধি। আমাদের ভূতশুদ্ধি নাই বলিয়া, ইন্দ্রিয় সকল কখনও আপনার স্বরূপে অবস্থান করে না। সুতরাং আমাদের *ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষও সত্য হয় না*; ইন্দ্রিয়গ্রামের শক্তি সাধ্য যে কি, ইহাও আমরা জানিতে পারি না। আমরা সত্যভাবে ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন বা বিষয়ের সেবাও করিতে পারি না; অতীন্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষলাভ করি না। আমরা কতকগুলি পৈত্রিক ও বৈজিক সংস্কার লইয়া জন্মিয়া, বহুবিধ সামাজিক সংস্কারের মধ্যে গড়িয়া উঠি। এই সকল সংস্কার আমাদের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে বহুবিধ কল্পনার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই জন্য আমরা সত্যভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে কি ও তাহাদের সাক্ষ্যই বা কি, ইহাও ধরিতে পারি না, আর অতীন্দ্রিয় বস্তু যে কি তাহাও প্রত্যক্ষ করিতে পাই না। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া রহে বলিয়া, অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাসও কেবল অনুমানের ও

কল্পনার উপরেই গড়িয়া উঠে। ধাতু-প্রসাদেই অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কুলের প্রসন্নতা লাভ হইলেই, জীব অতীন্দ্রিয়ের মহিমা জানিতে পারে। আমাদের ধাতু প্রসন্ন নয় বলিয়াই আমরা একটা বিকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের মধ্যে বাস করিয়া প্রকৃত অতীন্দ্রিয়ানুভূতিলাভে অসমর্থ হই। আর এই জন্যই প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের মধ্যে এমন একটা কল্পিত ব্যবধানেরও সৃষ্টি করি।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইন্দ্রিয় সকলকে ভাল করিয়া জানিলেই তাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে যারা ভাল করিয়া জানিয়াছে, তারাই জানে যে ইহারা কেহই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে। কেবল চক্ষু দিয়া মানুষ দেখে না। চক্ষুর পশ্চাতে যতক্ষণ না মন আসিয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয়ে যতক্ষণ না মনঃসংযোগ হয়, ততক্ষণ চক্ষুর গোলকের উপরে সে বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে তার রূপের জ্ঞান জন্মায় না। চক্ষুর পশ্চাতে যেমন মন, মনের পশ্চাতে সেইরূপ বুদ্ধি; বুদ্ধির পশ্চাতে সেইরূপ সাক্ষীস্বরূপ আত্মচৈতন্য যতক্ষণ না আসিয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ চক্ষু দেখে না। এইরূপে মন, বুদ্ধি ও চৈতন্য যুক্ত না হইলে, কাণও শোনে না, ত্বক্‌ও স্পর্শ করে না, নাসিকাও ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, রসনাও রসাস্বাদ করে না, কোনও ইন্দ্রিয়ই আপনার বিষয়কে গ্রহণ করিয়া সে বিষয়ের শব্দস্পর্শরূপ-রসাদির জ্ঞান দান করিতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ?
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ?
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি ?
ক উ দেবো চক্ষুশ্রোত্র যুনক্তি ?

কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই যে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় মন, তাহা আপনার বিষয়েতে পতিত হয়? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া শরীরের মধ্যে যে প্রধান প্রাণবায়ু তাহা আপনার বিষয়ে যুক্ত থাকে? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকল বাক্য অভিব্যক্ত হয়? সেই দেবতা কে? যিনি চক্ষু এবং কর্ণকে আপন আপন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেছেন?

সর্ব্বপ্রকার সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া, সহজ ও শুদ্ধভাবে আপনার ইন্দ্রিয় সকলের অনুসরণ ও অনুশীলন করিতে করিতেই এরা যে স্বতন্ত্র ও স্বপর্য্যাপ্ত নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আর তখনই আমরা যিনি "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং তৎ" ও "প্রাণস্য প্রাণং" তাঁহাকে এই সকল চক্ষুরাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্যেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারলাভ করিতে হয়—ছাড়াইয়া বটে, কিন্তু ছাড়িয়া নহে। অতিক্রম করিয়া বটে, কিন্তু বর্জ্জন করিয়া নহে।

মনের মধ্যেই চিন্তামণি বিরাজ করিতেছেন। মনকে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু মনকে ধরিয়াই সে চিন্তামণিকে পাইতে হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রামের বা হৃষীকসমাজের মাঝখানেই হৃষীকেশ বাস করেন। তিনি ইন্দ্রিয়কুলের অধীশ্বর, রাজা। রাজাকে তাঁর স্বরাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, পররাষ্ট্রে নহে। চিন্তামণিকে চিন্তা হইতে, হৃষীকেশকে হৃষীকসমাজ হইতে

পৃথক্ করা যায় না। করিলে, তাহা কৃষ্ণত্ব, শুকত্ব প্রভৃতির ন্যায় একটা ভাববাচ্য শব্দ মাত্রে পরিণত হয়, তার বস্তুত্ব আর থাকে না। ইংরেজিতে ইহাকে abstraction বলে। এই সকল abstraction এর উপরেই আমাদের যাবতীয় মানসকল্পনা গড়িয়া উঠে। এগুলি সত্য নহে, সত্যাভাস মাত্র। চিন্তামণি আমাদের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, নিয়তকাল আমাদের প্রত্যেক চিন্তাকে ধরিয়া জড়াইয়া, ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। হৃষীকেশ আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গতি চেষ্টার সঙ্গে তাহাদের আশ্রয় ও প্রেরয়িতা হইয়া নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। আর মন প্রাকৃত বস্তু; কিন্তু সেই মনবিহারী মনোময় চিন্তামণি যিনি, তিনি অপ্রাকৃত। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় সকলও প্রাকৃত; কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ও অধীশ্বর হইয়া যিনি আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়চেষ্টাকে সম্ভব ও সফল করিতেছেন, সেই হৃষীকেশ অপ্রাকৃত। মন প্রাকৃত হইলেও এই মনকে ছাড়িয়া অপ্রাকৃত বস্তু যে চিন্তামণি তিনি তিলার্দ্ধকাল তিষ্ঠিতে পারেন না। নিমেষের জন্যও অপ্রাকৃত বস্তু যে হৃষীকেশ তিনি কদাপি এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রাকৃতের ভিতরেই অপ্রাকৃতের, অপ্রাকৃতের আশ্রয়েই প্রাকৃতের প্রতিষ্ঠা। এ দুইকে পৃথক্ করা যায় না। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত ছায়াতপের ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আছে।

অতএব শৃঙ্গাররসকে প্রাকৃত আর মাধুর্য্যকে অপ্রাকৃত বলিলে উভয়ের মধ্যে কোনও আত্যন্তিক ব্যবধান বা স্বাভাবিক বিরোধের প্রতিষ্ঠা হয় না। চিন্তামণি যেমন মনের মধ্যে, মনকে ধরিয়া ও জড়াইয়া, ওতপ্রোতভাবে তাহার সঙ্গে মিশিয়া ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন, সেইরূপ শৃঙ্গাররস বা আদিরসের মধ্যেই, আমাদের কাম-প্রবৃত্তিকে ধরিয়া ও জড়াইয়া, তাহারই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াই মাধুর্য্যরস ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ কেবল প্রজনন ক্রিয়ামাত্রকে শৃঙ্গারপদ-বাচ্য করিলে, তাহাকে মাধুর্য্য বলা যায় না। কিন্তু যখনই এই প্রজনন-ক্রিয়ার মধ্যে আনন্দ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহা রসপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া, প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিতে থাকে। শৃঙ্গার ও মাধুর্য্য দুইটী ভিন্ন বস্তু নহে। একই অভিজ্ঞতার বা একই সত্যের দুইটা দিক্ মাত্র। ছায়াকে ছাড়িয়া যেমন আতপ থাকে না, থাকিতেই পারে না, আর আতপের আশ্রয় ব্যতীত যেমন ছায়ার প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য, সেইরূপ শৃঙ্গার বা আদিরসকে বর্জ্জন করিয়া মাধুর্য্যরস জন্মিতে ও থাকিতে পারে না; আর মাধুর্য্যের আশ্রয় ব্যতীত শৃঙ্গার বা আদিরসেরও জন্ম বা স্থিতি আদৌ সম্ভব হয় না।

শৃঙ্গার রস আমাদের দেহকে আশ্রয় করিয়াই জন্মে, সত্য; কিন্তু আবার জন্মিয়াই এই রস যে সেই শরীরকেও আপনার যথাযোগ্য স্ফূর্তির অন্তরায় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করে, ইহাও সত্য। শরীরও এ রসসঞ্চারে আপনাকে সার্থক ভাবিয়া, তাহাকে আপনার মধ্যে রাখিতে চাহে। এই জন্য উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়। এই সংগ্রাম হইতেই স্বেদ-কম্পাদি মাধুর্য্য-চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আসঙ্গলিপ্সা এই রসের একটা অতি প্রধান লক্ষণ। স্বল্প-বিস্তর সকল স্থায়ী রসেতেই আপনার উপজীব্য যে বস্তু তার সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে। দাস প্রভুর নিকট নিত্যকাল থাকিতে চাহে। সখা সখার সঙ্গে গলাগলি করিয়া চিরদিন কাটাইতে চাহে। পিতামাতাও আপনার বাৎসল্যকে তৃপ্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা সন্তানের মুখ দেখিবার ও তাহাকে কোলে লইয়া, বুকে করিয়া রাখিবার জন্য লালায়িত হন। এ সকলই সত্য। কিন্তু দাস্যে বা সখ্যে বা বাৎসল্যে যে আসঙ্গলিপ্সা দেখা যায়, মাধুর্য্যের আসঙ্গলিপ্সার সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না। এমন কি এই দুই আসক্তি যে একজাতীয় ইহাও মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে। আপনার দেহ-মন প্রাণ সমুদায় প্রিয়জনের দেহ-মন প্রাণের মধ্যে একেবারে মিশাইয়া, একেবারে তাঁহাকে আত্মসাৎ ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার বাসনা এ রসে নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। তার দেহটাকে এই দেহের অণুতে অণুতে টানিয়া আনিতে চাহে। এই দেহটাকে তার দেহের অণুতে অণুতে মিশাইয়া দিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই যে প্রবল পিয়াসা, ইহাই শৃঙ্গারের আসঙ্গলিপ্সা। এই অদ্ভুত আসঙ্গলিপ্সা আর কোনও রসেতে নাই। আর এই লিপ্সা যত বলবতী হয়, ততই এ স্থূল শরীরটাকে রসস্ফূর্তির অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়। তখন বাস্তবিকই মনে হয় এ অস্থিমাংসময় দেহ যদি গলিয়া জল হইয়া যায়, তবে সেই জলে প্রিয়-অঙ্গের অভিষেক করিয়া প্রণয়িজন আপনার দেহকে সার্থক ও জীবন সফল করিতে পারিত।

অগুরু চন্দন হতাম,　তুয়া অঙ্গে মাখাইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায় হে!

এ কেবল একটা কথার কথা নহে। ইহাতে কেবল কবিকল্পনাসুলভ অতিশয়োক্তিই আছে বলিয়া মনে করা ঠিক নয়। ইহা মাধুর্য্যের সার্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতা। এ রস-শরীরটাকে ধরিয়া, শরীরটাকে নিঙাড়িয়া শরীরের শরীরত্বকে নষ্ট করিয়া, শরীরকেই আপনার ইন্দ্রজাল-প্রভাবে আত্মময় ও আত্মাকেই আবার যুগপৎ শরীরময় করিয়া তবে আপনার পরিণতি পাইবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে, কিন্তু পায় না। কারণ এ রস আনন্দস্বরূপ। যিনি রসস্বরূপ, শ্রুতি যাঁহাকে রসো বৈ সঃ বলিয়াছেন, এ রস তাঁহারই রসধারাকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহারই নিখিল রসমূর্তিকে পাইবার জন্য ফুটিয়া উঠে। এই জন্যই সাধক কবিকুল-চূড়ামণি চণ্ডীদাস এই শৃঙ্গার-রসের এমন মর্য্যাদা প্রচার করিয়াছেন :—

শৃঙ্গার বুঝিবে কে ?
সব রসসার শৃঙ্গার এ।
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গারে মজে॥
সকল রসের শৃঙ্গার সেবা।
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা॥
কিশোর কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥
চণ্ডীদাসে কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের মধ্যেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্য জন্মে সত্য ; কিন্তু এই শৃঙ্গার-রস-সম্ভোগের অধিকারীও জগতে সকলে হয় না।

উল্লাস এ রসের প্রাণ; সম্ভোগে যেখানে স্বাভাবিক অবসাদ আনিয়া দেয়, সে ক্ষেত্রে এই শৃঙ্গাররস ফুটিতে পায় না। নির্ব্বীর্য্য লোকের কামপীড়াতে শৃঙ্গাররস জন্মিতে পাবে না। প্রকৃত শৃঙ্গাররস যেখানে ফুটিয়া উঠে, সেখানে সম্ভোগে অবসাদ আসা তো দূরের কথা, কেবল উল্লাসই আরো উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়। এই জন্যই প্রকৃত মাধুর্য্যে সম্ভোগের পরে "রসোদ্গার" বর্ণিত হয়। এ রসোদ্গার অপূর্ব্ব বস্তু। ইহাতে প্রেমের জলন্ত পিয়াসা ও অনন্ত অতৃপ্তি বর্ণে বর্ণে স্ফুরিয়া উঠে।

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল:
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

ইহা প্রেমিকের কথা, কামুকের নহে। আর কাম ও প্রেম এক হইয়াও এক নহে।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

এই প্রেমই মাধুর্য্যের সার। ইহা কাম হইয়াও কাম নহে; শারীর হইয়াও অশরীরী; প্রাকৃত হইয়াও অপ্রাকৃত। এ রস রূপের মধ্যেই নিয়ত অরূপের শোভা ফুটায়; অরূপের মধ্যেই নিয়ত রূপ জাগাইয়া তোলে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রামাবতী

(৫)

সেকালের বাঙ্গালীর পক্ষে বাহুবলের প্রয়োজন ছিল। বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে হইত,—আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলেই আত্ম-প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে হইত। কারণ, বাঙ্গালাদেশের উপর অনেকেই লোলুপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন,—অবসর পাইবামাত্র অনেকেই বাঙ্গালাদেশের উপর আপতিত হইতেন।

রাজেন্দ্র চোড় এইরূপে একবার বঙ্গভূমির কিয়দংশ লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাহসী হইয়া, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেকালের বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই বাহু-বলের অনুশীলন করিতে হইত। জনসমাজে তাহার প্রশংসা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল;—কাব্যে ও কথোপকথনে তাহার জয়ধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের ন্যায় রাজকুমারগণকেও বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইত।

তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের তিন পুত্রের

মধ্যে রামপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পিতার শাসনকালেই বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, সমগ্র অরাতিচক্রকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহা তৎকালে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিল বলিয়া ইহার কথা মদনপাল দেবের [মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্র-শাসনে উল্লিখিত হইয়া ছিল। যথা,—

"শান্তোব চিরং জগন্তি
জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ।
তেজোভিঃ পরচক্র-চেতসি
চমৎকারং চকার স্থিরম্॥"

সে যুগে বাহুবলের প্রয়োজন ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রাধান্য ছিল। সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া বালক বীর রামপাল যে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, লোকসমাজে "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারিত। এরূপ অনুমান ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালীতে অবলম্বিত হইবার অযোগ্য বলিয়া কথিত হইতে পারিত না। কিন্তু রামপাল যে সত্য সত্যই এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, গৌড়-কবি সন্ধ্যাকরনন্দী [রামচরিতম কাব্যে] স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও, গুণগৌরবে রামপাল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্য সন্ধ্যাকর লিখিয়া গিয়াছেন —

"জ্যেষ্ঠেস্তেষু বিরেজে রামঃ।"

এখানে "জ্যেষ্ঠ" বলিতে যে বয়োজ্যেষ্ঠ বুঝিতে হইবে না, তাহা বুঝাইবার জন্য রাম-চরিতম্ কাব্যের টীকাকার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রশস্ততমঃ।"

রামপাল শ্রেষ্ঠ বলিয়াই "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন। পালসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়-কাহিনী স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়—প্রকৃতি-পুঞ্জের নির্ব্বাচনক্রমেই পালবংশীয় প্রথম নরপাল গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে সাম্রাজ্যে প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ-বিরাগের মূল্য ছিল। তাহাদের বাহুবল ছিল; প্রয়োজন উপস্থিত হইলে একত্র মিলিত হইয়া রাজশক্তিকে সুসংযত করিবার সামর্থ্য ছিল; রাজার পক্ষে প্রজা-পুঞ্জের ইচ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহা-দিগকে লোকপ্রিয় হইতে হইত। লোকপ্রিয় হইবার জন্য যত্ন করিতে হইত। যাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতেন, তাঁহাদের নাম ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পথে ঘাটে ভক্তিভরে গীত হইত। তাহাই তাঁহাদের সিংহাসনকে অটল করিয়া রাখিত,—শাসনকে শক্তিদান করিত,—সমৃদ্ধিকে স্ফীত করিয়া তুলিত।

রামপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও, "সর্ব্বসম্মত" হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়ে নানা আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছিল। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াই সে সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন কি না, তদ্বিষয়েও সংশয় আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল। অন্ততঃ রামচরিতম্ কাব্যে এইরূপ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোনও কালেই খলের অভাব ঘটে না। সেকালেও খলের অসদ্ভাব ছিল না। তাহারা মহীপাল দেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিল,—

রামপাল যখন "সর্ব্বসম্মত," তখন পিতার দেহাবসানের পর, তিনিই রাজ্যলাভ করিবেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব দেহত্যাগ করিবামাত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, এই আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে শূরপাল ও রামপাল সহোদরদ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামচরিতম কাব্যে এই আখ্যায়িকা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে কবি কল্পনা বলিবার উপায় নাই। কারণ, সমসাময়িক কবির পক্ষে এতদ্বিষয়ে অমূলক কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করিবার সাহস ও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। সুতরাং রামচরিতম কাব্যের এই আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া বুঝিতে পারা যায়,—দ্বিতীয় মহীপাল দেবের কর্ম্মদোষে গৃহকলহে তাঁহার শাসনশক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, তাঁহার এই ভ্রাতৃদ্রোহ তাঁহার বিরুদ্ধে লোকচিত্ত প্রধাবিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অটল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার [অনীতিকারস্তবত। নীতিবিগর্হিত অশিষ্ট আচরণে সিংহাসন টলিয়া উঠিল। পাল-সাম্রাজ্যের পক্ষে তাহার ফল বড় শোচনীয় হইল,—বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষেও হয়ত তাহারই ফল অধঃপতনের প্রবল বেগ প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিল। দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইল।

এই সময়ে পালসাম্রাজ্যের রাজধানী যেখানেই থাকুক না কেন, তাহা যে বরেন্দ্র-মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, সন্ধ্যাকর তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বরেন্দ্র-ভূমি বহুসংখ্যক কৃষিক্ষেত্রে ও আবাসগৃহে অলঙ্কৃত ছিল বলিয়া সন্ধ্যাকর তাহাকে সীতাবাসালঙ্কৃতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাল-নরপালগণের জন্মভূমি ছিল বলিয়া সন্ধ্যাকর তাহাকে 'জনকভূ" বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। সেই জনকভূ বরেন্দ্রী | কান্তা] কমনীয়া ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহীপাল দেবের নীতিবিগর্হিত আচরণে সেই জনকভূমি হইতে পালরাজগণের শাসনক্ষমতা উৎখাত হইয়া গেল। দ্বিতীয় মহীপাল দেব নিহত হইলেন। বিপ্লবের নায়ক কৈবর্ত্ত নায়ক দিব্য বা দিব্বোক উচ্চরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসনদণ্ড তাঁহারই করতলগত হইল। এই বিপ্লব-কাহিনী কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার স্মৃতিপট হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যকথা তাহাকে আবার বাঙ্গালার নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছে, এই বিপ্লবকাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ইহা এখন "কৈবর্ত্তবিপ্লব" নামে কথিত হইতেছে। ইহার বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রাও বাহাদুর সর্দ্দার সংসারচন্দ্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্ভিক্ষকমিশনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্রকে ভারতের নানাস্থানে কমিশনের বৈঠকে যোগদান করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য নাগপুরে অবস্থান কালে ১৯০১ সালের ১২ই জানুয়ারী তিনি স্বর্গারোহণ করেন। যে কর্ম্মক্ষেত্রে এই সুযোগ্য বঙ্গসন্তান বহুবর্ষ ধরিয়া অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন—সেখানে তাঁহার অভাব সম্যক্ অনুভূত হইতে লাগিল। এই বৎসর এপ্রেল মাসে মহারাজ সংসারচন্দ্রকে মন্ত্রি-সভার বৈদেশিক বিভাগের অন্যতম সদস্যপদে মনোনীত করিলেন। কৌন্সিলের বৈদেশিক বিভাগের (Foreign Department) কার্য্য বিশেষভাবে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সহিত সংসৃষ্ট এবং রাজ্যের সাধারণ ব্যবস্থার ভারও এই বিভাগের উপর অর্পিত। কাজেই প্রথম হইতেই রাজ্যশাসন-কার্য্যের প্রধান ভার সংসারচন্দ্রের উপর পড়িল।

সংসারচন্দ্র যখন কর্ম্মভার গ্রহণ করেন, তখন জয়পুররাজ্যের বড় দুঃসময় চলিতেছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রজাবৃন্দ তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রজাবৎসল মহারাজ মুক্তহস্তে প্রজাদিগকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। ইহার উপর আবার রাজ্যে মহামারী প্লেগ দেখা দিয়াছে। গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিয়া অবধি সংসারচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এই সকল নানা কারণে সংসারচন্দ্রকে প্রথম বৎসরে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংসারচন্দ্র কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া রাজ্যে ও রাজকার্য্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া লইলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজনপ্রিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতসাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডবার্ডের সিংহাসনারোহণ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ১৯০২ সালে জয়পুরাধিপতি ইংলণ্ডে যাইবার নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু-নরপতির বিলাত-গমন এক অভিনব ঘটনা—শুধু জয়পুরের কেন সমগ্র ভারতের ইতিহাসে ইহা নূতন। হিন্দুর চির-ক্ষুণ্ণ পথে চালিত জয়পুররাজ্যের জনসাধারণ এ প্রস্তাবের বিপক্ষে, কেবলমাত্র সংসারচন্দ্রই একা এ বিষয়ে মহারাজের সহায়। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে একত্র করিয়া যে যে কারণে বর্ত্তমানকালে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ, সে সমুদায় নিরাকরণ করিলে এ যাত্রার কোন শাস্ত্র-সঙ্গত বাধা আছে কি না জানিতে চাহিলেন। তারপর, বহু আলোচনার পর পণ্ডিত-বর্গের মত গ্রহণ করিয়া সংসারচন্দ্র মহারাজের বিলাত-গমনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নব নির্ম্মিত একটি সমগ্র জাহাজ ভাড়া লওয়া হইল—

কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত রহিল যে কোন কর্ম্মচারীই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মাংসাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তারপর অর্ণবপোত-শুদ্ধি এবং সমুদ্র-পূজার ব্যবস্থা হইল। সঙ্গের সমগ্র লোকের ছয়মাসের আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। মহারাজ স্বয়ং গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য জল পান করেন না তাঁহার জন্য পানীয় গঙ্গাজল যথারীতি হরিদ্বার হইতে লওয়ার ব্যবস্থা হইল। মহারাজের ইষ্টদেবতা গোপালজী সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহার নিয়মিত পূজাদির দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দাঁতনকাটিটি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যই পরিত্যক্ত হইল না। এই সময়ে সংসার-চন্দ্রকে দৈনিক ১৮।২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যবস্থা স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া করা তাঁহার অভ্যাস। এ সকলের মধ্যেও রাজ্যের নিয়মমত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত—কোনও কর্ত্তব্যই তাঁহার দৃষ্টিপথের বাহিরে যায় নাই। রাজ্যশাসনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজে মহারাজের সহিত বিলাত গমন করিলেন। এই কার্য্যে সংসার-চন্দ্র একক সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়পুর এবং মহারাজ মাধোসিংহের নাম জগতের নিকট সুপরিচিত করিয়াছিলেন। পরমহিন্দু জয়পুরাধিপের বিলাতগমন ইংলণ্ডে হিন্দুনরপতিগণের কি প্রকার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার নিষিদ্ধতার মূলে যে কোন শাস্ত্রসঙ্গত বাধা নাই তাহাও মহা-রাজের এই বিলাতযাত্রা হিন্দুর নিকট প্রমাণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা জগতের কাছে হিন্দুর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রমাণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে ভারত-সম্রাটের নিকট হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়া মহারাজ সমগ্র হিন্দুস্থানের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মহারাজের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর বৎসরই (১৯০৩) সপ্তম এডবার্ডের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে ভারতের পুরাতন রাজধানী দিল্লীতে লর্ড কর্জ্জন দরবার করিলেন। এই দরবারের পর রাজভ্রাতা ডিউক অফ্ কনট জয়পুরে শুভাগমন করেন। জয়পুরাধিপতিকে G. C. V. O. উপাধি প্রদান করিবার জন্য ভারত-সম্রাটের বিশেষ আদেশই তাঁহার জয়পুর আগমনের কারণ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট্—তৎকালে যুবরাজ (Prince of Wales)—পঞ্চম জর্জ্জ জয়পুরে আগমন করেন। যুব-রাজের অভ্যর্থনায় সংসারচন্দ্র যে প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার রাজকার্য্যে দূরদর্শিতা, কর্ম্মনিষ্ঠা এবং রাজ-ভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া স্বয়ং যুবরাজ এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট বারংবার তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব-কালের কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমরা তাঁহার শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ছোটবড় সকল কাজেই একটা শৃঙ্খলা-বদ্ধ নিয়মের প্রবর্ত্তন করা সংসারচন্দ্রের চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ ছিল—এ কথা আমরা বারে বার দেখাইয়াছি; শিক্ষকতারই হউক আর মন্ত্রিত্বের কার্য্যই হউক—তিনি কখনও কোন কাজ এলোমেলো রকমের করিতে পারিতেন

না। তাই এত কাযবাছল্যের মধ্যেও তিনি সকল দিক্ দেখিবার সময় ও অবসর পাইতেন। মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির পর তিনি নিয়ম করেন যে সপ্তাহে তিনদিন তিনি সাধারণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন। তন্মধ্যে একদিন রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের সহিত তাঁহাদের বৈষয়িক বিষয়ে ও অন্যান্য আলোচনা করিতেন। এক দিন রাজ্যের নানাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের যাঁহার যে বিষয়ে জিজ্ঞাস্য বা পরামর্শ ও উপদেশ লওয়ার থাকিত, তাঁহারা দেখা করিয়া মীমাংসা করিয়া লইতেন তৃতীয় দিনে প্রজাসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন—সে দিন ছোট-বড়, দীন-দরিদ্র সকলেরই অবারিত দ্বার, সকলেই তাহাদের অভাব অভিযোগ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি অবহিতভাবে সকলের কথা শুনিতেন এবং সর্ব্ববিধ অত্যাচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন। প্রজা-সাধারণের সহিত ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব এবং প্রজার প্রতি সহানুভূতি সবিশেষ প্রকাশ পাইত—দরিদ্র বা সহায়হীন বলিয়া কোন অত্যাচারিত বা দুঃস্থ তাঁহার কাছে বিমুখ হয় নাই। কেহ অন্যায় বা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে তিনি ধীরভাবে তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিতেন—কখনও বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন না। তাই বিফলমনোরথ হইলে প্রত্যর্থী কেহ অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিত না।

রাজকর্ম্মচারিগণ যখন যে বিষয় লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতেন—তিনি তৎ-ক্ষণাৎ তাহার সৎ মীমাংসা করিয়া দিতেন—সে সময় তাঁহার দূরদর্শিতা এবং রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত এবং রাজকার্য্য-পরি-চালনে বিশেষ শৃঙ্খলা ও সুবিধা হইত।

সুপণ্ডিত, উদারচেতা বিজ্ঞ লর্ড মর্লির মন্ত্রিত্বকালে ভারতবাসী যে সকল সুবিধা ও ক্ষমতা পাইবার জন্য উৎসুক—সংসারচন্দ্র জয়পুররাজ্যে সেই উদারনীতির প্রবর্ত্তনা করিয়া তাঁহার উচ্চ আদর্শের এবং দূরদর্শিতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যের শাসনবিভাগে যখনই কর্ম্মচারী পরি-বর্ত্তন বা নিয়োগের আবশ্যক হইত, তখনই তিনি স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ যাঁহারা জয়পুর কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তাহার ফলে আজ স্থানীয় বহু-সংখ্যক শিক্ষিত-যুবক রাজকার্য্যের নানা বিভাগে প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বহুসংখ্যক যুবক সেটেল্-মেণ্ট পুলিশ এবং কৃষিকার্য্যে বিশেষ ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া রাজকার্য্যে ও রাজ্যের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজ্যের উন্নতি এবং পরোক্ষ ভাবে শিক্ষালাভের জন্য জনসাধারণের আগ্রহ জন্মিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এই উদারনীতির উপস্থিত ফল সম্বন্ধে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন কথা বলা যায় না। কেননা জয়পুরের শিক্ষার অবস্থা দেখিলে মনে হয় সংসারচন্দ্র "fifty years ahead of his times" ছিলেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তিনি যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, জয়পুরের ভবিষ্যবংশীয়েরা তাহার ফলে লাভবান্ হইবে এবং এমন দিন আসিবে

যখন সংসারচন্দ্রের এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-রূপে সফল হইবে।

সংসারচন্দ্র জীবনের প্রথম অংশ শিক্ষা-বিভাগে কাটাইয়াছিলেন। মন্ত্রিত্বকালে তিনি শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক দুই শতাব্দী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত মহারাজ সবাই জয়সিংহ যে জ্যোতিষ যন্ত্রালয় নির্ম্মাণ করিয়া জগতের কাছে হিন্দুজ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন—আজও যাহা পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময়ের বিষয়—সেই যন্ত্রালয়সমূহ এতদিন অব্যবহারে ও অপ-ব্যবহারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া পড়িতেছিল। সংসারচন্দ্র জয়পুর, দিল্লী, কাশী প্রভৃতি [illegible]ই সকল 'যন্ত্রমন্দিরের' সংস্কারের [illegible] শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তা [illegible]কাতরে অর্থব্যয় করিয়া শুধু জয়পুর-[illegible]কন হিন্দুর এক প্রধান পুরাকীর্ত্তি [illegible]য়াছেন।

[illegible]চন্দ্রের চেষ্টাতেই জয়পুর "মহারাজ [illegible] বিজ্ঞান-বিভাগের সমধিক উন্নতি [illegible]হয় এবং আজ উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান-বিভাগে উপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে D. S C. (ডি, এস্, সি) পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইতেছে; তিনি এইখানেই ক্ষান্ত ছিলেন না। মহারাজের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্ এল্ ডি (L L D) উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে যে সভা হয়, তিনি সেই সভায় প্রতি বৎসর দশটি ছাত্রকে নানাপ্রকার কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার জন্য বৎসরে দশ হাজার টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। এই সকল ছাত্র বিদেশে গিয়া যাহাতে পূর্ত্ত, ব্যবহার-শাস্ত্র এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া জয়পুররাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রস্তুত হইতে পারে, তিনি তাহার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

জয়পুররাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ সর্দ্দারদিগের সহিত সংসারচন্দ্র নানাপ্রকারে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন বর্ত্তমান সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকেই সংসারচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন এবং অধিকাংশের বংশের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাই তিনি তাঁহাদের পুত্র বা তৎবংশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে ও যত্নে এখন অনেকেই আজমীর মেয়ো কলেজে (Mayo College) শিক্ষালাভ করিতেছেন। সংসারচন্দ্র সর্দ্দারপুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। নাবালক সর্দ্দারগণের বিষয় রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিনি এই সকল "ঠিকানা"-পরিচালনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার একান্ত যত্নে যে কত নাবালকের সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং কত ঋণভারগ্রস্ত "ঠিকানা" এই 'মুন্সরিমীর' কালে ঋণমুক্ত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে—তাহার বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে।

রাজকার্য্য এবং বিচারাদি যাহাতে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয় সেজন্য সংসারচন্দ্র মন্ত্রিসভার কার্য্যপ্রণালীর বিবিধ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করেন। মন্ত্রিসভার চারিটি বিভাগ, প্রথম,—বৈদেশিক বিভাগ (Foreign Department), এই বিভাগের উপর রাজ্যের

আভ্যন্তরীণ শাসন এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত রাজনৈতিক পত্র ব্যবহারের ভার ন্যস্ত। দ্বিতীয়,—রাজস্ব। তৃতীয়,—দেওয়ানী আপিল এবং চতুর্থ,—ফৌজদারী আপিল বিভাগ। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে সদস্যগণ প্রতিদিন প্রথমে নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য শেষ করিয়া শেষে একত্র হইয়া "সমবেত মন্ত্রিসভাব" নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেন। এই শেষোক্ত সভার নাম—"ইজ্‌লাস্ জুম্‌লা মেম্বারান্"—ইঁহাদের কার্য্য কতকটা হাইকোর্টের Full Bench এর মত—ইহাতে বড় বড় মোকদ্দমার আপিল এবং রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আলোচনা হয়। পূর্ব্ব নিয়মে সদস্যগণ প্রথমে নিজ নিজ "সিগা" বা বিভাগের কার্য্য করিয়া—শেষে—"ইজ্‌-লাসের" গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিতেন। তাহার ফলে এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্যে সর্ব্বদা নানা গোলযোগ, অব্যবস্থা এবং ত্রুটি লক্ষিত হইত। ইহাতে রাজ্যের এবং প্রজার—উভয় পক্ষেরই বিবিধ অসুবিধা ঘটিত। সংসারচন্দ্র এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য 'সিগার' এবং ইজ্‌লাসের কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এই সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনে কার্য্যের যে শৃঙ্খলা ও সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে মন্ত্রিসভায় উকিলদিগের বিশেষ কোন সম্মানই ছিল না। সংসারচন্দ্রের আমলে তিনি ইজ্‌লাসের কার্য্যে রাজ্যের এবং প্রজার পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য পাওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহারাজীবদিগের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেখানে অল্পশিক্ষিত মুন্সিগণ আদালতে নিজ নিজ মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিত—আজ সেখানে এল্, এল্ বি পাশ করা আইনজ্ঞ উকিল মন্ত্রিসভায় ওকালতি করিতেছেন।

বর্ত্তমান কালে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়—রেলওয়ে। রাজপুতানার মত প্রায়শ দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের পক্ষে রেলওয়ের মত দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে আবশ্যক মত শস্যাদি প্রেরণের কোন উপায় ছিল না—রেললাইন সে সকল স্থান সর্ব্বপ্রকারে সুগম করিয়া দিয়াছে। ইহা রাজা-প্রজা সকলেরই লাভের কারণ। সংসার-চন্দ্রের মন্ত্রিত্ব কালে "জয়পুর—সবাই [illegible] ষ্টেট রেলওয়ে" খোলা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে মহারাজ নবনির্ম্মিত "[illegible] মথুরা" রেলওয়ের যে ৮৫ মাইল জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে, তাহার [illegible] খরচ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। [illegible] দুই রেলওয়ে লাইন রাজ্যের বাণিজ্য ও রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। সংসারচন্দ্রই প্রস্তাবত "জয়পুর—শিখাবতী" রেল লাইনের সূত্রপাত করিয়া যান—কিন্তু নানা কারণে তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে কাজ আরম্ভ হইতে পারে নাই—কেবল সর্ভে ও এষ্টিমেট হইয়াছিল মাত্র। এই লাইন সম্পূর্ণ হইলে—জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম প্রদেশ সর্ব্ব-বিষয়ে উন্নতি লাভ করিবে।

সংসারচন্দ্র জয়পুরের [illegible]

কার্য্যপ্রণালীর আমূল সংশোধন করিয়া ইহাকে এক প্রকার নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তিনিই জয়পুররাজ্যের ডাক টিকেট প্রথমতঃ প্রচলন করেন। পূর্ব্বে চিঠী প্রভৃতি ডাকঘরে দিবার সময় মাশুল আদায় করা হইত অথবা চিঠী বা পার্শেল প্রভৃতি বেয়ারিং হইয়া মাশুল আদায় হইত। সংসারচন্দ্র ইংরাজী ডাকবিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এবং ডাকের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া এই বিভাগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি করেন। ডাকের সুবাবস্থা হওয়ায় প্রজারা রাজ্যের ডাক-বিভাগের উপর অধিকতর আস্থাবান্ হওয়ায় রাজ্যে ডাকঘরের এবং পত্র-পার্শেলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল। তিনি রাজ্যমধ্যে ডাক-বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না—তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া লর্ড মিণ্টোর দরবারে জয়পুরের সহিত গভর্ণমেণ্টের Postal Convention-এর প্রতিশ্রুতি আনাইয়াছিলেন, কিন্তু করাল কাল তাঁহাকে ইহা সম্পূর্ণ করিতে দিল না।

রাজকার্য্যের প্রতি বিভাগেই সংসারচন্দ্র ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আমরা তাহার সবিস্তার বর্ণনা হইতে বিরত থাকিলাম। তিনি নিজের অসাধারণ চরিত্রবলে সমগ্র রাজকর্ম্মচারী ও রাজন্যের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসুলভ। যে দেশে উৎকোচ গ্রহণ কখনই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত না—সেখানে তিনি সদ্বংশজাত শিক্ষিত কর্ম্মচারী [illegible] করিয়া, দোষীকে দণ্ড দিয়া এবং উপদেশ [illegible] দ্বারা দেশীয় রাজ্যের এ কলঙ্ক মোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ছোট বড়, ধনী-দরিদ্র, সর্দ্দার ও সাধারণ প্রজার কোন ভেদ ছিল না। তিনি অত্যাচারিতের বন্ধু এবং দরিদ্রের সহায় ছিলেন। তিনি জ্ঞানতঃ কখন ন্যায় ও সত্যের পথ হইতে রেখামাত্রও ভ্রষ্ট হ'ন নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষমাত্রেরই ভ্রম হইতে পারে—সংসারচন্দ্রও মানুষ—তিনিও অভ্রান্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পরম শত্রুও কখন তাঁহার ন্যায়পরতা ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র করিতে পারে নাই।

সংসারচন্দ্র মহারাজ মাধো সিংহের একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে আমার দ্বারা যদি রাজকার্য্যের কোন সুবিধা বা উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ আমার নিজের ক্ষমতা নহে—মহারাজার গুণে। বাস্তবিক তাঁহার প্রতি মহারাজের এত গভীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল যে তিনি সংসারচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত সর্ব্বপ্রকার সংস্কার বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতেন এবং যাহাতে সে সকল নিয়ম কার্য্যে পরিণত হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে মন্ত্রী সংসারচন্দ্র দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন এবং রাজ্যশাসনে অনেক সময় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। যে দেশে ন্যায়-অন্যায়-নির্ব্বিচারে স্বার্থসিদ্ধিই রাজনীতির মূল মন্ত্র, যেখানে পরপীড়নেই ক্ষমতার সার্থকতা এবং বাহ্যাড়ম্বরেই পদগৌরবের প্রকাশ, সেখানে ধর্ম্মভীরু ন্যায়নিষ্ঠ এবং স্বভাবতঃ ভদ্র ও বিনয়ী সংসারচন্দ্র যে শাসনকর্ত্তার সে আদর্শে পৌছিতে পারেন নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সেখানকার তুলাদণ্ডের পরিমাণে

ভদ্রতা ও বিনয়—দুর্ব্বলতা, ন্যায়পরতা—দুর্ব্বলতা, ধর্ম্মজ্ঞান—বিষয়বুদ্ধির অভাবের পরিচায়ক। সৌভাগ্যের বিষয় সংসারচন্দ্র সে আদর্শকে কখনও সম্মান করিতে পারেন নাই। তিনি শান্ত, সংযত, আড়ম্বর শূন্য হইয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বার্থকে ধর্ম্মের ন্যায়ের আসনে বসান নাই। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং প্রভুপরায়ণতা তাঁহার জীবনের সর্ব্বকর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম্মকে বজায় রাখিয়া যাঁহারা রাজ্যশাসনকার্য্যে ব্রতী হয়েন, তাঁহাদের পক্ষে এ'পথ যে কত কঠিন এবং বিপদ্‌সঙ্কুল, তাহা বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব নহে। সংসারচন্দ্র ধর্ম্মের এবং ন্যায়ের সহস্র সংযমের মধ্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন—তাহা তাঁহার মত যাঁহারা ধর্ম্মকে একমাত্র মানদণ্ড এবং ভয় করিবার বস্তু বলিয়া জানেন—যাঁহারা ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভীত হ'ন না—তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব।

রাজপুত এবং রাজপুতানার বিশেষতঃ জয়পুরের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে সংসারচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাহা মহারাজ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যমণ্ডলীর নিকট রাজ্যের নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসার পক্ষে অমূল্য ছিল। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবেই জয়পুর রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত-সর্দ্দারগণ সসম্মানে এই ন্যায়নিষ্ঠ বাঙ্গালীর নিকট অবনত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং পর পর অনেক রেসিডেণ্ট এবং রাজপুতানাস্থিত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ সংসারচন্দ্রকে একান্ত বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহারা একবাক্যে তাঁহার রাজভক্তি, কর্ম্মনিষ্ঠা এবং উদার শাসনপ্রণালীর সুখ্যাতি করিয়াছেন।

মহারাজ এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট কেহই সাধুপ্রকৃতি প্রভুপরায়ণ সংসারচন্দ্রের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। অভিষেক-দরবারে মহারাজের সহিত বিলাত-প্রবাস কালে সম্রাট্ সপ্তম এডবার্ড তাঁহাকে "করোনেশন মেডেল" এবং তাহার পর বৎসর দিল্লী-দরবারে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ (তৎকালে যুবরাজ) জয়পুরে আসিয়া সংসারচন্দ্রকে M. V. O. (Member of the Royal Victorian Order) খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং এই বৎসরেই জয়পুরাধিপতি তাঁহাকে রাজ্যের "তাজিমী" বা প্রধান সর্দ্দারশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। দুই বৎসর পরে, (১৯০৭) মহারাজ প্রকাশ্য দরবারে সংসারচন্দ্রকে "প্রধান মন্ত্রী" পদে বরণ করিয়া তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ জায়গির প্রদান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নববর্ষারম্ভে ভারত গবর্ণমেণ্টের সংসারচন্দ্রকে C. I. E. উপাধি প্রদান করেন। সেই বৎসর মার্চ্চ মাসে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত এই প্রবীণ, প্রভুভক্ত রাজকর্ম্মচারীকে তাঁহার গৃহে আসিয়া উক্ত উপাধি পদক প্রদান করিয়া যোগ্যতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গদর্শন

নিমাই-চরিত্র

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

গৌড়ীয় ভক্তগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন, গৌরের বৃন্দাবনযাত্রা, শান্তিপুর-গমন, রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ, রঘুনাথ দাসের সহিত সাক্ষাৎ

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের আবাসে উপস্থিত হইলে, গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা হইতে আসিলেন ?"

অদ্বৈত—জগন্নাথ দেখিয়া আসিতেছি।

গৌর—আপনি জগন্নাথ দর্শন করেন কিরূপে বলুন দেখি।

আচার্য্য—কেন, দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করি।

গৌর—আমি ওরূপভাবে ঠাকুর দেখি না। প্রদক্ষিণ করিলে কিছুক্ষণ ঠাকুরের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ক্ষণেকের অদর্শনও সহ্য করিতে পারি না। তাই প্রদক্ষিণ না করিয়া অপলক নয়নে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

এইরূপ নানা আলাপে গৌর গৌড়ীয় ভক্তগণের সহবাসে চারিমাস কাটাইলেন। এ চারিমাস ভক্তগণের বড় সুখেই অতিবাহিত হইল। তাঁহারা একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলেই গৌরকে খাওয়াইলেন। গৌর তাঁহাদিগের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করিতেন। চারি মাস তিনি তাঁহাদিগের সহিত নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিলেন ; জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহাদিগের সহিত গোপীবেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিলেন ; বিজয়া দশমীর দিন তাঁহাদিগকে বানর সাজাইয়া ও নিজে হনুমান্ সাজিয়া রামলীলা অভিনয় করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সহবাসে গৃহের কথা ভুলিয়া রহিলেন।

অবশেষে বিদায়ের দিন সমাগত হইল। ভক্তগণ শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। গৌর সুমিষ্ট বচনে সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় আসিয়া চারিমাস আমার সহিত নীলাচলে অবস্থান করিবে ; এখন দেশে ফিরিয়া যাও।" অদ্বৈতাচার্য্যকে কহিলেন, "আচার্য্য, দেশে তোমার জন্য প্রচুর কর্ম্ম পড়িয়া আছে ; তুমি দেশে ফিরিয়া গিয়া আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ কর।" নিত্যা-

নন্দকে কহিলেন, "নিতাই, তোমাকে গৌড়দেশে যাইতে হইবে। রামদাস গঙ্গাধর প্রভৃতি ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তুমি তথায় প্রেমভক্তি-প্রচারের ভার গ্রহণ কর।" অতঃপর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার প্রাঙ্গণ আমার নিত্য-বিহারভূমি। আমি প্রত্যহ তথায় নৃত্য করিব, কিন্তু তুমি ভিন্ন কেহ আমায় দেখিতে পাইবে না।" একখানা বস্ত্র শ্রীবাসের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমার মাতাকে এই বস্ত্র দিয়া বলিবে, তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া যে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতে আমার ধর্ম্মনাশ হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে আছি। মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ-দর্শনাভিলাষে আমি তাঁহার নিকট যাই। কিন্তু তিনি দেখিতে পান না। একদিন নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করত ইষ্টদেবতাকে নিবেদন কালে আমাকে স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতে পারিয়া, সেই আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বালগোপাল তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল; তাঁহাকে বলিও আমিই গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলাম।" শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন। মুকুন্দ ও নরহরি দুই সহোদর। গৌর হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে কহিলেন, "মুকুন্দ, তুমি রঘুনন্দনের পুত্র না রঘুনন্দন তোমার পুত্র?" মুকুন্দ কহিলেন, "রঘুনন্দন হইতেই আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছি। সুতরাং রঘুনন্দন পিতা, আমরা তাহার পুত্র।" তখন গৌর কহিলেন, "মুকুন্দ ছিলেন ম্লেচ্ছরাজার বৈদ্য। একদিন এক ভৃত্য ম্লেচ্ছরাজার মাথার উপর এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী ধরিয়াছিল। মুকুন্দ সেই শিখিপুচ্ছ দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুকুন্দের মত ভক্ত বিরল।" কিন্তু মুকুন্দ ও রঘুনন্দনকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গৌর আদেশ করিলেন। নরহরি তাঁহার নিকট থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া গৌর ভক্তগণকে কহিলেন, "মুরারির ভক্তি অনন্য-সুলভ। ইনি রঘুনাথমন্ত্রের উপাসক। একদিন আমি তাঁহাকে বারবার বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজনা করিতে মত লওয়াইলাম। কিন্তু গৃহে গিয়া কিরূপে তিনি রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত হইলেন। সমস্ত রাত্রি কাঁদিতে কাঁদিতে গেল,—পরদিন প্রত্যূষে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "আমি রঘুনাথের চরণে মাথা বেচিয়াছি। তাহা আর ফিরিয়া লইতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব কিরূপে? তুমি দয়া করিয়া এইরূপ কর—যেন আমি এখন তোমার সম্মুখে মরিয়া এই দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই।" এই ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, "গুপ্ত, তোমার ভজনই সার্থক। প্রভুচরণে তোমারই মত দৃঢ়প্রীতি প্রভুর গ্রাহ্য। প্রভু যদি পদ ছাড়াইয়া নিতে যান, তবু সে পদ ছাড়িয়া দিতে সেবক পারে না। আমি পরীক্ষা করিবার জন্যই তোমাকে রঘুনাথমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম। তুমি সাক্ষাৎ হনুমান—তুমি

কেন শ্রীরামের চরণ ত্যাগ করিবে।” তখন বাসুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া গৌর তাহা'র গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—

“জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার,
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে,
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লইয়া মুঞি করোঁ নরকভোগ,
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥”

গৌর কহিলেন, “ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কখনও ভক্তবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। তুমি যখন ব্রহ্মাণ্ডের জীবের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছ, তখন সকলেই উদ্ধার লাভ করিবে।”

কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরচরণে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর গৌরের সহিত নীলাচলে রহিলেন।

ভক্তগণ প্রস্থান করিলে সার্ব্বভৌম একদিন গৌরকে মিনতি করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে মাসাবধি ভিক্ষা করিতে হইবে।” গৌর কিছুতেই রাজী হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিনের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী পরম যত্নে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া গৌরকে পরিবেশন করিলেন। অত্যধিক প্রীতিবশতঃ অত্যধিক দ্রব্য গৌরের পাত্রে পরিবেশিত হইল। গৌর তাঁহাদের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া ভোজনে বসিলেন। এমন সময় সার্ব্বভৌমের জামাতা, তাঁহার কন্যা ষাঠীর স্বামী অমোঘ ভট্টাচার্য্য ভোজনগৃহের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “বাপরে খাওয়া দেখ, ১০।১২ জনের ভাত সন্ন্যাসীটা একা খাচ্ছে।” সার্ব্বভৌম এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন এবং একলাঠি হস্তে লইয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। অমোঘ পলাইয়া গেল। সার্ব্বভৌম-গৃহিণীও জামাতার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন “এমন পাষণ্ডের স্ত্রী হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, ষাঠী বিধবা হউক।” গৌর হাসিতে হাসিতে তাহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বজনকর্তৃক প্রভুর অপমান হইল ইহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌম মহা দুঃখিত হইলেন। ভোজনান্তে সার্ব্বভৌম গৌরকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন জামাতার আর মুখদর্শন করিব না। এদিকে অমোঘ পলায়ন করিয়া দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই রাত্রিতেই তাহার বিসূচিকা রোগ হইল। গৌর সেই সংবাদ শুনিয়া ত্বরিতে তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাহাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া অবশেষে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। অমোঘ নিরাময় হইয়া পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে গৌর রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমের নিকট বৃন্দাবন গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা বিচ্ছেদাশঙ্কায় কহিলেন—“সম্মুখে রথযাত্রা, রথযাত্রার পরে গমন করিও।” রথযাত্রা অতিক্রান্ত হইলে গৌর স্বীয় অভিপ্রায় পুনরায় ব্যক্ত করিলেন।

তখন তাঁহারা কহিলেন—"কার্ত্তিক মাসে যাইও।" কার্ত্তিক মাসে দুরন্ত শীত বলিয়া আপত্তি হইল। এইরূপে চারি বৎসর গেল। পঞ্চমবৎসরে গৌর দৃঢ়ভাবে স্বীয় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিলেন। এবার আর ওরূপ আপত্তির কোনও ফল হইল না। বিজয়া দশমীর পর দিন গৌর বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে পুরী ত্যাগ করিলেন। কটকে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার গমনের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। রামানন্দ, স্বরূপ-গদাধর ও অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত কটক পর্য্যন্ত গৌরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কটক ত্যাগ কালে গৌর গদাধরকে পুরুষোত্তমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া কহিলেন—"তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। তাহা ত্যাগ করিয়া আমার সহিত আসা তোমার অকর্ত্তব্য।"

পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে, ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে, কোটিসেবা ত্বৎপাদদর্শন॥
প্রভু কহে, সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ।
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥
পণ্ডিত কহে, সব দোষ আমার উপর॥
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর।

গদাধর গৌরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী চলিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাকে ডাকিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৌর কহিলেন—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ,
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥

বলিয়া গৌর নৌকায় আরোহণ করিলেন। গদাধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া পুরী লইয়া গেলেন। রামানন্দ যমুনা পর্য্যন্ত গৌরের সঙ্গে গিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৌর উড়িষ্যা দেশের সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, বঙ্গদেশীয় এক যবন-রাজা তাঁহার অলৌকিক ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। যবনরাজ পিছলদা পর্য্যন্ত গৌরের সহিত গমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আসিলেন। গৌর অবশেষে পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থান করিলেন। তথা হইতে কুমারহট্টে শ্রীনিবাসের গৃহ হইয়া শিবানন্দ সেনের গৃহে ও তৎপরে বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৌর গৃহমধ্যে ছিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখাইবার জন্য বিদ্যাবাচস্পতির চরণ ধরিয়া কাকুতি করিতে লাগিল। গৌর বাহিরে আসিলেন—তখন তাঁহার দুই নয়নে অবিরল জলধারা, মুখে হরিধ্বনি, দুই হস্ত উত্তোলিত। ভক্তগণ সে মূর্ত্তি দেখিয়া পাগল হইল। সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং লক্ষ কণ্ঠ হইতে "পাপিষ্ঠ আমাকে উদ্ধার কর" যুগপৎ এই প্রার্থনা সমুত্থিত হইল।

"শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক" বলিয়া গৌর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল এবং গৌরকে দেখিবার জন্য উন্মত্তের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই জনতার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে গৌর এক রাত্রিতে পলায়ন করিয়া কুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। পরদিন অগণিত লোক আসিয়া যখন শুনিল গৌর পলায়ন করিয়াছেন—তখন প্রথমে তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিল না; অবশেষে সকলে বিদ্যাবাচস্পতিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। বাচস্পতি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে গৌর কুলিয়া গমন করিয়াছিল। তিনি সেই কথা বলিয়া সকলের সমভিব্যাহারে কুলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর কুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সকলে তথায় তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। কুলিয়ায় কয়েক দিন অবস্থানপূর্ব্বক গৌর বহুলোককে হরিনাম দান করিলেন। এইখানে দেবানন্দ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। গৌর তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়া ভাগবত অধ্যাপনা করিবার আদেশ করত বিদায় দিলেন।

কুলিয়া হইতে গৌর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। পুত্রবিধুরা শচীদেবী আসিয়া তথায় পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কতিপয় দিবসান্তে গৌর গৌড়নগরের সন্নিহিত রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনাশায় তথায় উপনীত হইল।

হোসেন সাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। গৌরের রামকেলি আগমন বাদশাহের কর্ণগত হইল। বাদশাহ তাঁহার হিন্দু অমাত্যদিগকে গৌরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন হিন্দুসভাসদ্‌গণ প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। হিন্দু-বিদ্বেষী যবনরাজ পাছে সন্ন্যাসীর কোনও অনিষ্ট সংকল্প করেন এই ভয়ে তাঁহারা কহিলেন, "কোথাকার এক ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থে চলিয়াছে, তাহার সহিত দুই চারি জন লোক আসিয়াছে। বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন গুণ তাহার নাই।" কিন্তু গৌরের কথা শ্রবণ করিয়া বাদশাহের মনে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি কাজী ও কোটালগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন—যেন তাঁহার প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত না হয়। এই হোসেন শাহই উড়িষ্যায় বাসুদেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

বাদশাহের ব্যবহারে হিন্দুসভাসদ্‌গণ প্রীত হইলেন, কিন্তু অস্থিরমতি রাজা কখন স্বীয় আদেশের প্রত্যাহার করে, এই ভয়ে তাঁহারা গৌরের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ত্বরায় রামকেলি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। গৌর তাঁহাদের উপদেশ অবহেলা করিয়া তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিলেন।

বাদশাহের হিন্দুপারিষদ্‌গণের মধ্যে রূপ ও সাকর মল্লিক নামক দুই সহোদর ছিলেন। সাকর মল্লিক দবীর-খাস পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই গৌরের নবদ্বীপলীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাকর কয়েক বার কয়েকখানা চিঠিও গৌরকে

লিখিয়াছিলেন। গৌরের রামকেলি অবস্থানকালে একদিন দুই ভ্রাতায় আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, এবং নানা প্রকার দৈন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। সাকর নানাবিধ স্তব করিয়া কহিলেন—

মেচ্ছজাতি মেচ্ছসেবী করি মেচ্ছকর্ম্ম
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বাঁধিয়া,
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া।
আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজ বল,
পতিতপাবন নাম তবে সে সকল।

তখন—

শুনি মহাপ্রভু কহেন, শুন দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্র দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রীদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহি বারে বারে॥
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

পরপুরুষে আসক্ত নারী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনে মনে জারসঙ্গ-জনিত সুখেরই আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনন্তর গৌর কহিলেন "আমি তোমাদিগকে দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি— নহিলে গৌড়ে আমার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তোমরা বহু জন্ম যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই তোমাদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন; এখন গৃহে গমন কর।" গৌর উভয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর উভয়কে আলিঙ্গন দান করত ভক্তগণকে কহিলেন "তোমরা ইহাদিগকে অনুগ্রহ কর।" রূপ ও সনাতন তখন সকল ভক্তের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে সনাতন বিনীত ভাবে কহিলেন "প্রভু! গৌড়াধিপতি যবন, যদিও বর্ত্তমানে সে তোমার প্রতি ভক্তিমান্ আছে, তথাপি তাহার মনের ভাব যে পরিবর্ত্তিত হইবে না তাহার নিশ্চয় নাই। আর তীর্থযাত্রায় এত লোকসংঘট্টও ভাল নহে। যদিও তোমার নিজের ভয়ের কোনই কারণ নাই, তথাপি লৌকিক লীলা লৌকিক ভাবেই হয়। তাই নিবেদন করিতেছি—এরূপভাবে বৃন্দাবনে না গিয়া, এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

পরদিন রামকেলি ত্যাগ করিয়া গৌর কানাইর নাটশালা গ্রামে গমন করিলেন। তথায় সনাতনের উপদেশ মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন "এত লোকজন সহ বৃন্দাবন যাওয়া বাস্তবিকই বিধেয় নহে।" এই ভাবিয়া গৌর বৃন্দাবনগমনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন এবং সত্বরই শান্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শান্তিপুরে গৌর দশদিন অবস্থান করিলেন। এখানে সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। গোবর্দ্ধন মহা ধনী। তিনিও তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্য সৎকুলসম্ভূত, সদাচারপরায়ণ ও পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। নদীয়ায় এমন কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না যিনি হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের বৃত্তি ভোগ করিতেন না। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্রকে উভয়

ভ্রাতা বিশেষ ভক্তি করিতেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। শৈশব হইতেই রঘুনাথ সংসারে উদাসীন ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গৌর প্রথম যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, রঘুনাথ তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া রঘুনাথ পাগলের মত হইলেন। গৃহ তাঁহার নিকট কারাগারের মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই কারাগার হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কয়েকবার পলায়ন করিলেন—কিন্তু কয়েকবারই পিতৃ-প্রেরিত লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে গৌর শান্তিপুরে আগমন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ পিতার নিকট তদ্দর্শনে গমন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অনেক অনুনয়ের পর অনুমতি লাভ করিলেন। শান্তিপুরে আগমন করিয়া রঘুনাথ গৌরের নিকট নীলাচলে বাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং পিতার শৃঙ্খল ছেদন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু গৌর তাঁহার সংসারত্যাগের সংকল্পের অনুমোদন করিলেন না, তিনি কহিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর, লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

রঘুনাথের সংসারে প্রত্যাগমন করিবার নিতান্ত অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া গৌর অবশেষে কহিলেন "এখন গৃহে যাও, আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইব, তখন তথায় গিয়া আমার সহিত মিলিত হইও।" রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং প্রভুর আদেশে পূর্ব্ব চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

গৌর বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপলা

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্মোৎসবে

গঙ্গা ও হিরণ্যবতীর সঙ্গমস্থলে বিশাল পাটলীপুত্র নগর। উপকণ্ঠভাগ পরিত্যাগ করিলেও দীর্ঘে বিংশতি এবং প্রস্থে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত এই মহানগরের চারিদিকে চারিশত হস্ত পরিসর, বিংশতি হস্ত গভীর, জলপরিপূর্ণ পরিখা। পরিখার প্রান্তে প্রান্তে সমস্ত নগর-বেষ্টিত ইষ্টক, প্রস্তর এবং বিশাল কাষ্ঠদণ্ড-নির্ম্মিত দৃঢ়গঠিত প্রাচীর। প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরপ্রবেশের চতুঃষষ্টি দ্বার। প্রাচীর-

শিরে পরস্পর সমদূর ব্যবধানে নির্ম্মিত সু-উচ্চ শত শত প্রহরিকক্ষ। প্রতিকক্ষে পর্য্যায়-ক্রমে নিত্যজাগ্রত বর্ম্মধারী ধনুর্ধর প্রহরী। প্রহরীর তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া লোকের নগরপ্রবেশ অথবা নগর হইতে বহির্গমন অসম্ভব।

আজ রাজাধিরাজ অশোকদেবের জন্মদিন। নগরে মহা উৎসবঘটা। প্রতি প্রহরিকক্ষশিরে পতাকা। নগরপ্রবেশের প্রতিদ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ, তাহাতে আম্র, অশোক অথবা অশ্বত্থপল্লব। ফুলমালা পত্রপল্লবে দ্বারের অপূর্ব্ব শোভা। প্রতি প্রহরিকক্ষে, প্রতি দ্বারপার্শ্বে বাদিত্র। মৃদঙ্গ, ভেরি, পটহ, খরতাল, ঝঝর, মর্দ্দলের উচ্চরবে সমস্ত নগর কোলাহলময়।

সমস্ত নগর সজ্জিত। প্রতিগৃহচূড়ে চীনাংশুক-পতাকা, গৃহদ্বারে ফুলপাতার মালা, মঙ্গলঘট। সমস্ত পথে লোকের সমাবেশ। ধৌত উদ্গমনীয়, ক্ষৌম, কৌশেয় নানাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত উদ্‌গ্রীব উল্লসিত লোকসঙ্ঘ রাজপুরী অভিমুখে চলিয়াছে।

রাজপুরীর সম্মুখে অতি প্রশস্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ। প্রাঙ্গণের প্রান্তে নানা ভাগে বিভক্ত রঙ্গভূমি। ভীমকায় মল্ল, যষ্টিক, খড়্গাধারী, কুঠারী, মুদ্গরী, প্রাসিক যোদ্ধারা অমানুষিক বল, অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকৌশল দেখাইয়া সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। ষণ্ডে ষণ্ডে, গণ্ডারে গণ্ডারে, মহিষে মহিষে, গজে গজে, মেষে মেষে ভয়ানক যুদ্ধ। মল্লগণের আস্ফালন, হুহুঙ্কার, বাহুর আস্ফোটন, দর্শক-বৃন্দের উৎসাহধ্বনি অথবা টিটকারী, বিজয়ী দ্বন্দ্বীর বন্ধুবান্ধবের উল্লাস-কোলাহল, বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর শুভাকাঙ্ক্ষিগণের আপত্তি ও প্রতিবাদ; যুযুৎসু পশুগণের উচ্চ গর্জ্জন, ভয়াবহ সংঘর্ষ; পলায়মান পশুর বিকট আর্ত্তনাদ, বিজয়ীর হুহুকার শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত; ধরাতল কম্পিত।

অঙ্গনের স্থানে স্থানে সুবৃহৎ সুশোভন পট্টাবাস। তাহাতে নট-নটী, গায়ক-গায়িকা, বৈণিক, বৈণবিক, মৌরজিকগণ নৃত্যগীতবাদ্য-কৌশলে শত শত শ্রোতা দর্শকের চিত্ত উৎফুল্ল করিতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্রবেশ ভণ্ডের কৌতুক অথবা বাক্‌চাতুর্য্যে শ্রোতার অট্টহাস্য, করতালি; কোন স্থানে মায়াবী ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত কর্ম্মে মুগ্ধ দর্শকের স্তম্ভিতদৃষ্টি। শত সহস্র নাগরিক, গ্রামিক—আবালবৃদ্ধ—আজিকার মহোৎসবঘটায় উন্মত্ত, উল্লসিত।

যাগ, যজ্ঞ, পূজা, বলি, হোম, বেদপাঠ, অভিষেক-ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। রাজাধিরাজ স্বর্ণরৌপ্য, মণিরত্নে তুলিত হইয়াছেন। তুলিত স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিরত্ন—সহস্র সহস্র মুদ্রা, রাশি রাশি বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে। রাজাধিরাজের মঙ্গলকামনায় অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, হোতা, ঋত্বিক, স্নাতক, শ্রোত্রিয়, সাগ্নিক, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, সদস্য, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, ভট্ট, ভিক্ষু, অন্ধ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, দুঃস্থ, দরিদ্রের জয়োচ্চারণ-শব্দে সমস্ত ভূভাগ কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যভাগে রাজসভা। ইষ্টক প্রস্তর কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি বৃহৎ সভাগৃহের স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চ চূড়া হইতে বিশাল রাজপতাকা বায়ুস্রোতে তরঙ্গায়িত হইতেছে। চারিদিকে

সভাগৃহ প্রবেশের চারি-দ্বার, ফুল-মালা লতা-পল্লব মঙ্গলকুম্ভে সুসজ্জিত। দ্বারমুখে বীণা বংশী, মুরজ-মন্দিরা সংযোগে অনতি উচ্চ মধুর গম্ভীর বাদ্যধ্বনি। গৃহমধ্যে স্বর্ণাবর্মণ্ডিত সারি সারি উচ্চ স্তম্ভশিরে কৌশেয় চন্দ্রাতপ। তাহাতে স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মণিরত্নখচিত লতা পত্র পুষ্প-পল্লবের ছবি। প্রতিস্তম্ভগাত্রে নিপুণ শিল্পী-নির্মিত স্বর্ণলতা, তাহাতে স্তবকে স্তবকে মণিমুক্তা-রত্নের ফল, আর সেই ফল ভক্ষণ-প্রয়াসী রজতপক্ষ, স্বর্ণচঞ্চু, রত্নচক্ষু বিহঙ্গ। স্থানে স্থানে ত্রিপদার উপর রক্ষিত কৃত্রিম যুঁই জাতি কুন্দ মালতীর গাছ, কোনটীতে রৌপ্য পল্লব, সোনার ফুল; কোনটীতে স্বর্ণপল্লব, রূপার ফুল। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত কীলক হইতে কীলক পর্য্যন্ত শ্লথবিলম্বিত ফুলের মালা। চন্দ্রাতপ হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলে বিলম্বিত কত স্বর্ণ-প্রদীপ পাত্র, সন্ধ্যাসমাগমে তাহাতে গন্ধতৈল-বর্ত্তি জ্বালিত হইয়া সেই বিশাল গৃহ আলোকিত করিবে।

সভাগৃহের মধ্যভাগে স্বর্ণবর্মিত উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনে আসীন মণিরত্নখচিত মুকুট এবং মহার্ঘপরিচ্ছদ-পরিহিত রাজাধিরাজ মৌর্য্যকুলচূড়া অশোক দেব। কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, ললাটে হরিচন্দন-লেপ। মহারাজ অশোক কমনীয় কান্তিমান সুন্দর পুরুষ ছিলেন না; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সূচক তাঁহার তেজোময় আরক্ত আয়ত চক্ষু, দৃঢ়গঠিত বলশালী বিশাল বাহু, আর সেই উচ্চ সিংহাসনে তাঁহার স্থিরস্বচ্ছন্দ উপবেশনচ্ছন্দ রাজপ্রতিভা সূচিত করিতেছিল, জনমণ্ডলীর ভয় বিস্ময় ও অতর্কিত পূজা আকর্ষণ করিতেছিল।

মস্তকে সেবকধৃত মণিমুক্তাখচিত দীপ্তিমান রাজছত্র। রাজাধিরাজের পশ্চাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দণ্ডায়মান চামরদণ্ডব্যজনধারিগণ, তাম্বূল করঙ্ক গন্ধমাল্যধারিগণ, মর্দ্দনদণ্ডহস্ত সংবাহক, আর অসি-ভল্লকুঠারধারী পার্শ্বরক্ষী-বর্গ।

সিংহাসন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সম্মুখে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে যথোপযুক্ত বিচিত্র মূল্যবান্ আসনে আসীন মিত্র ও করদ রাজগণ, রাজন্যক, রাজ-প্রতিনিধি, অমাত্য, মহাপাত্র সামন্ত, মহা-সামন্ত, দণ্ডনায়ক, সচিব, সেনানী প্রভৃতি সভা-সদ্গণ; সুদূর সাগরান্ত হইতে মিশর, সিরিয়া, হাপরস, মাসিডোনিয়ার শ্মশ্রুমান্ বিশাল-দেহ রাজপ্রতিনিধিগণ; চোল, পাণ্ড্য, কেরল হইতে স্বাধীন ভারতীয় নৃপতিগণের প্রতিনিধি; তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ; কাশী, কোশল, চেদী, অঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, গান্ধার, কাম্বোজ, বাহ্লিক প্রভৃতি দেশের রাজা রাজ-প্রতিনিধিগণ; বৃজি, মল্ল, লিচ্ছবিগণের প্রতি-নিধি। ভট্ট, বন্দী আপ্ত, চর দৈবজ্ঞ, দূত, লেখক, প্রতিবেদক শ্রেষ্ঠী, সাংযাত্রিক প্রভৃতিরা পদভেদে আসীন অথবা দণ্ডায়মান। একপার্শ্বে গুরু-পুরোহিত, স্নাতক-অধ্যাপক, যতী-ব্রহ্মচারী, পারিব্রাজক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ; অপর পার্শ্বে উচ্চমঞ্চে যবনিকার অন্তরালে শুদ্ধান্তঃবাসিনী মহিলাগণের সমাবেশ, মঞ্চের নিম্নভাগে অসি-ভল্লধারিণী প্রহরিণীগণ।

রাজাধিরাজের জন্মদিন-মহোৎসবে কোন রাজা, রাজ-প্রতিনিধি অথবা সভাসদ্ শূন্য-হস্তে রাজদর্শনে আগমন করেন নাই। সিংহা-সনের সম্মুখে ধান্য দূর্ব্বা যব তিল ফল ফুল

প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, তৎপর বহুবিধ বহুমূল্য রাজভেট, উপায়ন সামগ্রী। মণিমুক্তা হীরক বৈদূর্য্য প্রবাল কাঞ্চন, ক্ষৌম কৌশেয় রাঙ্কব নানাবিধ বস্ত্র, অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী হরিচন্দন প্রভৃতি গন্ধ; হার বলয় কেয়ূর কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার; মণিমুক্তারত্ন-খচিত কোষমুষ্টিযুক্ত দীপ্তিমান অসি, ছুরিকা; হস্তিদন্ত নির্ম্মিত, মর্ম্মরপস্তর-চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত দেশবিদেশ হইতে আগত বহুবিধ সুদৃশ্য মূল্যবান দ্রব্য। আর, হয় হস্তী, শকট শিবির প্রভৃতি সভাভঙ্গে রাজদর্শন জন্য সভাগৃহের বাহির চত্বরে রক্ষিত হইয়াছে।

মহাপাত্র উপস্থিত রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, সম্ভ্রান্ত সভাসদগণকে ক্রমে রাজাধিরাজের নিকট পরিচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের আনীত উপায়ন-সামগ্রী সকল রাজ-গোচর করিয়াছেন। অশোকদেব তাঁহাদের যথাযোগ্য অভিবাদন, আপ্যায়ন করিয়াছেন। সভাভঙ্গের আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমন সময় প্রহরীপরিরক্ষিত একটী যুবক সেখানে আনীত হইল। তাহার দৃঢ়গঠিত বলিষ্ঠ শরীর, বিশাল বক্ষ, আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট; কিন্তু পরিধানে অতি সামান্য গ্রাম্যবেশ। যুবক সিংহাসনের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া মস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বৰ্দ্ধনা করিল।

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি নাম তোমার?"

"দাসের নাম মাণিক্যদেব।"

"কোন্ দেশে বাড়ী?"

"মহারাজ্য কলিঙ্গে।"

"কি প্রয়োজনে আমার রাজধানীতে আসিয়াছিলে?"

যুবক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল;—

"মহানগর পাটলিপুত্র দেখিবার সাধ কাহার না হয়? রাজাধিরাজের রাজধানী দর্শন করিতে আসা যে অপরাধের কার্য্য, তাহা জানিতাম না।"

যুবকের পরুষ বাক্যে সভাসদ্গণ বিস্মিত হইলেন। রাজাধিরাজ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন;—

"ছদ্মবেশে চোরের ন্যায় প্রবেশ, পর-রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা-নিরূপণ-চেষ্টা, চিত্রে দুর্গ-সংস্থান অঙ্কন—সাধু অভিপ্রায়ের পরিচায়ক নহে।"

পাত্র অগ্রসর হইয়া রাজাধিরাজের হস্তে একখণ্ড চতুষ্কোণ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহাতে বিকীর্ণ রশ্মিজাল চিহ্নযুক্ত গোলাকার সূর্য্যমূর্ত্তি, নিম্নভাগে সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন। রাজাধিরাজ সেই মুদ্রাঙ্কিত স্বর্ণখণ্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"এখানি কি?"

যুবক সসম্ভ্রমে মস্তক নমিত করিয়া সেই মুদ্রাঙ্কিত সূর্য্যধ্বজ স্বর্ণখণ্ডে নমস্কার জানাইয়া বলিল;—

"রাজাধিরাজের নিকট আমার পরিচয় বিদিত হইয়াছে; যে দণ্ডবিধান অভিপ্রায় হয়, আদেশ প্রচার হউক।"

"এখানি কি?"

"রাজাধিরাজ ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্তচরের পরিচয় চিহ্ন।"

"সূর্য্য-মুদ্রাই তোমার প্রভুর রাজধ্বজ, সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন কেন?"

"আমার প্রভু যাহাকে আপ্তপদ প্রদান করেন, তাহার পরিচয়ের জন্য সূর্য্যমুদ্রার নিম্নে ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। এই ক্ষুদ্র অধম প্রভুর প্রধান চর, সেই জন্য এই সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন।"

"তুমি ভিন্নদেশের গুপ্তচর, আমার রাজ্যের গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে আসিয়া ধরা পড়িয়াছ; তোমার প্রাণদণ্ড কেন হইবে না?"

যুবক নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল;—

"গুপ্তচর রাজসেবক। রাজাধিরাজ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর, পাটলীপুত্রের চর কোন রাজ্যে না যায়?"

রাজাধিরাজ বলিলেন;—

"যায় বটে, তাহাদেরও চিরদিন এরূপ বিপদ সম্ভব।"

"তাঁহারা সাহসী এবং প্রভুভক্ত, ভয় করেন না। এই ক্ষুদ্র অধমও আজ দৈবদুর্বিপাকে বিপদে পড়িয়াছে। যে মুদ্রাঙ্কিত ধ্বজ দেখাইলে গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে গোদাবরী-তীর পর্য্যন্ত ত্রিকালঙ্গে এমন মানুষ নাই যে মস্তক নত না করে, যাহার সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ দাস শত রক্ষী সাহায্যকারী সংগ্রহ করিতে পারিত; আজ তাহার কোন শক্তি নাই।—কিন্তু এ অধমও অদৃষ্টের প্রসন্নতা মনে করে। রাজাধিরাজের অখণ্ড প্রতাপ;—দণ্ডাদেশ প্রচার হউক!"

সেই মহাসভা-সমাসীন সকলের চিত্ত শিহরিয়া উঠিল। এই দৃঢ়চিত্ত নবীন যুবকের প্রতি নিশ্চয়ই শূলদণ্ডের আদেশ হইবে! কিন্তু রাজাধিরাজ বলিলেন;— মহারাজ কলিঙ্গপতির শৌর্য্য-প্রতাপের কথা আমার অবিদিত নাই। তাঁহার বিশ্বাসী চরেরও যে অতুল সাহস, তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তোমার মৃত্যুভয় নাই। সংসারে মৃত্যুভীতের মৃত্যুসংঘটনে বিলম্ব হয় না। শুন, অশোক-দেব প্রকৃত সাহসীর অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। তুমি সাহসী এবং বিশ্বাসী প্রভুভক্ত, তোমার অপরাধ ক্ষমা করা গেল।"

রাজাধিরাজের মহামহিমময় আদেশে সভাসমাসীন সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল। যুবক নীরবে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল এবং উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল;—

"রাজাধিরাজের জয় হউক!"

"তোমার প্রভু আমার সীমান্ত-প্রদেশে অহেতুক গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার প্রজাগণ অত্যাচারিত হইতেছে, বণিক-ব্যবসায়ীর বহু ক্ষতি হইতেছে। আমার প্রেরিত দূত সমুচিত সম্বর্দ্ধিত হয় নাই। তিনি গুপ্তচর পাঠাইয়া আমার সৈন্য এবং দুর্গ-সন্নিবেশের তত্ত্ব করিতেছেন।—যুদ্ধ করাই কি তাঁহার অভিপ্রায়?"

যুবক যুক্তকরে নিবেদন করিল;—

"দাস ক্ষুদ্র সেবক, ত্রিকালঙ্গেশ্বরের গুপ্ত অভিপ্রায় আমার জ্ঞাত থাকার কি সম্ভাবনা?"

"ভাল, অচিরেই তাহা জানা যাইবে। তুমি এখন পরিচিত, ছদ্মবেশে আর তোমার প্রয়োজন নাই। পাত্র তোমার বেশ, যান, বাহন, আহার, বাসস্থানের উপযুক্ত বিধান করিয়া দিবে। সপ্তাহ কাল আমার রাজ-ধানীতে থাকিয়া যাহা যাহা দেখিবার ইচ্ছা হয়, দেখ। পরে আমার লোকেরা তোমাকে

তোমার প্রভুর রাজ্যসীমায় রাখিয়া আসিবে।"

যুবক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; দুই বাহু উর্দ্ধ করিয়া, উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল;—

"রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকদেবের জয় হউক!"

রাজাধিরাজ সভাভঙ্গের ইঙ্গিত করিলেন। মাগধগণ স্তুতিগীত আরম্ভ করিল। বহির্দ্বার চত্বর রাজপ্রাসাদ—সমস্ত নগর মৃদঙ্গ ভেরি পটহ ঝর্ঝর মর্দ্দল বেণু বংশী রবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখরার মুকত্ব

এক দিন অপরাহ্নে মঞ্জুলা কুমুদ-নিবাসে উপস্থিত হইল। সঙ্গে পরিচারিকা চঞ্চলা ও চিত্রা, ভৃত্য বাহক এবং উপায়ন-গন্ধ-পুষ্প-মাল্যবাহী ভারিক। প্রমীতসেন এবং উৎপলা প্রস্তুত ছিলেন। শিবিকা অন্তঃপুর-দ্বারে পৌঁছিতেই মাধবী তাহার দ্বার খুলিয়া দিল। মঞ্জুলা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া প্রমীতকে নমস্কার অভিবাদন করিল এবং সহজ অনুমানে গৃহকর্ত্রী উৎপলাকে চিনিতে পারিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। উৎপলা অতি আদরে হাতে ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রমীত বলিলেন,—

"আজ আমাদের কত আনন্দ!"

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া হাসমুখে পুনরায় প্রমীতকে অভিবাদন করিল।

"তোমরা উপরে যাইয়া বিশ্রাম কর।"

প্রমীত বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া দ্বিতলে নিজ কক্ষে গেলেন। সেখানে নিজের শয়ন-পর্য্যঙ্কের নিকট দ্বিতীয় পালঙ্কে কোমল শয্যায় নিজের পার্শ্বে মঞ্জুলাকে বসাইলেন।

উৎপলা বলিলেন;—

"আমার কত সৌভাগ্য, তুমি আমাদের গৃহে আসিয়াছ!"

মঞ্জুলা বলিল;—"আপনার গৃহে আসিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।"

রাজকোপ হইতে স্বামী যে মঞ্জুলার অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া উৎপলা কত কথা বলিলেন। মঞ্জুলা তৎসম্বন্ধে নিজের কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া সেই দুর্য্যোগময় রাত্রিকালে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা এবং নিরাপদে নিজগৃহে পৌঁছার জন্য প্রমীতসেনের মহত্ত্ব এবং অনুগ্রহের কথা তুলিয়া কত কৃতজ্ঞতা জানাইল।

অনেক কথা হইল। শেষে উৎপলা বলিলেন;—"সে দিন কোথা হইতে আসিতে এই বৃষ্টিদুর্য্যোগের মধ্যে পড়িয়াছিলে?"

"পাটলীগ্রামে আমার এক আত্মীয়া আছেন তাঁহার আমন্ত্রণে ভিক্ষুদেব উপগুপ্ত ঠাকুর সে দিন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়া ছিলেন। ভিক্ষুদেবের চরণ দর্শন জন্য আমি পাটলীগ্রামে গিয়াছিলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হয়, ঝড়-বৃষ্টির সময় দস্যু-হস্তে পড়িয়াছিলাম। বহু পুণ্যফলে সে সময় আমার উদ্ধার-কর্ত্তার সমাগম হইয়াছিল।"

"দেবতার অনুগ্রহে আমরাও সেদিন তোমার মত সুহৃদের নিকট পরিচিত হইয়া ভয়ঙ্কর রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।"

মঞ্জুলা হাসিল, বলিল ;—

"তিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ”

"তুমি আমাদের প্রাণ-মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চিরদিনের জন্য আমাদিগকে কিনিয়া ফেলিয়াছ।"

"শ্রীচরণের দাসীকে ও কথা বলিবেন না।"

"তুমি আমার পরম সুহৃদ, প্রাণপ্রিয় ভগিনী !"

মঞ্জুলা পালঙ্ক হইতে নামিয়া উৎপলার পদে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল। উৎপলাও নামিলেন এবং দুই হাতে মঞ্জুলাকে ধরিয়া তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

উৎপলা তখন হাতে ধরিয়া মঞ্জুলাকে লইয়া অন্তঃপুরস্থ গৃহকক্ষ পুকুর উদ্যান ইত্যাদি দেখাইতে লাগিলেন।

উৎপলার কক্ষগুলি সুন্দর ও সুসজ্জিত। মঞ্জুলা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, কমলপুরে তাহার নিজের কক্ষগুলি কারুকার্য্যে অথবা মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারে উৎপলার কক্ষগুলি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নির্ব্বাচন ও সন্নিবেশ-পারিপাট্যে, প্রিয়জনের প্রীতি এবং প্রয়োজন সম্পাদনে এই গৃহিণী গৃহের নিকট কমলপুরের সেই প্রয়োজনহীন মহার্ঘ সাজ-সজ্জাপূর্ণ অতি-অলঙ্কৃত কক্ষগুলি সজ্জিত বিপণী বা দ্রব্যভাণ্ডার মাত্র।

উৎপলার শয়নকক্ষে বিস্তৃত পালঙ্কে দুগ্ধশুভ্র আস্তরণযুক্ত প্রশস্ত শয্যা, তাহাতে যুগ্ম উপাধান। শয্যাপার্শ্বে অযত্নরক্ষিত সপ্ত-আবলী স্বর্ণমেখলা, তাহারই পার্শ্বে মনোহর স্বর্ণ-শৃঙ্খল। এক কোণে শুভ্র পাদুকা, মণিখচিত সিংহমুখ যষ্টি ; অন্য কোণে ত্রিপদীর উপর মুকুর, কঙ্কতি, গন্ধচূর্ণ, কবরীবন্ধন সূত্র, বিবিধ অঙ্গরাগ সামগ্রী। কক্ষের এক পার্শ্বে মসৃণ কাষ্ঠদণ্ডের উপর রক্ষিত পুরুষ-পরিধেয় ধৌত কৌশেয় ধুতি, উত্তরীয় ; নিকটেই রমণী-পরিধান-যোগ্য সাটী, প্রাবৃত ওড়নি, কঞ্চুলিকা।

মঞ্জুলা বিস্মিতনেত্রে সাগ্রহচিত্তে দেখিতে লাগিল, কক্ষের সর্ব্বত্র এক নবীন ভাব, অদৃষ্টপূর্ব্ব এক কমনীয় চিত্র। শৌর্য্য-মাধুর্য্যের এরূপ মিলন, সুন্দর আর সুন্দরীর এরূপ সামঞ্জস্য, যুগ্মের এরূপ অবিচ্ছিন্ন একত্ব আর কোথায়ও তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই। তাহার নিজগৃহে ত সে ভাবের লেশ মাত্র নাই। মহারাজ্ঞী কারুবকীর কক্ষ ত রাজকক্ষ, সেখানেও মঞ্জুলা এ ভাব লক্ষ্য করে নাই। অন্য গৃহস্থ লোকের ঘর সংসার মঞ্জুলা কমই দেখিয়াছে।

দেখিয়া দেখিয়া মঞ্জুলা মুগ্ধ হইল। তাহার জীবনে সে কখনো এ সৌন্দর্য্যের লীলা দেখে নাই, সুতরাং তাহার মহিমা কি অভাব কোন দিন অনুভব করে নাই। স্বাধীনার জীবন যে চির অভাবময়, আর পরাধীনা যে ঐশ্বর্য্য-শালিনী—এক যে কিছুই নয়, দু'য়ের একত্বই যে পূর্ণ জীবন, মঞ্জুলার মনে ত কোন দিন সে কথা উদয় হয় নাই। অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই লোকে নিজের অভাব বুঝিতে পারে, অনাসক্ত সংযমীর চিত্ত তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু সংসারে তেমন মহাত্যাগী সংযতবৃত্তি কয় জন ? মঞ্জুলা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলদেশে